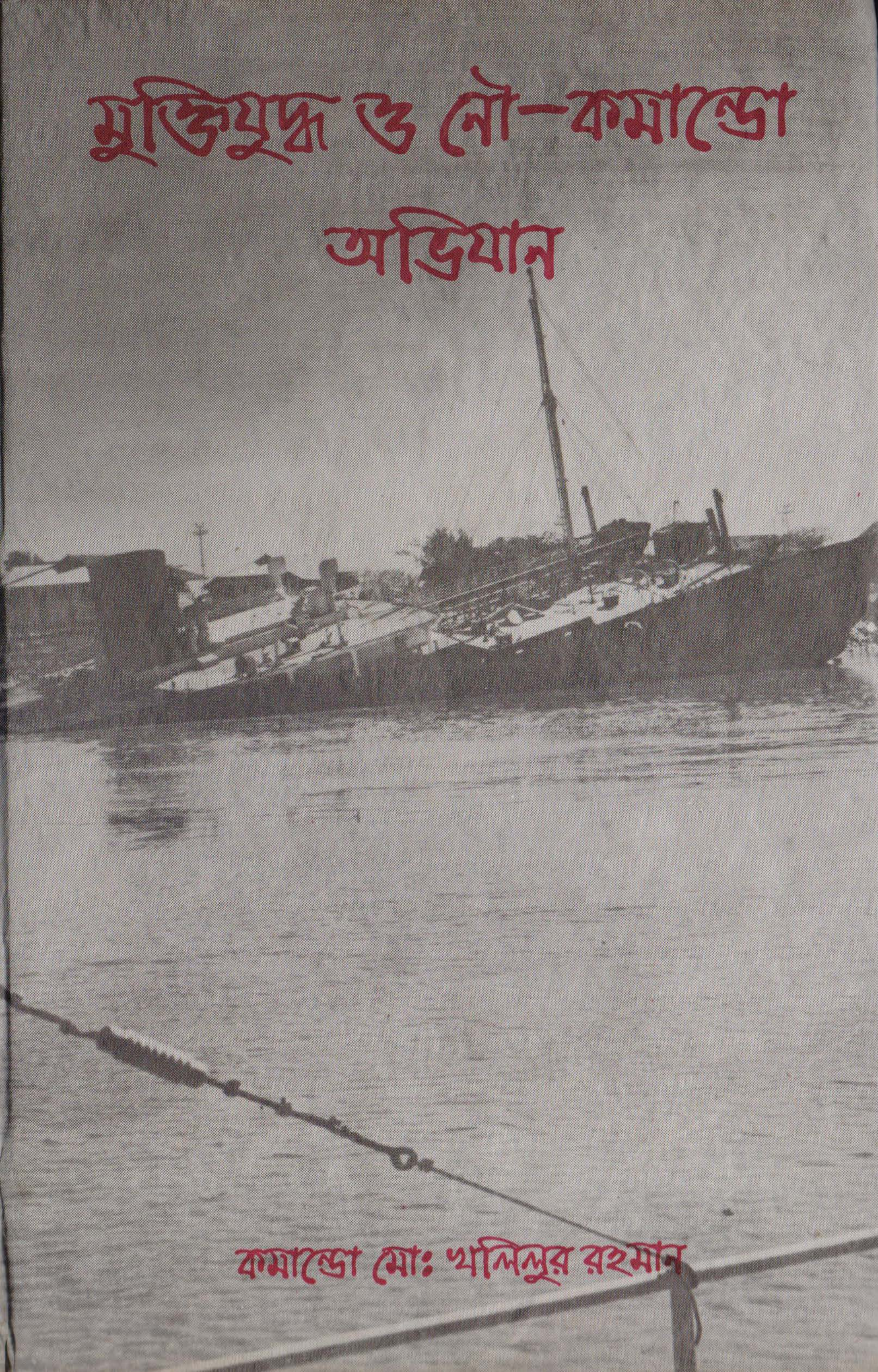
মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমান্ডো অভিযান



কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান



লেখক পরিচিতি

১৯৫০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী সাতক্ষীরা জেলার, দেবহাটা থানার সীমান্তের অজগ্রাম ভাতশালাতে এক কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা কলকাতায় ব্যবসা বানিজ্য করতেন। ধর্মানুরাগী হলেও তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন। ১৯৬৬ সালে টাউনশ্রীপুর স্কুল থেকে এস.এস.সি. ১৯৬৮ সালে বি.এল. কলেজ, দৌলতপুর থেকে এইচ.এস.সি, এবং ১৯৭৪ সালে পি.সি. কলেজ বাগেরহাট থেকে বিজ্ঞানে সম্মান ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। কলেজ জীবনে প্রবেশ করেই প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। '৬৯এ দেশব্যাপী অভূতপূর্ব ছাত্র ও গণ আন্দোলনের সময় খুলনা শহরে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। ২৩ মার্চ '৭১ খুলনা ত্যাগ করে নিজগ্রামে চলেযান। ২৭ মার্চ, প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য সীমান্তের তদানিন্তন ইপিআর পুলিশ এবং ২০০ জন ছাত্রযুবকসহ সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু করেন। এপ্রিল মাসে পশ্চিম বঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে ৭ সদস্যের ছাত্রপ্রতিনিধিদলসহ তিনবার বৈঠক করেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার জন্য এবং সফল হন। নৌ-কমাণ্ডো হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র বন্দী হয়ে একমাস যশোর সেনানিবাসে বন্দী জীবন কাটান। ১৮ সেপ্টেম্বর সেনানিবাস থেকে চারবন্ধু পালিয়ে পুনরায় যুদ্ধে অংশ নেন।

স্বাধীনতাউত্তর উন্নয়নের জন্য নিজ গ্রামে ছিলেন। ভাতশালা উচ্চ বিদ্যালয় সহ রাস্তাঘাট, ব্রীজ নিমার্ণ করেছেন। ১৯৭৪-৭৮ সাল পর্যন্ত পূবালী ব্যাংকে এবং ১৯৮৩ থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত একটি তামাক কোম্পানীর কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ব্যবসা করছেন। তিন সন্তানের জনক। স্ত্রী সংস্কৃত পরিবারের হলেও পুরোপুরি গৃহিনী। সারাটা জীবন সততার সাথে কাটিয়েছেন। সেজন্য মূল্যও দিতে হয়েছে অনেক। লেখালেখি এবং মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গবেষণা করে সময় কাটে। তার লেখার মূল বিষয় মুক্তিযুদ্ধ এবং সমসাময়িক রাজনীতি। কোনো সরকারের রক্ত চক্ষুর ভয়ে ভিত হননি। বর্তমান ও আগত প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ঠ এবং মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর ভাবনা মুক্তিযুদ্ধ গোটা জাতির গৌরব, মুক্তিযোদ্ধারাও রাষ্ট্রের সম্পদ। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে মনে করেন। বঙ্গবন্ধুকে কেবল শ্রেষ্ঠ নয় অতুলনীয় একজন বাঙালি হিসেবে ভাবেন। লেখক নিজেকেও একজন সাধারণ কৃষক, মজদুরের সাথী এবং অত্যন্ত সাধাসিধে জীবন যাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সম্বন্ধে আপোষহীন।

মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমান্ডো অভিযান

(মুক্তিযুদ্ধে একটি অপ্রকাশিত দলিল)

কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী '৯৭
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ মৃদুল রহমান
প্রকাশিকা ঃ শিরীন রহমান

প্রচ্ছদ সজ্জাঃ নূপুর রহমান

অঙ্গসজ্জা ঃ এম,এ, রহিম

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ এম,এ, ওয়াহাব

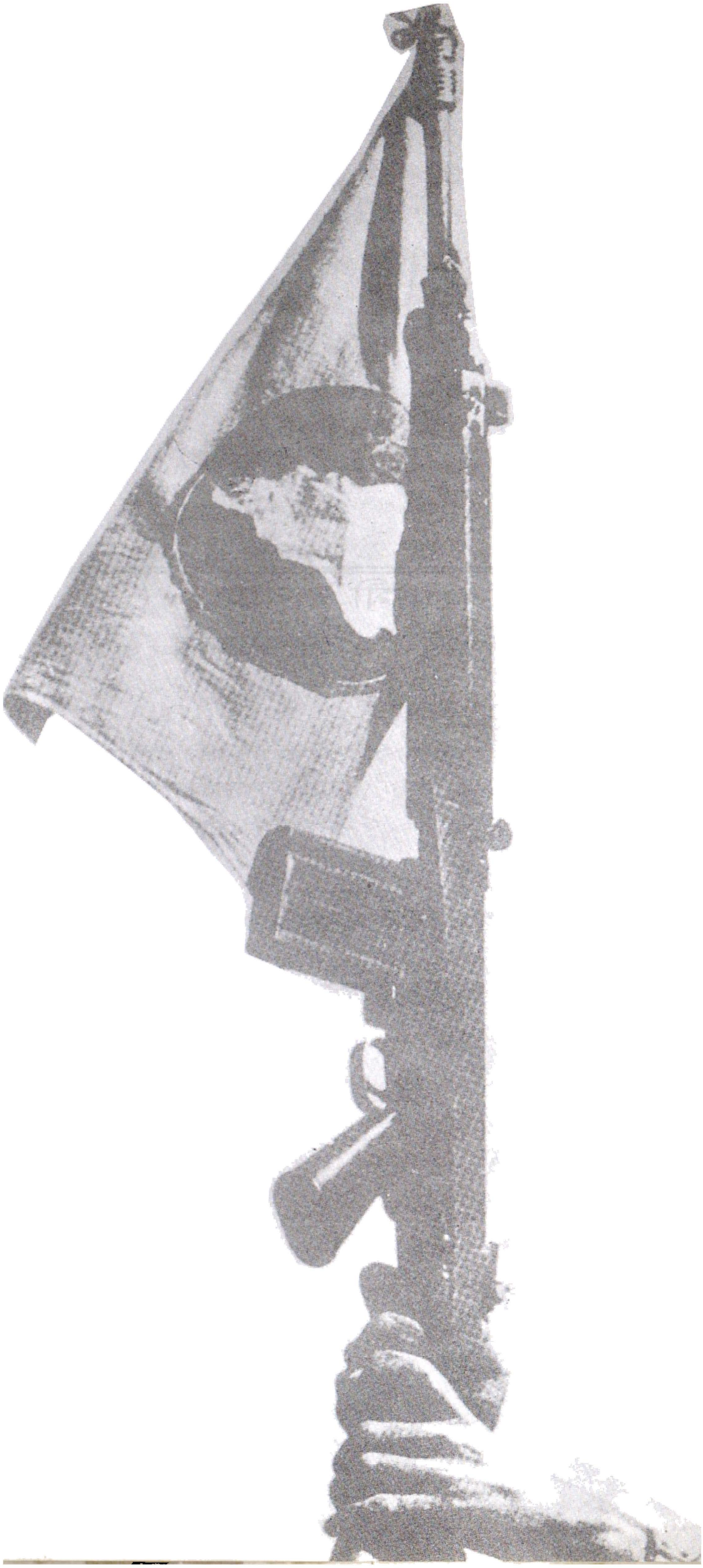
মুদ্রন ঃ গানিম প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস
৪৪/এ/১/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৮৩৬৮, ৮৬০৫৫৯

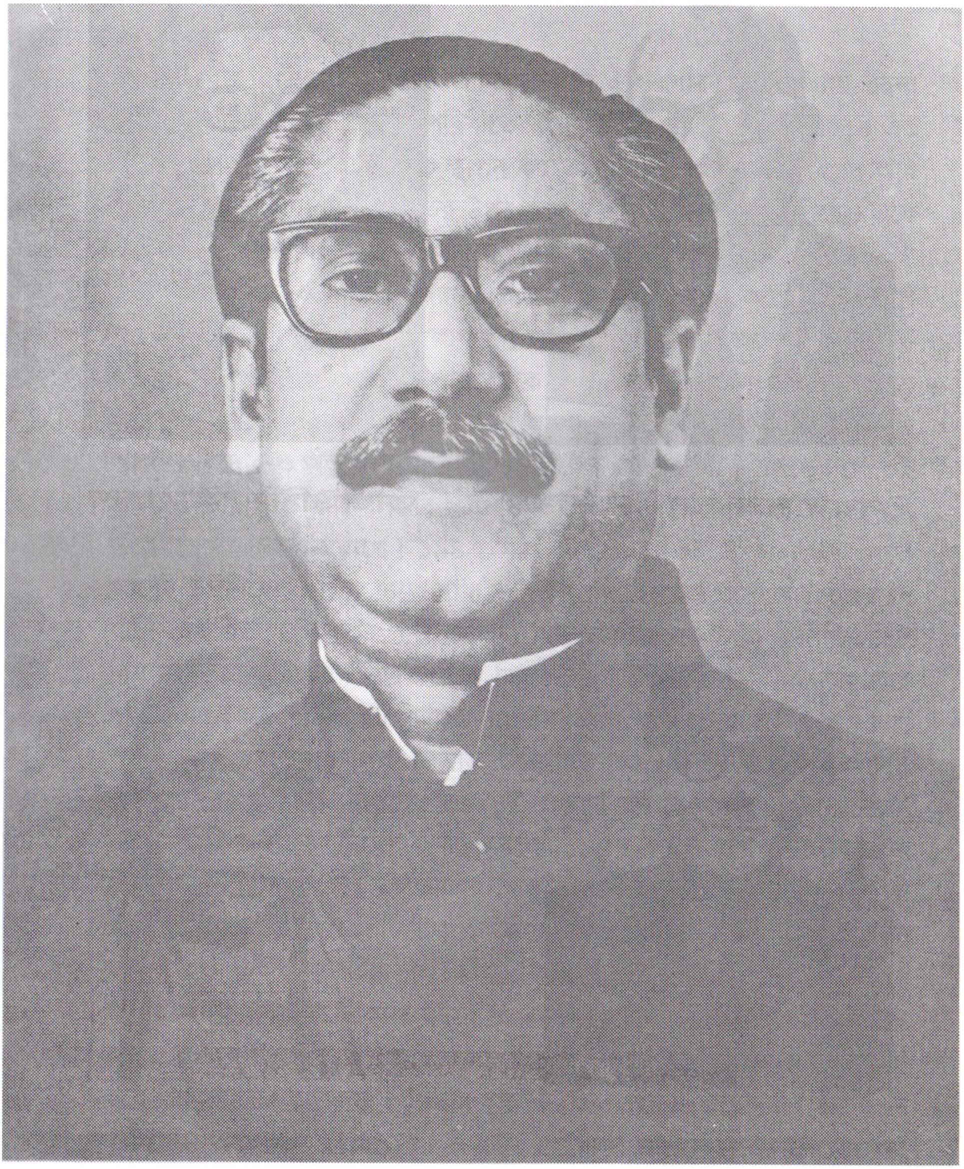
প্রচ্ছদে '৭১ এ কমাণ্ডোদের দ্বারা চট্টগ্রাম বন্দরে ডোবানো জাহাজের ছবি।
সৌজন্যে ঃ সাংবাদিক কামরুল হুদা।

মূল্য ঃ অফসেট কাগজে – ২৫০/- টাকা
Price U.S. $ 10 only.

উৎসর্গ

স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনতা
মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ নৌ-কমাণ্ডোদের
উদ্দেশে।





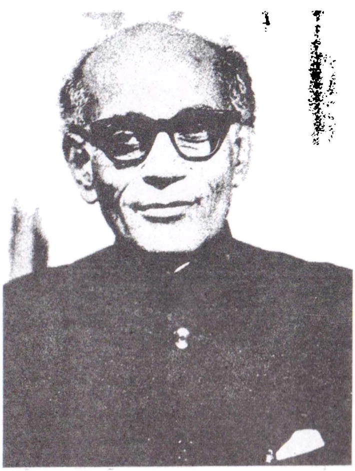
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



সৈয়দ নজরুল ইসলাম



তাজউদ্দিন আহমেদ



ক্যাপ্টেন মনসুর আলি



মোঃ কামরুজ্জামান

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালি জাতির উত্থান এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীতে অনেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এত আত্মত্যাগের নজির কোন জাতি স্থাপন করতে পারেনি। আন্দোলন, বিপ্লব আর বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী এই জাতির উপর শতেক জুলুম, অত্যাচার চাপিয়েও একে প্রতিবাদী ভূমিকা থেকে কখনও সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করে। এই সময়ে ভারত বর্ষে আধুনিকতার ছোয়া লাগলেও জনগণ কখনই ইংরেজদের বেঈমানি ও ব্যবসার নামে চাপিয়ে দেয়া উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এবং দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ঘটে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গদেশ থেকেই প্রথম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এবং বাঙালিরাই এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এই উপমহাদেশ থেকে তাদের উপনিবেশ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেও কুশলী ইংরেজ শাসকবৃন্দ ভারতবর্ষ যাতে একত্রিত না থাকতে পারে সেজন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ভারতবর্ষ ও বিভক্ত হয়। উপমহাদেশের দুই অঞ্চলের দুটি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। তদানিন্তন শাসকদের এই অযৌক্তিক, অবাস্তব ও দুরভিসন্ধিমূলক সিদ্ধান্ত উন্মোচিত হয় তাদের পরবর্তীকালের আচরণে। কিন্তু অনেক বিপ্লবের উত্তরসুরী বাংলার জনগণ আবারও মেনে নেয়নি নতুন পাকিস্তানী উপনিবেশ। বস্তুতপক্ষে ১৯৪৭ সালে জন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষনার পর কলকাতার কিছু তরুন ও প্রবীণ লেখক, বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। যার অগ্রনী ভূমিকায় ছিলেন আব্দুল হক ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীন পাকিস্তানে নাগরিকদের সর্বাধিক বিকাশ ঘটবে এবং অনুরূপ বিকাশের জন্য মাতৃভাষায় রাষ্ট্রীয় স্থানলাভ অপরিহার্য। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন পাকিস্তান গণ পরিষদে ইংরেজী ও উর্দূর সাথে বাংলা ব্যবহারের প্রস্তাব এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তান

সৃষ্টি হয়েছে, দশ কোটি মুসলমানের জন্য এবং মুসলমানের ভাষা উর্দূই হবে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। যাঁরা বাংলার দাবি তুলছেন, তাঁরা এই নবীন রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকের ঐক্য নষ্ট করতে চাইছেন।" ভাষার গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকারে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের যে প্রতিফলন এই বক্তব্যে ঘটেছিল, পূর্ব বাংলার সচেতন মানুষ তা মেনে নেয়নি।

শুরু হয় আন্দোলন, বিদ্রোহ, দাবি আদায়ের সংগ্রাম। কিন্তু অধিপত্তবাদীরা এই অঞ্চলের জনগণের ন্যায্য অধিকার দিতে অস্বীকার করলে আনুক্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষিত হয় 'স্বাধীনতা'। বাঙালির দীর্ঘকালের কাঙ্খিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসে সাড়ে সাতকোটি বাঙালি। সেজন্য তাদের চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ত্রিশ লাখ বাঙালির জীবন বিসর্জন ও দু'লাখ মা-বোনের সভ্রম হারানোর বিনিময়ে অর্জিত হয় এই স্বাধীনতা। পৃথিবীর বুকে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ নামে পৃথক একটি রাষ্ট্র, একটি পতাকা, একটি স্বতন্ত্র জাতির। আমরা আজ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারছি নিজস্ব শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র যুদ্ধের ইতিহাসে 'জাতীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও তরান্বিত করার জন্য নৌ-কমাণ্ডো অপারেশন এক উজ্জ্বলতম অনন্য অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। অথচ দুঃখ জনক হলেও সত্যি দেশের অন্যান্য সেক্টরের বীর যোদ্ধাদের মতো ১০ নং সেক্টরের সেই দূর্ধর্ষ নৌ-কমাণ্ডোদের বীরত্ব গাঁথা আজও অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও নৌ-কমাণ্ডোদের কথা যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের দুইযুগ পরেও জাতি এই কমাণ্ডোদের কথা তেমন ভাবে জানেনা। অথচ ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকে পৃথিবীময় পরিচিত করেছিল নৌ-কমাণ্ডোদের দ্বারা ১৫ আগষ্ট "অপারেশন জ্যাকপটের" অধীনে বাংলাদেশে ৫টি বন্দরে ২৬টি জাহাজ ডোবানোর মাধ্যমে। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এমন কৃতিত্ব এবং দুঃসাহসীকতার নজির নেই। প্রবল পরিক্রমশালী এবং অপরাজেয় বলে খ্যাত পাকসেনা ও নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলনা বলেই বাঙালি যুবকরা জীবনকে উৎসর্গ করে শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন। ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশের বন্দরে ২৬টি জাহাজ ডুবির পর বিদেশী পত্রপত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমগুলি নৌ-কমাণ্ডো অভিযানকে অত্যন্ত সাফল্য জনক বলে মন্তব্য করে।

নদী মাতৃক বাংলাদেশের সংগে সমুদ্র পথে পাকিস্তানের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল নৌ-কমাণ্ডো অভিযানের মূল পরিকল্পনা। এছাড়া এ যাবত পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বে প্রচার করছিল যে, বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, সেখানে কোন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছেনা। ১৫ই আগষ্ট থেকে নৌ-কমাণ্ডোদের সফল হামলার পর পাকিস্তানী শাসকদের ভীত নড়ে ওঠে। ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জনের পূর্বপর্যন্ত ৪৫টি অভিযান চালিয়ে নৌ-কমাণ্ডোরা ছোট-বড় মিলিয়ে ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধে এটিই ছিল সর্ববৃহত সাফল্য। স্বাধীনতাউত্তর একটি মহল বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে চেষ্টা করেছে এমনটি প্রতিষ্ঠিত করতে যে, একান্তরে নিয়মিত নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডোরা জাহাজ ডুবিয়েছিল। এই ভুল তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু সকলে অবগত যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোদের সাথে প্রাক্তন পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর বাঙালি কোন কমাণ্ডো যোগ দেয়নি। পৃথক ভাবেও তারা কোন অভিযানে অংশ নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের একটি গৌরবজ্জ্বল ও অনুল্লেখিত অধ্যায় জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য এগ্রন্থ "মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমাণ্ডো অভিযান" প্রকাশিত হলো। এটি একটি তথ্য বহুল এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থ। যদিও দুইযুগ ধরে মুক্তিযুদ্ধের এমন দুঃসাহসী ঘটনা অপ্রকাশিত থেকে গেছে। এটি প্রকাশের দায়িত্ব জাতীয় পর্যায়ে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নেয়া সম্ভব হলে আরও বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিহাস সমৃদ্ধ হতো। আগামীতে নৌ-কমাণ্ডোদের সকল ইতিহাস জাতীয় ভাবে সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হবে এমন আশা করা যায়।

কমাণ্ডোদের স্মৃতিচারণ থেকে যুদ্ধের তথ্য সংগৃহীত, সুতরাং তথ্য বিভ্রাট অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘ সাত বৎসর, প্রায় ৩০০ জন কমাণ্ডোর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই ইতিহাস সৃষ্টিতে উপাত্ত যুগিয়েছে। ভবিষ্যতে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে যা গৌরবজ্জ্বল করবে।

হাজার বছরের শৌর্য্যবীর্যের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর যোদ্ধাদের মূল্যায়ন এদেশে হয়নি এবং তাঁদের বীরত্বের ইতিহাস এখনও আমাদের দেশে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। অথচ জাতীয় বীরদের সঠিক মূল্যায়ণ ও তাঁদের আত্মত্যাগের পাঠ গ্রহন করেই কেবল জাতির আগামী দিনের সন্তানেরা দেশকে ভালবাসার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। সকল প্রকার শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানষিক শক্তি অর্জন করতে পারে এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবীত হয়ে মাতৃভূমির জন্য অকাতরে

প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ-যুদ্ধের ইতিহাস 'মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমাণ্ডো অভিযান' এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

১৯৯৩ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় এই অধ্যায়টি "দৈনিক ভোরের কাগজ" এর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান এর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করি। এরপর আরও কিছু জাতীয় পত্রিকায় নৌ-যুদ্ধের উপর আমার লেখা প্রকাশিত হলে অনেক সুধীজন এই তথ্যগুলি পুস্তকারে প্রকাশের জন্য তাগিদ দেন। যাঁদের মাঝে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ডঃ সালাহউদ্দিন আহমেদ, এয়ার ভাইস মার্শাল এ,কে, খন্দকার বীরউত্তম, মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, লেঃ কঃ আবু ওসমান চৌধুরী, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং আমার সহযোদ্ধাবৃন্দের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা আমাকে এই পুস্তক প্রকাশে সাহস যুগিয়েছে। তাঁদের সহমর্মিতা আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ রাখবে। এছাড়াও পুস্তকটি প্রকাশে যাঁরা সকলভাবে সহযোগিতা যুগিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি।

কমাণ্ডো মোঃ খলিলুর রহমান
লেখক

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

ভারতবর্ষ, ২০০ বছর ইংরেজ শাসকদের কয়েকজন



লর্ড কার্জন



লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন



লর্ড ক্লাইভ



ওয়ারেন হেষ্টিংস

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি

বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবি করার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার ছাত্র-জনতার উপর যে অমানবিক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালায় তা শুধু সেদিন বাঙালিকে শোকাহত করেনি সাথে সাথে জাতিকে আরো বিদ্রোহী করে তোলে। এই হত্যাকাণ্ডে সারাদেশ বারুদের মত জ্বলে ওঠে। পুশিলী নির্যাতন ভয়াবহ ভাবে বেড়ে যায়, তা সত্ত্বেও কয়েকদিন একটানা আন্দোলন চলতে থাকে। আইন পরিষদের কোনো কোনো সদস্য পদত্যাগ করেন। সরকারী কর্মচারীরাও সরকারের সাথে অসহযোগিতা শুরু করলে সরকার তার পতনের জন্য আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে পুলিশের পাশাপাশি রাস্তায় মিলিটারী নামিয়ে ২৫ শে ফেব্রুয়ারী আইন পরিষদের সভা স্থগিত ঘোষনা করা হয়। ৩রা মার্চ প্রাদেশিক মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তার বেতার ভাষণে বাস্তব সত্যকে পাশ কাটিয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে ভিন্নদিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের সকল প্রচেষ্টাই বৃথায় পর্যবসিত হয়। বস্তুত দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের পতনের ভিত সেসময়ই তৈরী হয়।

মুসলমানদের রক্ষার নামে পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির এটিই ছিল প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ। গণতন্ত্র দিলে স্বাধীনচেতা বাঙালি পশ্চিমাদের নেতৃত্ব মেনে নেবে না, এই ভয়ে বারবার সামরিক আইন জারি করে গণতন্ত্রের পিঠে ছুরিকাঘাত করে বছরের পর বছর ধরে শোষণ ও পদানত করে এই জাতির উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এক ঔপনিবেশিক শক্তি গিয়ে এসেছে আরেক ঔপনিবেশিক শক্তি। কিন্তু আন্দোলন, বিপ্লব আর বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী এই জাতির উপর শতেক জুলুম, অত্যাচার চাপিয়েও একে প্রতিবাদী ভূমিকা থেকে কখনও সরিয়ে আনতে পারেনি। পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাঙালির স্বাধীনতা দীর্ঘকাল ইংরেজদের হাতে আটক থাকলেও বাঙালি জাতি পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে। বাংলার মানুষ কোনদিন পরাধীনতাকে মেনে নেয়নি। মধ্যযুগ হতে এ যাবত এই ভূখণ্ডের মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থানকে বারবার ফিরিয়ে এনেছে।

এই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কালোত্তীর্ণ ব্যাপার। এদের স্থান, গুণ ও বৈশিষ্ট্য চিরদিন উদ্ভাষিত। আর সকল প্রতিবাদী আন্দোলন ও বিদ্রোহের মূলে রয়েছে দেশপ্রেম। একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যখন এই উপলব্ধি জন্মে যে তারা পরাধীন, কিছুকালেল জন্য দমিয়ে রাখা গেলেও চিরকাল কোনো শক্তিই তাদের স্বাধীনতা চ্যুত রাখতে পারেনি।

ভারত বর্ষে প্রথম থেকে শেষ অবধি সকল আন্দোলন কার্যত উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে হলেও ইংরেজ বেনিয়া আর পশ্চিমা দস্যুরা হিন্দু এবং মুসলমানদের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য ধর্মের অন্ধ ধুম্রজাল সৃষ্টি করে উপমহাদেশের দুটি অংশের দুটি এলাকা নিয়ে ধর্ম ভিত্তিক একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। যার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব। পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী প্রথম থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, ভৌগলিক কারণে দীর্ঘকালের উপনিবেশ থেকে এই নতুন রাষ্ট্রটি বেরিয়ে এলেও এর অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখা যাবেনা। যেজন্য পশ্চিমা শাসকরা সব সময় এখানে একটি বিকলাঙ্গ তাবেদার শ্রেণীর হাতেই ক্ষমতা রাখতে প্রচেষ্টা করেছে। তারা চায়নি কখনও পূর্ব বাংলার জনগণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। দেশের পশ্চিম অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার জন্য পুর্ব বাংলাকে তারা কাঁচামাল উৎপাদনের বাজার হিসেবে মনে করতো। পশ্চিমা শাসকরা কখনও এই অঞ্চলের মানুষের জন্য শিল্প কারখানা, যোগাযোগ, ভূমি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চাকুরী, প্রতিরক্ষা এবং জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চিন্তা করেনি। যেজন্য এই অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন না ঘটলেও দেশের অপর অংশে বিপুল সমৃদ্ধি ঘটে।

এখানে পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যের একটি চিত্র দেয়া হলো ঃ

	পশ্চিম পাকিস্তান	**পূর্ব পাকিস্তান**
বেসরকারী বিনিয়োগ	৭৫%	২৫%
বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি	৮%	৪%
রপ্তানী আয়	৩০%	৭০%
আমদানী ব্যয়	৭৫%	২৫%
রাজস্বখাতে ব্যয় –(টাকা)	৫০০০ কোটি	১৫০০ কোটি

চাল প্রতিমন	২৫.০০	৫০.০০
আটা প্রতিমন	১৫.০০	৩০.০০
তেল প্রতিসের	২.৫০	৫.০০
স্বর্ণ প্রতিতোলা	১৩৫.০০	১৬৫.০০
বৈদেশিক সাহায্য ব্যয়	৭০%	৩০%
কেন্দ্রীয় পি.এস.সি	৮৫%	১৫%
কৃষি ব্যয়	৭৯%	২১%
শিক্ষা ব্যয়	৭৩%	২৭%
বৈদেশিক ঋণ বহন	৪৪%	৫৬%
জনসংখ্যার হার	১৩৫% (প্রঃবর্গ মাঃ)	৯২২%
স্থল বাহিনীতে চাকুরীর হার	৯৫%	৫%
নৌ বাহিনীতে চাকুরীর হার	৯১%	৯%
বিমান বাহিনীর পাইলট	৮৯%	১১%
সশস্ত্র বাহিনী (সংখ্যায়)	৫,০০,০০০ জন	৪৫,০০০ জন
পাকিস্তান এয়ার লাইন্স (সংখ্যায়)	৭,০০০	২৮০
বৈদেশিক দপ্তর	৮৫%	১৫%
কেন্দ্রীয় বেসরকারী দপ্তর	৮৪%	১৬%
বিদেশী মিশনের প্রধান কর্মকর্তা	৬০ জন	৯ জন
বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান	৮২%	১৮%
উন্নয়ন খাতে খরচ	৭৮%	২২%
পাকা রাস্তা ঘাট	৭৬%	২৪%

অথচ পাকিস্তানে মোট জন সংখ্যার ৫৬% বাস করতো পূর্ব পাকিস্তানে, আর পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করতো ৪৪%। পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য দূর এবং বাঙালি জাতিকে পদানত করে রাখার পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম রুখে দাড়িয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯ এর ১১ দফা আন্দোলন এবং '৬২ থেকে '৬৯ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের পিছনে বঙ্গবন্ধুর সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পরামর্শ ছিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আজও সে কথা স্বীকার করেন। জনগণের সাথে

সম্পৃক্ত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন কোনো ঘটনার সাথে ইতিহাস কখনও প্রবঞ্চনা করেনা। সময়ের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সত্যের বিকাশ লাভ ঘটেই। এই নির্মম ন্যায় নিষ্ঠ ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনা। কারও অবদানকে অস্বীকার করার শক্তিও তার নেই। একই ধারায় ষাইট-এর দশকে বাঙালির ঐতিহাসিক সশস্ত্র বিদ্রোহের গৌরবকেই কেবল উপেক্ষা করা হয়। এই দশকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

উল্লেখ্য যে, আমরা সব সময় বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানার কথা বললেও সঠিক ইতিহাস সৃষ্টির জন্য দেশের ইতিহাসবীদগণ সেইভাবে এগিয়ে আসেননি। কেবল তাই নয়, বৃটিশ ভারত থেকে পৃথক হবার পর এদেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরাও তাঁদের স্মৃতি কথা রেখে যাননি। আমাদের জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টিতে যা বড় ঘাটতি। বলা যায় সময়ের প্রেক্ষাপট তখন এই সব আন্দোলনের কথা প্রকাশের অনুকূল ছিলনা। '৭১ এর বিজয় অর্জনের পর তেমন ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও আগত ভবিষ্যতের জন্য হয়ত লেখক ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা করছিলেন। এত ক্ষণ সময়ের ব্যবধানে অনেক আন্দোলন আর প্রতিবাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি জাতি আবার তিমিরে তলিয়ে যাবে একথা কল্পনায় আনা যায়না। তেইশ বছর যাবত পশ্চিমা এবং আরও বিশ বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দেশীয় সামরিকশাসন এদেশে চলেছে, তাই সেক্ষেত্রে ভাবা যায় বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও সঠিক ইতিহাস সৃষ্টি বাস্তবিক ভাবেই অসম্ভব ছিল।

যদিও কোনো জাতির ইতিহাস একদিনে সৃষ্টি হয়না। ধারাবাহিকভাবে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার সাথে পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনার যোগসূত্রেই সৃষ্টি হয় ইতিহাস। আনুক্রমিক ঘটনার মধ্য থেকেই জাতি আগামী দিনের সংকট কাটিয়ে ওঠার পথ খুজে পায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অবাস্তব, অবাঞ্ছিত, হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। বাঙালির বহু কালের ধারাবাহিক আন্দোলনের অনেক সিঁড়ি বেঁয়ে আসা সর্বশেষ উত্থান 'স্বাধীনতাযুদ্ধ'। এর যেমন প্রাগ ইতিহাস আছে তেমনই আছে তাৎপর্য। ইতিহাসের পিছন দিকে তাকালে দেখা যায় বাঙালি জাতি আলাদা স্বকীয়তায় বেঁচে থাকার জন্য বহু যুগ পূর্ব থেকেই সংগ্রাম এবং আন্দোলন করে আসছে। বলা হয়ে থাকে বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস বঙ্গদেশের প্রথম যুগের বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। তাহলে মনে করা

যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৬৭-১৮০০) নামক কৃষক বিদ্রোহ এ দেশের বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস প্রণেতা উইলিয়াম হান্টার স্বীকার করেছেন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সন্ন্যাসীরা ছিলো বঙ্গদেশের জমিহারা গৃহহারা বুভুক্ষ কৃষক। ১৮৬০ সালের নীল চাষীদের বিদ্রোহ ছিল এই দেশেরই কৃষকদের সৃষ্ট বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আঘাত। এছাড়াও আসামের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৬১-১৮৯৪), ১৮৫৫ সালে বাংলা ও বিহারের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৭২ সালে সিরাজগঞ্জে ঈশানচন্দ্র রায়, গঙ্গাচরন রায়, রাজু সরদার এর নেতৃত্বে 'কৃষক বিদ্রোহ', ঢাকা অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে ব্যারিষ্টার প্রথম নাথ মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, যতীন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সরলা দেবী, পুলিন দাস বঙ্গদেশেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। একই পরিক্রমায় যুগান্তর সমিতির বাঘা যতীন, খুলনা-ফুলতলার অলকা গ্রামের সুধীর চন্দ্র দে, শোলপুর গ্রামের নগেন্দ্রনাথ সরকার, খুলনার অবনী চক্রবর্তী, শচীন্দ্রলাল মিত্র, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনী কুমার বসু, কালিদাস ঘোষ, নগেন্দ্র নাথ চন্দ্র, ঢাকার পুলিন দাস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দীপান্তরিত হন ১৯০৪ সালে। বিপ্লবের ইতিহাস জানতে হলে বাঙলার বিগত ৯০ বৎসরের ইতিহাস চর্চা করতে হবে। বাঙলার বিপ্লববাদের ইতিহাস, বর্তমান বাংলার ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া যায়না। কারণ এই বিপ্লব বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়নি। এ ইতিহাস বাঙলার জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র। বাঙলার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় স্বাধীনতার আকাঙ্খায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল এ সকল বিদ্রোহ। বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলায়। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাষ্টারদা সুর্য সেন, প্রীতিলতা, সুভাস বোস, তিতুমীর এই বিদ্রোহের আগুনে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার জন্য।

সুদূর অতীতে এইসব জীবন উৎসর্গের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটা ধারাবাহিকতা আছে। সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সূচিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার অব্যাহত ধারা যেমন আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীকার আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে তদ্রুপভাবে স্বায়ত্বশাসনের দাবি থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জনের দাবিতে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে পথ দেখিয়েছে।

১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ১৯৫৯ সালে ময়মনসিংহে "ইষ্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি'র সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার গোপন তৎপরতা, ১৯৬১ সালে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমন্বিত প্রস্তুতি গ্রহণ সবই বায়ান্নর অগ্নি নিসৃত আন্দোলনের গর্ভ থেকে উত্থিত। ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একদল গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন সশস্ত্র বিপ্লবের। যাদের মাঝে অন্যতম ছিলেন, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমদ। তাঁরা অত্যন্ত গোপনতা বজায় রেখে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে দেশময় বহু সদস্য সংগ্রহ করেন। ১৯৬৪ সালে এই তিনজন ছাত্র নেতা তাঁদের পরিকল্পনার কথা শেখ মুজিবুর রহমানকে জানালে তিনি এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার কথা ভাবতেন এর যথার্থতা তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত আলাপ চারিতা থেকেও প্রমাণ মেলে।

১৯৭০ সালে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকীতে তিন নেতার মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় বলেন "অতঃপর এই দেশের নাম হবে বাংলাদেশ"। ডঃ আব্দুল ওয়াজেদ মিয়া তাঁর পুস্তকে বিভিন্ন যায়গায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভাবনার কথা বর্ণনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চে রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রকৃত অর্থে অনানুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল।

শেখ মুজিব '৭০ এর অগ্নিঝরা দিনগুলিতে যেমন জনগণকে সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানী শাসকদের সাথে আলোচনাও চালিয়ে যান। যদিও জানতেন সেই আলোচনা নিষ্ফল হবে। ছাত্র জনতার প্রবল ইচ্ছা ও চাপের মুখেও সেদিন আনুষ্ঠানিক পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা দান থেকে বিরত ছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে আগে আঘাত আসুক তাহলেই বাঙালি জাতি তাদের আঘাতকে প্রত্যাঘাত করতে ঐক্যবদ্ধ হবে। বাস্তবে ঘটনা ঘটেছিল তাই। ৭১'এর ১লা মার্চ, ইয়াহিয়া বেতার ভাষণের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার প্রায় সকল স্থানে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বাধীনতার শ্লোগানে মুখরিত করে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশ। বাঙালিরা সেইদিনই মন থেকে পাকিস্তানের ভাবনা মুছে ফেলে। ২রা মার্চ, সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।

এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্ররা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ছাত্র সভায় বক্তব্য রাখেন আ.স.ম রব, মরহুম আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ। স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন আঃ রব। ছাত্ররা সেইদিন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনেও বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়।

৩রা মার্চ ও হরতাল হয় এবং এদিন থেকে বাংলাদেশের প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে। ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ সময় বিদেশীরা দলে দলে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে থাকে। পাকিস্তানীরা সামরিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। এদিন সোয়াত জাহাজে করে পাকিস্তানীরা সামরিক সরঞ্জাম চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠায়। ১৮ মার্চ অস্ত্র ভর্তি জাহাজ 'সোয়াত' চট্টগ্রাম পৌছলে বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে এই অস্ত্র খালাস করতে আদেশ দিলে তিনি অস্বীকার করেন। ২২ মার্চ ব্রিঃ মজুমদারকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বদলি করে আনা হয়। ২৪ মার্চ থেকে হাজার হাজার ডক শ্রমিক হাতে লোহার রড নিয়ে জাহাজ ঘিরে রাখে। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বাঙালি মেজর জিয়াকে দায়িত্ব দেয়া হয় সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাস এর জন্য। দায়িত্ব পালনের জন্য রাত ১০-৩০ মিনিটে জিয়া বন্দর টিলায় পৌঁছলে বাঙালি ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তাকে বুঝিয়ে সেখান থেকে ফেরত নিতে সক্ষম হন। জিয়া সোয়াতে পৌঁছলে সেখানে তাকে হত্যা করা হতো একথা তাকে বোঝানো হয়। মেজর জিয়া সেনা নিবাসে ফিরে বিদ্রোহ করেন।

এসময় প্রতিটি দিন আন্দোলন, প্রতিবাদ, হরতাল অসহযোগের মধ্যে চলতে থাকে। এরপূর্বে ১৬ই মার্চ থেকে ইয়াহিয়া আলোচনার নামে কালক্ষেপন এবং গোপনে সামরিক প্রস্তুতি এবং গণহত্যার নীল নকশা প্রস্তুত করছিল। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী কতৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন। আলোচনার মাঝেই তিনি এই মাসের ১৮ তারিখে চার ছাত্রনেতা আঃ রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, শহীদ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমদ কে ভারতে গিয়ে ভারতীয় কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। চিত্তরঞ্জন ছুতারকে শেখ মুজিব পূর্বাহ্নেই ভারত পাঠিয়েছিলেন। তিনি কলকাতার ২১ নং রাজেন্দ্র রোডের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তোফায়েল আহমদ এবং মরহুম মনি কলকাতায় উক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করেন। আঃ রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদ সাতক্ষীরাতে ভারত থেকে পাঠানো অস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তোফায়েল আহমদ ও মরহুম মনি যথা সময়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে না পারায়

কাজী আরেফ ও আব্দুর রাজ্জাক ভারত চলে যান। তৎকালীন ছাত্র নেতা এবং বর্তমান জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ এই তথ্য দেন। বঙ্গবন্ধুর আহবানে ১লা মার্চ হতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাঙলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন পুরোপুরি সফল হয় এবং এর মাঝে কোন সরকারের অস্তিত্ব না থাকলেও জনজীবন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে আওয়ামী লীগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সমর্থ হয়।

২২শে মার্চ বায়তুল মোকারমে প্রাক্তন সৈনিক ও সেনা অফিসাররা সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু কর্নেল ওসমানিকে বাঙালি সামরিক অফিসারদের সাথে যোগাযোগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা কর্নেল ওসমানীর নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। তিনি এদিন পল্টন ময়দানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভিবাদন গ্রহন করেন।

২৫শে মার্চের পূর্ব থেকেই দেশব্যাপী ছাত্র, যুবক, শ্রমিক জনতা অঘোষিত যুদ্ধ সাজে সাজতে থাকে। তখনও বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে অটল থেকে পাকিস্তান জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা বৈঠক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানায় ই,পি,আর সদর দপ্তর সহ ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যায়গায় হামলা চালালে বঙ্গবন্ধু সেদিন রাতেই স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষনাবাণী প্রচার করে বাঙালিদের প্রতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেন।

২৫শে মার্চ পর্যন্ত সমস্ত বাঙালি স্বাধীনতার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেনাবাহিনীর এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ছিলনা। সুদক্ষ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী – বাঙালি সৈন্যদের এমনভাবে সৈন্য বাহিনীর অভ্যন্তরে সাজিয়ে রেখেছিল যাতে তারা কখনো জোটবদ্ধ হতে না পারে। ফলে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বাঙালি অফিসার ও সৈন্যরা বিক্ষিপ্তভাবে স্বাধীনতার পক্ষে থাকলেও তারা জোটবদ্ধভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে তদানিন্তন ই,পি,আর ও পুলিশ বাহিনীর অবস্থানগত কারণে অনেকটা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ ছিল এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভেই সে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিনগুলিতে ছাত্র-যুবক ও সেবামরিক লোকদের সাথে আধাসামরিক বাহিনী ই,পি,আর ও পুলিশের অংশ গ্রহন মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত হতে সাহায্য করে। তাছাড়া তাদের অংশ গ্রহণে কিছু অস্ত্র ও স্বাধীনতা কামীদের হাতে চলে আসে। সেদিন হানাদার বাহিনী, ই,পি,আর ও পুলিশের প্রতিরোধে সম্মুখীন না হলে আরো নিরিহ জনতাকে প্রাণ হারাতে হতো।



৬৯ এ সামরিক শাসনের প্রতিবাদ মিছিলে বেগম সুফিয়া কামাল পিছনে শেখ হাসিনা



'৬৯ আন্দোলনরত নেতা কর্মিদের ইডেন কলেজের মেয়েরা পানি খাওয়াচ্ছে



ইডেন গালর্স কলেজের মেয়েরা পুলিশের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে



সায়ত্ব শাসনের দাবিতে রাজপথে মিছিল (১৯৬৮)



'৬৯ এ সচিবালয়ের সামনে শুয়ে ছাত্ররা ব্যারিকেড তৈরী করে



অগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে আদালতে হাজির করার জন্য নেয়া হচ্ছে।



২৪ জানুয়ারী গুলিতে শহীদ হন আসাদ



'৬৯ এ নবকুমার ইনষ্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান



অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ হন অধ্যাপক জোহা।



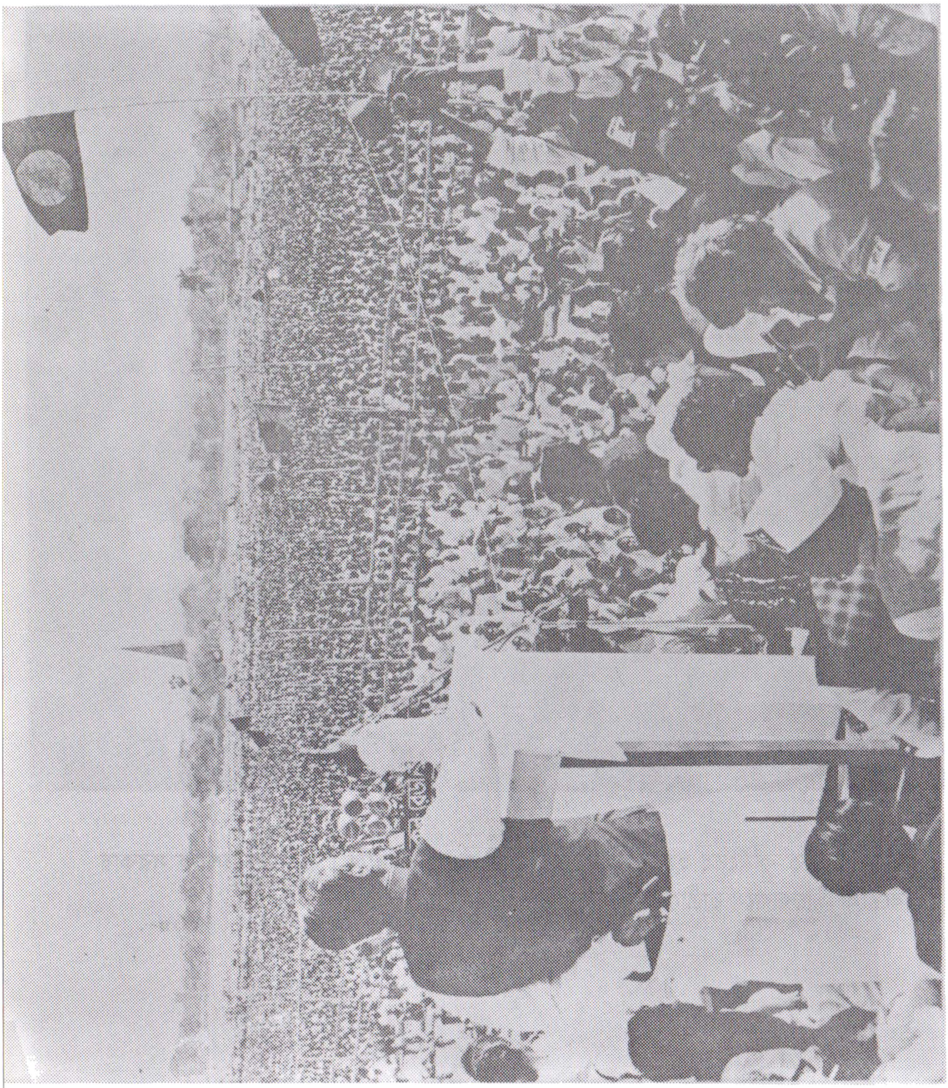
সার্জেন্ট জহুরুল হক



আগরতলা মামলায় শহীদ হন সার্জেন্ট জহুরুল হক।



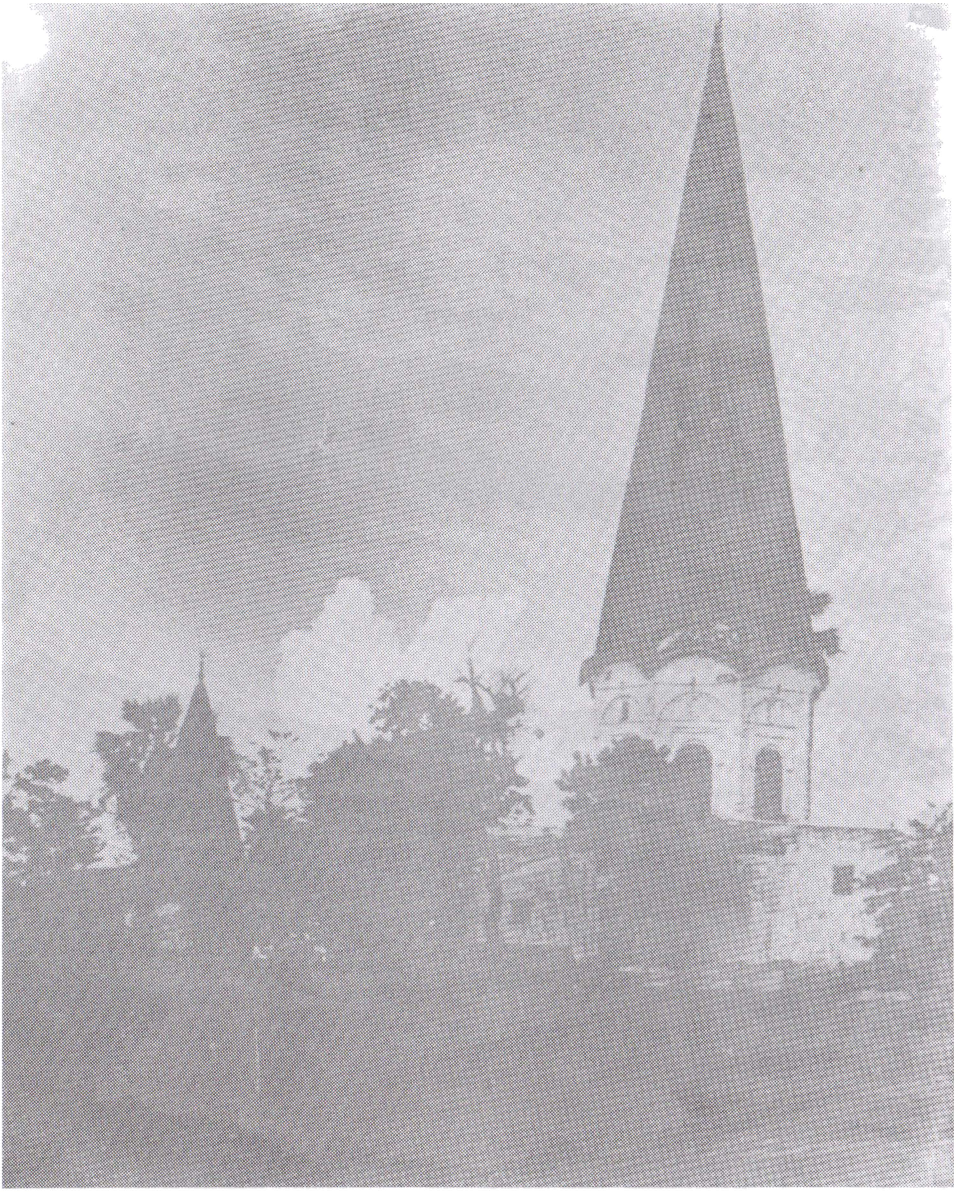
আন্দোলনরত কর্মিদের ইডেন কলেজের মেয়েরা পানি দিচ্ছে। ৬০ এর দশকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।



বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন



’৬৯ এর অভূতপূর্ব গনআন্দোলনে মেয়েরাও পিছিয়ে ছিলনা



পাকিস্তানী হানাদাররা রেসকোর্সের এই মন্দিরটিও গুড়িয়ে দেয়।



২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে জনগণ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধে আধা সামরিক বাহিনীর অংশ গ্রহণে যে স্বতঃস্ফুর্ততা ও প্রচেষ্টা ছিল সেনা বাহিনীর ভূমিকা ঠিক ততটা লক্ষ্য করা যায়নি। ২৭শে মার্চ যখন দেশের বহু স্থানে পাক বাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন এবং রীতিমত গোলাগুলি ও হত্যাযজ্ঞ চলছে তখনও বহু বাঙালি সৈনিক ও সেনা অফিসারকে তার কর্মস্থলে যোগদান করতে দেখা গেছে। পরবর্তী সময়ে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে উঠলে অধিকাংশ স্ব-উদ্যোগে কর্মস্থল ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

সেনাবাহিনীর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিলো চট্টগ্রামে। তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিক (বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ২৫ মার্চ রাত ৮-৩০ মিনিটে (চট্টগ্রামে) পাকিস্তান বাহিনীকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করেন। মেজর জিয়া ও বিদ্রোহ করেন যখন তিনি নিশ্চিত হন যে, পাকিস্তান সেনারা তাকে ও সকল বাঙালি সেনাদের হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে।

২৬শে মার্চ, দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আওয়ামী লীগ নেতা এম,এ, হান্নান। ২৭ শে মার্চ চট্টগ্রামে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দুইবার স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন মেজর জিয়া। প্রথমবার তিনি নিজের নামে ঘোষনা দেন। সেই দিনই আবার সংশোধন করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র পড়ে শোনান। সেদিন মেজর জিয়ার কণ্ঠে এই স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হওয়ায় সেনাবাহিনী ও জনগণের মাঝে বিপুল উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চারিত হয়েছিলো। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে একথা অনস্বীকার্য যে, সেইদিন একজন পদস্থ বাঙালি সেনা অফিসারের নিকট থেকে এমন নির্দেশ প্রদান ছিলো গুরুত্ববহ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে একথা স্বীকার করতে হবে, মুক্তিযুদ্ধ যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি, একাত্তরে যিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনিও একদিনে মুক্তিযোদ্ধা হননি। এর পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। ইতিহাসের এই অনুক্রমিকায় অভ্যুদয় ঘটেছে বাংলাদেশ নামের এই দেশ। যার রূপকার শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শেখ মুজিবুর রহমান।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়ে আছে একটি ঐতিহাসিক মামলা 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অবিহিত। এর সাথে জড়িত অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিমা শাসক শ্রেণী দেশের পূর্ব অংশের জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত করতে থাকে। ফলে ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে, পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের মাঝে এই উপলব্ধি জাগ্রত হওয়ার পর থেকে তারা পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির উপর আস্থা হারাতে থাকে। ফলে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব কর্তৃক উপস্থাপিত ছয়দফা দাবি জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। এর পাশাপাশি সামরিক ও বেসামরিক সদস্যবৃন্দ সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার একটি পরিকল্পনা চালিয়ে আসছিলেন। ১৯৫৮ সালে নৌ-বাহিনীর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে প্রথম এই বিদ্রোহের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তাঁদের ধারণা ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল সম্ভব হবে। প্রস্তুতি পর্বে এর সাথে কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক না থাকলেও পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী, কর্ণেল (অবঃ) ওসমানী ও কয়েকজন পদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে তাঁদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কমান্ডার মোয়াজ্জেম পরিকল্পিত নতুন রাষ্ট্রের একটি শাসনতন্ত্রও রচনা করেছিলেন এবং রাষ্ট্রের নাম, পতাকা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছিল। মনোরা দ্বীপের হিমালয়া নৌ-ঘাটিতে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালির বিদ্রোহের পরিকল্পনা এই প্রথম।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন যদিও অতিমাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষা করতেন তবুও প্রয়োজনে তিনি বিশ্বস্ত কয়েকজনের কাছে এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তাঁদের সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত করেন। কিন্তু এই

পরিকল্পনার বিষয় পাকিস্তান রাষ্ট্রশক্তির কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন, ৩৫ জন বাঙালিকে আসামী করে একটি রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করে এবং আসামীদের বন্দী করে।

এরপূর্বে বিদ্রোহীরা দীর্ঘ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁদের কর্মতৎপরতা এগিয়ে নিয়ে যান। অসংখ্য গোপন মিটিং ও কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থ এবং অস্ত্রও সংগ্রহ করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে তাঁদের গোপন কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের দ্বিতীয় দফায় আলোচনা হয় এবং শেখ মুজিব তাঁদের সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেলেন। ব্রিদাহীদের অন্যতম এবং বর্তমানে জীবিত মোহাম্মদ খুরশীদ (নেভী) জানান বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে শেখ মুজিবের তিন অথবা চারবার গোপন বৈঠক হয়েছিল। প্রতিবারই শেখ মুজিব তাঁদের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন এবং তার সহযোগিতার কথা বলেন। এই মামলার আট নম্বর আসামী কর্পোরেল (অবঃ) আব্দুস সামাদ ও ঘটনার সত্যতা এবং অস্ত্র সংগ্রহের কথা স্বীকার করেছেন। মামলার অপর আসামী লেঃ কঃ (অবঃ) আব্দুর রউফ পরিকল্পনাকারীদের যেসব গোপন বৈঠক হত তিনি তার বিবরণ লিখে রাখতেন। তিনিও এই পরিকল্পনা সত্য বলে জানিয়েছেন।

এই সময় আন্দোলনের অপরাপর ধারার সাথে আরও অনেকে জড়িত ছিলেন, যেমন সিলেটের চা বাগান মালিক ও ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম আহ্মেদ চৌধুরী, রুহুল কুদ্দুছ, সরফুদ্দিন, জহিরউদ্দিন প্রমুখ। ৬২'র ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমান গোপনে আগরতলা গিয়েছিলেন। তাঁদের একটা ছোট গ্রুপ ও স্বাধীনতার চিন্তাভাবনা করতেন। গোপনে তাঁরাও মিটিং করেছেন। ইন্ডিয়া ও রাশিয়া থেকে অস্ত্রসহ সাহায্যের প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। তবে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম গ্রুপের সাথে এই গ্রুপের যোগাযোগ হয়নি। সম্ভবত শেখ মুজিব উভয় গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও কৌশলগত কারণে তাদের পরিচয় ঘটাননি। ৬২'তে শেখ মুজিবের সাথে আগরতলা গিয়েছিলেন রেজা আলী, জাকির খান চৌধুরী, তারেক আহ্মদ চৌধুরী, সহিদুল হাসান এবং আরও

একজন এম,এল,এ। শ্রীমঙ্গল এর কিংসটন চা বাগান হয়ে তারা আগরতলা পৌছেন। কিন্তু ভারত সরকার বিষয়টিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না করায় শেখ মুজিব সহ অন্যরা আগরতলা থেকেই ঢাকা ফিরে আসেন এবং পরের দিনই শেখ মুজিবকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৩ সালে শেখ মুজিব পুনরায় গোপনে আগরতলা গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে দেখা করে তাঁর মাধ্যমে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। এই বিদ্রোহী গ্রুপ কর্ণেল এম.এ.জি ওসমানীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানালে তিনি বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই মামলার ফলে রাজনৈতিক গণসচেতনতা জাগ্রত হয়। সাথে সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে। মামলার আসামীরা ব্যাপক জন সমর্থন অর্জনে সমর্থ হন। অন্যদিকে সরকারের কাছে এই মামলা আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সরকার নিঃশর্ত ভাবে মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। একজন বাদে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি '৬৯ তারিখ মুক্তি দেয়া হয়। উল্লেখ্য ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আসামী আমীর হোসেন বিশ্বাস-ঘাতকতা করে পিণ্ডিতে নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহ সংক্রান্ত সমস্ত গোপন ঘটনা লিখিত ভাবে ফাঁস করে দিয়েছিল। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দী অবস্থায়ই ৫ই ফেব্রুয়ারি '৬৯ ঢাকা সেনানিবাসে হাবিলদার মঞ্জুর সাহ্ গুলি করে হত্যা করে।

রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এই ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ হলেন ঃ

শেখ মুজিবুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সুলতানউদ্দিন আহমদ (লিডিং সীম্যান), নূর মোহাম্মদ (লিডিং সীম্যান), আহ্মেদ ফজলুর রহমান, সি,এস,পি মফিজউল্লাহ, (ফ্লাইট সার্জেন্ট), আব্দুস সামাদ কর্পোরেল (অবঃ), দলিলউদ্দিন হাবিলদার (অবঃ), রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফজলুল হক (ফ্লাইট সার্জেন্ট), ভূপতি ভূষণ চৌধুরী, বিধান কৃষ্ণসেন, আব্দুর

রাজ্জাক সুবেদার, মুজিবুর রহমান (হাবিলদার), আব্দুর রাজ্জাক (ফ্লাইট সার্জেন্ট), জহুরুল হক (সার্জেন্ট), মোহাম্মদ খুরশীদ (এ্যাবল সীম্যান), খান শামসুর রহমান (সিএসপি), এ কে এম শামসুল হক (হাবিলদার), আজিজুল হক (হাবিলদার), মাহফুজুল বারী, শামসুল হক (সার্জেন্ট), শামসুল আলম (মেজর), আব্দুল মোতালিব (ক্যাপ্টেন), শওকত আলী মিয়া (ক্যাপ্টেন), খন্দকার নাজমুল হুদা (ক্যাপ্টেন), এ,এন,এম নূরুজ্জামান (ক্যাপ্টেন), আব্দুল জলিল (সার্জেন্ট), মাহবুবউদ্দিন আহমেদ, এসএমএম রহমান (লেফটেন্যান্ট), তাজুল ইসলাম (সুবেদার), আলী রেজা, খুরশীদউদ্দিন আহমেদ (ক্যাপ্টেন), আব্দুর রউফ (লেফটেন্যান্ট)।

এই মামলায় বিবাদী পক্ষে কৌসুলী ছিলেন ঃ টমাস উইলিয়ামস কিউ,সি। সহায়তাকারী ঃ আমিরুল ইসলাম, মওদুদ আহমেদ, আব্দুস সালাম খান, জহীরুদ্দীন, মশিউর রহমান, মোল্লা জালালউদ্দিন, জুলমত আলী খান, কে জেড আলম, ভি আই চৌধুরী, শওকত হোসেন, নূরুল আলম, আতাউর রহমান খান, আমিনুল হক, বদরুল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ।

'৬৬ থেকে '৬৯ এর গণআন্দোলন ও '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে শাসক শ্রেণীর ভরাডুবি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অভিযুক্তদের মুক্তিলাভ দেশের সর্বস্তরের মানুষকে দাবি আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় করে তোলে। '৬৯ সালে ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে সমগ্র ছাত্র সমাজের মাঝে এক অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠে। জনগণও পশ্চিমা শাসক শ্রেণীর হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্খায় ছাত্রদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। ফলে সৃষ্টি হয় ছাত্র জনতার দৃঢ় বন্ধন। '৬৯ এর ২৫ মার্চ লৌহমানব সামরিক শাসক আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের উপর দায়িত্ব অর্পন করে নিজে সরে দাঁড়ান। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া ঘোষণা দেন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই তার লক্ষ্য। ৩১ মার্চ ইয়াহিয়া সামরিক আইন প্রশাসক হতে প্রেসিডেন্ট হলেন এক ফরমান জারীর মাধ্যমে। ওই সালের জুন মাস হতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচন ঘোষনার দাবি তুলতে থাকে বিভিন্ন সমাবেশে। স্বায়ত্বশাসন প্রশ্নে ৭ জুলাই আওয়ামী লীগ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহ্মদ-নসরুল্লা খানের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে প্রয়োজনে স্বায়ত্বশাসন প্রশ্নে গণভোট প্রদানের আহ্বান জানান। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু সহ আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ দেশ ব্যাপী ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সাংগঠনিক সফর অব্যাহত রাখে। ২২ ডিসেম্বর ঘোষণা দেয়া হয় পহেলা জানুয়ারি হতে জনসভা ও মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবেনা। ২৩ শে ডিসেম্বর ইয়াহিয়া বলেন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। ডিসেম্বর হতে '৭০ মার্চ পর্যন্ত জেলায় জেলায় ঘুরে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনের জন্য জনগণকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তোলেন। রাজনৈতিকভাবে এ সময় বঙ্গবন্ধু নির্বাচনকেই সামনে আনেন। বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল শাসনতন্ত্র দেয়ার মালিক কেবল নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই।

বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যের প্রচেষ্টা চালালেও চীন পন্থীরা নির্বাচন থেকে সরে দাড়িয়ে গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া ডানপন্থী অসংখ্য দলের বক্তব্যে বিভ্রান্ত হয়ে ধরে নেয় ছাত্র এবং শ্রমিকদের খুশি রাখতে পারলেই আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা সম্ভব হবে। তাই তারা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহন করে।

'৭০ এর ১লা জানুয়ারী হতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভা ও মিছিলের অনুমতি দেয়া হয়। ১লা জানুয়ারী পল্টন ময়দানে প্রথম জনসভা করে শ্রমিক লীগ। ১৬ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ময়মনসিংহে তাঁর প্রথম নির্বাচনী জনসভায় ঘোষনা দেন, শোষন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর লক্ষ্য। এ সময় ৬ দফা ও ১১ দফা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। জনগণ এই দুটি দফাকে নিজেদের একান্ত নিজস্ব দাবি হিসেবে ভাবতে থাকে। বঙ্গবন্ধু প্রতিটি সভায় শোষকদের বিরুদ্ধে এবং শোষিতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহনের আহবান জানাতে থাকেন। অতীত শাসকদের শোষনের রাজনীতির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের এই বক্তব্য অত্যন্ত গ্রহনীয় হয়ে উঠে। অপরদিকে পশ্চিমা শাসক শ্রেণীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল কোন দলই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবেনা।

সে সময় পশ্চিমের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক ছিলেন জুলফিকার আলী ভূট্টো। তার পিপলস্ পার্টি সহ অন্যান্য দলও নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে তখন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেন। ফলে পুনরায় আওয়ামী লীগের উপর ভয় ভীতি প্রদর্শন সহ জেল-জুলুম চাপিয়ে দেয়া হয়। এমনকি আওয়ামী লীগের উপর পুনরায় আগরতলা মামলা চাপিয়ে দেয়া হবে এমন কথা কারও কারও মুখে উচ্চারিত হয়। বন্যার কারণ দেখিয়ে নির্বাচন পিছানোর ফলে ইসলামী পন্থী বলে দাবীদার দলগুলি বেশ খুশি হয়। ৪ অক্টোবর, ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা দেয়। ১১ অক্টোবর ভাসানী লাহোরে এক জনসভায় বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে বিশ্বাস করিনা'। এদিন ভাসানী ন্যাপ জাতীয় পরিষদে ১৭ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র ৩৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে সক্ষম হয়।

১৯ অক্টোবর ভাসানী হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, "সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে গৃহযুদ্ধের পায়তারা করছে"। ২০ অক্টোবর বলেন, "নির্বাচন একটি বিলাসিতা জেনেও অংশ নিয়েছি"। অনেকে এমন ভেবে থাকেন নির্বাচনকে বৈধ করার জন্যই ভাসানী নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ কেউ ঠেকাতে পারবে না। ভাসানীর নির্বাচনে অংশ গ্রহনের সিদ্ধান্তের কারণে ভাসানীপন্থী শ্রমিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সিরাজুল হোসেন খানের নেতৃত্বে একাংশ ভাসানীর বিরুদ্ধে চলে যায়। ওয়ালী ন্যাপ নির্বাচনী ঐক্য না করার জন্য

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। ১লা অক্টোবর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়ে অসংখ্য লোক নিহত হয়। নভেম্বর হতে সারাদেশে নির্বাচনী প্রচারণা সর্বাত্মক তুঙ্গে উঠে। এই সময় আমেনা বেগম, ন্যাপ নেতা মহিউদ্দিন, মশিউর রহমান, প্রমূখ নেতা ৬ দফার সমালোচনায় ফেটে পড়েন এবং নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। অনেক প্রতিকূলতার মাঝে ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ব্যাপক ব্যবধানে জয়লাভ করে। দু'দফা নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মাঝে আওয়ামী লীগ পায় ১৬০টি আসন। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোন আসন পায়নি। মহিলা ৭টি আসন সহ ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। কেন্দ্রীয় শাসক চক্র, দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা হতভম্ব হয়ে পড়েন নির্বাচনে ফলাফল দেখে। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮টি আসনের মাঝে ভূট্টোর পিপলস্ পার্টি পায় ৮৩টি আসন। মহিলা ৫টি আসন সহ মোট ৮৮টি আসন অর্জন করে। নির্বাচনে ব্যাপক ব্যবধানে বিজয় অর্জনের পরও, বঙ্গবন্ধু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথেই আবার প্রদেশ সফরে বের হন, নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে ঐক্য সংহত রাখতে। ৩০ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসবে ঢাকায়।

৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। এ নির্বাচনে লাগাতার পশ্চিমা বিরোধী বক্তব্য এবং একটি দেশের দুই অংশের মাঝে বৈষম্য জনগণের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পর জনগণের চেতনা এমন এক স্তরে পৌঁছে যে, সেখান থেকে ফেরার পথ আর কারো থাকে না।

৪ঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু যে বক্তব্য রাখেন পরদিন ইত্তেফাক পত্রিকায় তা এভাবে প্রকাশিত হয়, "শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল ৪ঠা জানুয়ারি রমনা ময়দানে ছাত্রলীগের ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথির ভাষন দান প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, "দেশে যদি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সে বিপ্লবের ডাক আমিই দিব। আমিও কম বিপ্লবী নই। যদি ৬ দফা আদায়ের সংগ্রামকে ষড়যন্ত্র করিয়া ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়, তবে কয় দফা দিতে হইবে তাহাও আমার জানা আছে।"

ছাত্রলীগ সদস্যদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, "অতি বিপ্লবী কয়েকটি শ্লোগান বা রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরিহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের উদ্ভব ঘটে দেশের মাটি হইতে এবং বিপ্লব উন্মেষের একটা নির্ধারিত কালও আছে।" বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ সদস্যদের আস্তে চল নীতি গ্রহন করার পরামর্শ দিয়া নীতির ভিত্তিতে দলীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, "শক্তিশালী সংগঠন নষ্ট করিলে ৬ দফা ও ১১ দফা আদায়ের সংগ্রাম দুর্বল হইবে। আর ৬দফা ও ১১ দফা ব্যর্থ হইলে দেশে অনাহুত একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে।" তিনি সাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, "তোমরা ৬ দফা আদায় করার সংগ্রামে আমাদের সাহায্য কর। তোমাদেরকে আমি এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি, ৬ দফা ও ১১ দফা ব্যর্থ হইলে কয় দফা দিতে হইবে তা আমার জানা আছে।"

৮ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ আহ্বান বিলম্বের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বিবৃতি দেন। ৯ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র প্রনয়নের জন্য দেশবাসীর সহযোগীতা কামনা করে কিন্তু ১০ ফেব্রুয়ারি ভূট্টো জানায় ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হলে তার দল আন্দোলন শুরু করবে। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পুনরায় ঘোষণা করেন, "জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে ৩রা মার্চ ঢাকায়।" কিন্তু ভূট্টোর বিরোধীতা অব্যাহত থাকে। এসময় ভাসানী-ভূট্টোর অন্যায় আবদারের কাছে মাথা নত না করার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহবান জানান। ১৯ ফেব্রুয়ারি নূরখান বলেন, "পশ্চিম অঞ্চলের মানুষ মানষিকভাবে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছে।" কিন্তু ঐদিন আবারো ইয়াহিয়া-ভূট্টো গোপন বৈঠক করে। অপরদিকে ২০ শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক ভাষনে বলেন, "শহীদদের নামে শপথ নিয়ে ঘোষণা করছি রক্ত দিয়ে হলেও বাংলার স্বাধিকার আদায় করবো।" এসময় শাসনতন্ত্র রচনা নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের মাঝে চরম উত্তেজনা চলতে থাকে। ভূট্টো কোন কিছুর বিনিময়ে বাঙালির হাতে শাসনতন্ত্র রচনার ভার দিতে রাজি হয়না। তিনি সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার আহ্বান জানান। এদিন হতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ব্যাপকহারে সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে আনা শুরু হয়। ভূট্টো নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবেশ ঘোলাটে করে তোলেন।

১লা মার্চ, দুপুর ১২ টায় ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষনে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষনার পর পরই সারা বাঙলাদেশে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন ও মিছিল শুরু হয়। ঢাকায় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে।

পল্টনের জনসভায় তোফায়েল আহ্মদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আঃ রব, আঃ কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন ও ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম বক্তব্য দেন। এদিন জনতার প্রধান শ্লোগান ছিল, "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। ৩রা মার্চ সারা বাংলাদেশে হরতাল আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা মন্তব্য করেন, "গত কয়েক দিনের ঘটনার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, পশ্চিমা কতিপয় শক্তিশালী মহল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংসের জন্য ভূট্টোর সাথে কাজ করছে।" এদিন হতে বাঙালিদের মাঝে সাজ সাজ রব পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বটতলায় ডাকসু ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। সারাদেশে আন্দোলন প্রতিহত করতে আইন রক্ষাকারী দলের সদস্যদের হাতে অসংখ্য নিরীহ জনতা প্রাণ হারায়। ৩ তারিখে পল্টনের জনসভায় পুলিশের হাতে নিহত দশটি লাশ সভাস্থলে আনা হলে অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। এদিন বঙ্গবন্ধু পল্টনের সভায় বক্তৃতা দেন এবং জনতাকে ধৈর্য্য ধারণের জন্য আহ্বান জানান। মূলতঃ সেদিন হতে পূর্ব বাংলার নিয়ন্ত্রণ বঙ্গবন্ধুর হাতে চলে আসে। সকল কাজ কর্ম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই চলতে থাকে। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ৯ মার্চ ভাসানী পল্টনে জনসভায় ঘোষণা করেন, "আপোষের সময় চলে গেছে। মুজিবের সাথে মিশে তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করবেন।"

১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমা শাসকদের ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "কোন শক্তিই বাংলার জনগণের চূড়ান্ত বিজয় প্রতিরোধ করতে পারবে না।"

১২ মার্চ এক বিবৃতিতে তাজউদ্দিন আহ্মেদ বলেন, "বাংলার গণ আন্দোলন এক অভূতপূর্ব গতি লাভ করেছে।" আজম খান বলেন, "ক্ষমতা হস্তান্তরই

বর্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান।” অপরদিকে ভূট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক অদ্ভূত দাবি জানান। এ দাবিতে তার ক্ষমতা লিপ্সু চরিত্রের পরিস্ফুটন ঘটে।

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। ভূট্টো আবারও দু'দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। তিনি বলেন সংখ্যা গরিষ্ঠতা ভিত্তিক সরকার পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের কোন কেন্দ্রীয় সরকার থাকতে পারেনা। অনেকে এ দাবির প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এতে পাকিস্তান দুভাগ হয়ে যাবে। ওয়ালী খান ভূট্টোর প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, “পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল দুটি নয়– একটি।” কিন্তু ভূট্টো প্রতিদিনই বিভ্রান্তি মূলক বক্তৃতা বিবৃতি অব্যাহত রাখেন।

১৬ মার্চ ইয়াহিয়া-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার প্রহসন শুরু করেন। ১৭ তারিখ ও উভয়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে ও লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।”

বিদেশী সাহায্যের ব্যাপারে বলেন, “সাহায্যের প্রয়োজন আমাদের নেই। যা প্রয়োজন সবই বাংলাদেশে আছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারই শুধু আমাদের নেই।”

১৮ মার্চ ধানমন্ডিতে এক সমাবেশে বলেন, “যদি কেউ আমাদের আঘাত হানে আমরাও অবশ্যই প্রতিঘাত হানব।” এদিন চট্টগ্রাম সেনা সদস্যদের একাংশ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। জনগণের আন্দোলনের পাশাপাশি ইয়াহিয়া-বঙ্গবন্ধুর আলোচনা চলতে থাকে। তখন হতে ই,পি,আর-এর বাঙালি সদস্যদের এক অংশ আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে থাকে।

১৯ মার্চ সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা উর্দ্ধতন অফিসারদের নির্দেশ অমান্য করে অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। প্ররিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।

ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য ইয়াহিয়াকে আহ্বান জানান। কিন্তু ভাসানীর আহ্বানে ইয়াহিয়া সাড়া দেননি।

এদিন ইয়াহিয়া, বঙ্গবন্ধু এবং উভয় পক্ষের উপদেষ্টাদেরও বৈঠক হয়। ইয়াহিয়ার পক্ষে ছিলেন এ,আর, কর্ণেলিয়াস, জেনারেল পীরজাদা ও কর্ণেল হান্নান। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ডঃ কামাল হোসেন ও তাজউদ্দিন আহ্মেদ।

২০ ও ২১ শে মার্চ ৬জন সহকর্মীসহ বঙ্গবন্ধু – ইয়াহিয়ার সাথে পুনঃ আলোচনায় বসেন। ২২ মার্চ ইয়াহিয়া, ভূট্টো ও বঙ্গবন্ধুর মাঝে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। এদিন ভূট্টো–ইয়াহিয়ার সাথে পৃথক ভাবে বৈঠক করেন।

ভূট্টোর ৫ জন আইনজ্ঞ ও প্রেসিডেন্টের ৪জন উপদেষ্টার মাঝে বৈঠক হয়। এদিন ভূট্টোর বিরুদ্ধে ঢাকাতে বিক্ষোভ হয়। ভূট্টো সেনাবাহিনীর প্রহরায় থাকেন।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে, ঢাকা সেনানিবাস ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে অন্য কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উঠেনি। তারস্থানে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উড়তে দেখা যায়। বিকালে পল্টনে জনসভায় ভাসানী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামী শপথ করান। এদিন ইয়াহিয়ার নিকট দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য দুটি পৃথক সংবিধান ও কনফেডারেশনের দাবি দিলে ইয়াহিয়া তা মেনে নেয়ার ভান করেন। বেতার টেলিভিশনে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গাওয়া হয়। চট্টগ্রামে বাঙালি সেনা অফিসারদের এক অংশের সামরিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়।

২৪ মার্চ সারাদেশে সামরিক প্রস্তুতিতে তাজউদ্দিন আহ্মেদ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের বক্তব্য আমরা উপস্থাপন করেছি। আমাদের পক্ষ থেকে আর বৈঠকের প্রয়োজন নেই।" ভূট্টো বলেন, "আওয়ামী লীগ যে ধরণের স্বায়ত্বশাসন চাচ্ছে তাকে প্রকৃত স্বায়ত্বশাসন বলা চলেনা। তাদের দাবি স্বার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।"

বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া চলবেনা। কোন রক্তচক্ষু সহ্য করবনা। আমি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য বেঁচে থাকব কিনা জানিনা, তবে আপনাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ৭ কোটি জনগণের দাসত্বের চাইতে নিজের জীবন দেয়াকে শ্রেয় মনে করি।" তিনি আরও বলেন, "আমি যদি আপনাদের নির্দেশ দিতে না পারি তবে আপনারা আরও দৃঢ়তার সাথে ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।"

২৫ মার্চ ভূট্টো বলেন আলোচনা জটিল হয়ে পড়েছে। রাত ১টায় ঢাকায় পাক সেনারা গণহত্যায় নামে। চট্টগ্রামে রাত ৮-৩০ মিঃ ক্যাপ্টেন রফিকের নেতৃত্বে ই,পি,আর সেনারা জনগণের আন্দোলনে যোগ দিয়ে পাক বাহিনীকে আক্রমণ করে। তখন মেজর জিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানো হয় সোয়াত জাহাজ হতে বাঙালি নিধনের জন্য আনা সমরাস্ত্র খালাসের জন্য। এদিন সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়া ও ভূট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। তার পূর্বে তারা বাঙালি নিধনের নীল নক্‌শা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়ে যান। রাত ১২.৩০মিনিট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব প্রস্তুতকৃত তাঁর ছোট ওয়ারলেস সেটে স্বাধীনতার ঘোষনা দেন, যা পীলখানার তৎকালীন ই,পি,আরের ওয়ারলেসে চট্টগ্রামসহ সারাদেশে পাঠানো হয়। ঘোষণাটি ছিল - This may be my last message from today Bangladesh is independence. I call upon the people of Bangladesh where ever you might be and with whatever you have. To resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achived. (সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল পত্র, ৩য় খন্ড)।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী গঠন

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর অতর্কিত হামলা শুরু করে। এই আক্রমণ শুধু জনগণ বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিই নির্দিষ্ট ছিলনা, তারা সামরিক বাহিনীর বাঙালি সৈন্যদের ও নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হলেও সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। রাজনৈতিকভাবে বাঙালি সৈনিকদের প্রতি সুষ্ঠু পূর্ব নির্দেশনার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সামরিক, আধা-সামরিক, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা পক্ষত্যাগ করে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ মত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। প্রায় সর্বত্রই স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন এ ব্যাপারে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। এভাবে প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় সমগ্র জাতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তথা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয় এবং ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে।

'৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রায় সকল বাঙালি ইউনিট সুযোগ মত নিজেদের প্রতিরক্ষায় পাকিস্তানী সেনা ইউনিট থেকে আপাত নিরাপদ দূরত্বের সন্ধান করতে থাকে। কোন কোন ইউনিট প্রাথমিক অবস্থাতেই বিদ্রোহের মাধ্যমে পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পূর্বে ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম ই,পি,আর বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ২৫ মার্চ রাত ৮.৩০ মিনিটে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উল্লেখ্য যে, ই,পি,আর বাহিনীর অফিসারগণ ছিলেন মূলতঃ সেনাবাহিনীর অফিসার , যে কারণে সেনাবাহিনী ও ই,পি,আর সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ে কোথাও কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। প্রাথমিক অবস্থায় ই,পি,আর ও সামরিক বাহিনী স্থানীয় ভিত্তিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ক্রমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ তীব্র হয়ে উঠলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পক্ষত্যাগকারী সৈনিক, ই,পি,আর ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের একত্র করে সমন্বিতভাবে বৃহত্তর প্রতিরোধের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু সীমিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ বেশি

দিন এই প্রতিরোধকে ধরে রাখতে পারেনি। নিরাপদ আশ্রয়, সুষ্ঠু সমন্বয় ও গোলাবারুদের পর্যাপ্ততার সন্ধানে পুরো বাহিনীকেই এক পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে অবস্থান নিতে বাধ্য হতে হয়।

যেহেতু তখনও পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নির্দেশনা ছিলনা, সেহেতু যেভাবে সম্ভব নিরাপদ আশ্রয় ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিরুপনের জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে তারা উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার ৭০ ভাগের বেশি অংশ জুড়ে ভারতের অবস্থান। সঙ্গত কারণেই প্রায় সকলেই ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন হারুন আহ্মেদ চৌধুরী ১১ এপ্রিল কালুরঘাট যুদ্ধে আহত হয়ে কিছু সৈন্যসহ বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের পার্শ্বসীমানায় অন্য কোন দেশের অবস্থান থাকলে এই সেনা-সদস্যরা সেখানেও অবস্থান গ্রহণ করতে ইতস্তত করতেন না।

প্রথমে ভারত সরকার মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে শরনার্থী হিসেবে স্থানান্তরিত পরিবার গুলোকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এরই অংশ হিসেবে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা দিয়ে আশ্রয় শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সশস্ত্র ব্যক্তিবর্গ ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করলে সমস্যার আর্ন্তজাতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে সশস্ত্র ব্যক্তিদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বি,এস,এফ) -কে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু সীমিত সাহায্য সশস্ত্র বাহিনীর মনোবলকে চাঙ্গা করতে ব্যর্থ হয়। সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ সদস্যগণ ৪ঠা এপ্রিল '৭১ এ তেলিয়া পাড়ায় মেজর খালেদ মোশারফ এর অস্থায়ী দপ্তরে মিলিত হন। সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সামগ্রিকভাবে, বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ইউনিটসহ ই,পি,আর, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার ও ছাত্র সংগঠনগুলোকে এলাকাভিত্তিক সংগঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। সারা দেশের বাহিনীগুলোর বিদ্রোহের সঠিক চিত্র তাঁদের কাছে না থাকায় মোটামুটি ভাবে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের দায়িত্বে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রথমে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করে সমন্বিত যুদ্ধ প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেয়া হয়। অঞ্চলগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১।	চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ	মেজর জিয়াউর রহমান
২।	কুমিল্লা অঞ্চল	মেজর খালেদ মোশাররফ
৩।	সিলেট অঞ্চল	মেজর শফিউল্লাহ
৪।	যশোর অঞ্চল	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

কর্ণেল (অবঃ) এম,এ,জি ওসমানীর ওপর এই সমন্বয়ের জন্য পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়। বাস্তবে এই অঞ্চল ভিত্তিক বিভক্ত ও সমন্বিত যুদ্ধ প্রচেষ্টা প্রাথমিক অবস্থায় তেমন ফলপ্রসু হয়নি। কারণ ইতিমধ্যেই পক্ষত্যাগকারী সকল বাঙালী সেনা অধিনায়ক নিজ নিজ সৈন্যসহ এলাকা ভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এভাবেই এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও পারস্পরিক সমন্বয়বিহীন অবস্থার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং এই অবস্থা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনা ইউনিটে চাকুরীরত এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছুটি ভোগরত সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ অধিকতর সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে থাকেন। একই সাথে বিভিন্ন পেশাজীবী উর্দ্ধতন বেসামরিক কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসেন এবং অনেকেই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ পরিকল্পনায় অংশ নেবার গৌরব অর্জন করেন। যে সকল সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও সৈনিক অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন, সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিতকরণ প্রয়াসে তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিমান ও নৌ-বাহিনীর পক্ষত্যাগকারী সদস্যগণও বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশ সরকারে যোগদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টর ও কার্যালয়ে সমন্বিত হন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে জুন '৭১-এ অনুষ্ঠিত মন্ত্রী সভার এক বৈঠকে যুদ্ধ পরিস্থিতির সার্বিক বিশ্লেষণ করে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে যুদ্ধ অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত লক্ষ্যে জুরুরী ভিত্তিতে সমন্বয় সভা আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনী প্রধান বা প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (অবঃ) এম,এ,জি ওসমানীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।

'৭১-এর ১১ জুলাই মুজিব নগরে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বে-সামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ও যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন এবং কর্ণেল



নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাওলানা ভাষানী নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন

(অবঃ) এম,এ,জি ওসমানীর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ও অনুগত্য স্থাপন করেন। একই বৈঠকে কর্ণেল আব্দুর রব সেনা প্রধান ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ,কে, খন্দকার উপ-সেনা প্রধান নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের সমস্ত যুদ্ধাঞ্চলকে ১১ টি সেকটরে বিভক্ত করে অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। সিনিয়র অফিসার গণের মধ্যে যে সেখানে যুদ্ধরত ছিলেন তাঁকে সেই অঞ্চলেরই দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তাঁর অধীনস্থ এলাকায় অবস্থিত সমস্ত দল বা উপদলকে তাঁর একক অধিনায়কত্বে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই বৈঠকে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি নিয়মিত বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক ভাবে তিনটি ব্রিগেড গঠন করে জেড ফোর্স, কে ফোর্স, ও এস, পোর্স নামে নামকরণ করা হয়।

১০ নং সেক্টরকে একটি বিশেষ সেক্টর হিসেবে সংগঠিত করা হয়। এই সেক্টরের অধীনে নৌ-কমাণ্ডো ও প্রধান সেনাপতির বিশেষ দল গঠন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টরের মধ্য থেকে এই পুস্তকে কেবল ১০ নম্বর সেক্টরের গঠন বিন্যাস ও এই সেক্টরের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সমূহ এবং এই সেক্টরে যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের পরিচিতি সন্নিবেশিত হয়েছে।

সেক্টর এলাকা ঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, নদীও সমূদ্র বন্দর সহ বাংলাদেশের সমগ্র জলপথ।

সদর দপ্তর ঃ পলাশী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

গঠনের তারিখ ঃ ১৩ মে '৭১।

সেক্টর অধিনায়ক ঃ প্রধান সেনাপতি, কর্ণেল (অবঃ) এম,এ,জি ওসমানী।

ক্যাম্প কমাণ্ডার ঃ কমাণ্ডার সুমন্ত (ভারতীয় নৌ-বাহিনী)

ক্যাম্প পরিচালক ঃ লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস (ভারতীয় নৌ-বাহিনী)

বাঙালি প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা ঃ লেঃ (অবঃ) গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ।

প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ঃ লেঃ এস,কে দাশ, লেঃ কপিল, জুনিয়র অফিসার, কে, সিং, চমন সিং, কুন্দন সিং, আই সিং, লাল সিং, গুপ্তবাবু, পরিমল ভট্টাচার্য্য এবং বাংলাদেশের আটজন বাঙালি সাবমেরীনার।

মেডিকেল অফিসার ঃ

দাপ্তরিক কর্মকর্তা ঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

নৌ–কমাণ্ডো সংখ্যা ঃ ৫১৫ জন

(ফ্রান্স থেকে আগত ৮ জন এবং প্রাক্তন নৌ-বাহিনীর ৮ জন সদস্য সহ)

বিশেষত্ব ঃ এই বাহিনীকে বাংলাদেশের প্রথম নৌ–বাহিনী হিসেবে ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি এই ঘোষণা দেন, যদিও স্বাধীনতা উত্তর সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোবৃন্দ ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১২৬টি জাহাজ দখল করেন। যার ভগ্নাংশের বিক্রয় মূল্য ৫০০ কোটি টাকা। '৭৫ পরবর্তী এই জাহাজগুলি বিক্রয় করা হলেও বিক্রয়লব্ধ বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারী তহবিলে জমা হয়নি। ১৯৭৫ সালের শেষ ভাগে রাশিয়ান স্যালভেজ টিম বাংলাদেশের জলসীমায় ডুবন্ত জাহাজগুলি উত্তোলন শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে রাশিয়া বাংলাদেশের নদীপথের নাব্যতা রক্ষার জন্য এই ডুবন্ত জাহাজগুলি উত্তোলনের জন্য সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং পরবর্তী সময়ে বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জলপথ-নৌযান ও জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত হয়। আজ বাংলাদেশে যে আধুনিক ও ঐতিহ্যমন্ডিত নৌ-বাহিনী গড়ে উঠেছে, তা ১৯৭১ এ অতি ক্ষুদ্রাকারে কেবল কতিপয় মানষিক শক্তির অধিকারী যুবকের সমন্বয়েই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অন্যান্য বাহিনীর ন্যায় "বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী" তাই মুক্তিযুদ্ধের গৌরবে সমুজ্জ্বল।

(তথ্য সূত্র ঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান গ্রন্থ)



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি

নৌ-কমাণ্ডো অভিযান

প্রবল প্ররিক্রমশালী ও শক্তিধর এবং অপরাজেয় হিসাবে খ্যাত পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে টিকে থাকার মত পর্যাপ্ত সামরিক সরঞ্জাম, যুদ্ধ জাহাজ এবং সেনাবল ছিলনা বলেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ বিশারদগণ নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এমন পরিকল্পনা এবং দৃষ্টান্ত বিরল। আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ ব্যবস্থায় উভয় পক্ষ সর্বাত্মক দূরত্ব থেকে একে অন্যের উপর আক্রমণ রচনা করে থাকে। যুদ্ধের কলাকৌশল সেই দিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। সেখানে স্বাধীনতাযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোরা সকল রকম নিরাপত্তা ছাড়াই বর্ষায় ভয়াল এবং উন্মত্ত কর্ণফুলি, যমুনা, পশুর, শিবসা, শীতলক্ষ্যা, পদ্মা এবং বঙ্গোপসাগরের বুকে শত্রুর অতি কাছাকাছি পৌঁছে শত্রু জাহাজ ধ্বংস করেছেন। এই সব অভিযানে শত্রু সৈন্য ছাড়াও নদীতে হিংস্র জানোয়ার দ্বারা আক্রমণ এবং প্রবল স্রোতে গভীর সমুদ্রে ভেসে যাওয়া কিংবা তলিয়ে যাওয়ার আশংকা কম ছিলনা। কিন্তু সব ভয় এবং বিপদকে উপেক্ষা করে বাংলার দামাল যুবকরা শত্রুর অহংকার গুড়িয়ে দিয়েছিলেন একের পর এক আঘাত হেনে। ছোট-বড় মিলিয়ে শতাধিক জাহাজ, প্লাটুন, ফ্লাট, ব্রীজ, ফেরী, লঞ্চ, বার্জ ডুবিয়ে এবং ধ্বংস করে শত্রুর মনোবল চূর্ণ করে দেয়।

২৫ মার্চ, যুদ্ধ শুরু থেকে এ যাবতকাল দখলদার বাহিনী বহিঃবিশ্বে প্রচার করছিল বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এখানে কোন যুদ্ধ হচ্ছেনা। কিন্তু আগষ্ট মাসে নৌ-কমাণ্ডো কর্তৃক জাহাজ ডুবির পরেই সারা বিশ্ব মেনেনেয়, বাংলাদেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 'ডেইলি টেলিগ্রাফ', 'নিউ ইয়র্ক টাইমস', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', ওয়াশিংটনপোষ্ট সহ বহু পত্রিকা-সাময়িকী এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশে নৌ-কমাণ্ডো হামলাকে অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করে। আন্তর্জাতিক নৌবহরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। বিদেশী জাহাজগুলি আর বাংলাদেশের বন্দরে পণ্য নিয়ে আসতে রাজী হতোনা। বিমা কোম্পানী বীমার হার বাড়িয়ে দেয় বিশগুণ। একই কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্তানের পাটের মূল্য পড়ে গেলে সে দেশের অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। যে জন্য '৭১ এর ৫ অক্টোবর জাতিসংঘে ভাষনদান কালে

পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা মাহমুদ আলী এবং ১২ অক্টোবর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান নৌ-কমাণ্ডো হামলায় জাহাজ ধ্বংস ও পরিবহণ ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্যয়ের কথা স্বীকার করে নেয়।

জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা মাহমুদ আলী বলেন, "India is also trying to creat Conditious in East Pakistan by aiding and encouraging the destruction of lines of supply for transpotation of food grains into Pakistan, as a result of operations against saboteurs who damaeged the American food ships `Lighting' at Chalna Anchorage recently. Pakistan authorities have apprehended frogmen trained in India and launched near chalna and chittagong Ports for sinking Ships ....") (জাতিসংঘ ডকুমেন্ট ৫ অক্টোবর '৭১)।

নদী মাতৃক বাংলাদেশের সাথে জলপথে আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক ভাবে হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই ছিল নৌ-কমাণ্ডো অভিযানের মূল পরিকল্পনা । পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির সম্মুখ যুদ্ধে পেরে ওঠার সামর্থ ছিলনা বলেই এই আত্মঘাতি (সুইসাইড) পরিকল্পনা নেয়া হয়। আর এজন্য নৌ-যোদ্ধাদের একাগ্র দেশপ্রেম, অসীম সাহস, দক্ষতা, প্রত্যুতপন্ন জ্ঞান এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য নিজেকে বিসর্জন দেয়ার মতো দৃঢ় মনোবলের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

মধ্য আগষ্ট থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত নৌ-কমাণ্ডোরা বাংলাদেশের জলসীমায় ৪৫টি দুঃসাহসীক অভিযান চালিয়ে শত্রুবাহিনীর প্রায় ৭৫ হাজার মেট্রিক টন যুদ্ধাস্ত্র ও সামগ্রী সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত এবং প্রায় এক লক্ষ টন আংশিক বা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এই ক্ষতির পরিমাণ নয় মাসের যুদ্ধে দখলদার বাহিনীর সম্পূর্ণ ক্ষতির অর্ধেকের সমান। যুদ্ধ পরিচালনায় ১০০০ কমাণ্ডোর একটি বাহিনী গঠন এবং দীর্ঘকালীন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এই কমাণ্ডো নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর বাস্তবায়নের চিন্তা ছিল। পরিকল্পনাবীদরা জানতেন একজন কমাণ্ডোর জীবন এবং একটি শত্রু টার্গেট ধ্বংস সম্ভব হলে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে সহজ হবে। আশ্চর্যজনক

হলেও সত্যি যে, বাঙালি যুবকরা সাহসে এবং পারদর্শিতায় যুদ্ধবীদদের পরিকল্পনা পালটে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে সকলের জীবন হারানোর কথা এবং চিন্তা, পরিকল্পনাকারীদের মাথায় থাকলেও তেমনটি ঘটেনি।এর পিছনে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লেঃ সমীর কুমার দাসের (নিহত) একনিষ্ঠ শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা সহায়ক ছিল। সাথে অন্যান্য প্রশিক্ষকদের একাগ্রতা এবং যুদ্ধ কৌশল বাঙালি যুবকরা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন।

প্রথম ১৫ই আগষ্ট ১৯৭১ মধ্যরাতের পর বাংলাদেশের সমুদ্র ও নদী বন্দর কেঁপে কেঁপে ওঠে কমাণ্ডোদের পাতা মাইনের বিরতিহীন বিষ্ফোরনে। দখলদার বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। বাণিজ্যিক জাহাজগুলি প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত বুঝতে পেরে S.O.S. বার্তা পাঠাতে শুরু করে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-কমাণ্ডো বাহিনীর মাইন হামলায় দখলদার বাহিনীর সাথে অন্যান্য দেশের পন্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ একের পর এক তলিয়ে যায় চট্টগ্রাম, মংলা, চাঁদপুর ও নারায়নগঞ্জ বন্দরে গভীর পানির নীচে। এদিন বাংলাদেশের চারটি বন্দরে একই পরিকল্পনার অধীন আক্রমণ পরিচালিত হয়। দাউদকান্দি ফেরীঘাটে একই সময়ে আক্রমন করার কথা থাকলেও বিশেষ কারণে তা হয়নি। দাউদকান্দি ঘাটে একদিন পরে অভিযান পরিচালিত হয়। ৭১'র ১৫ই আগষ্ট, নৌ-কমাণ্ডোদের এই অভিযানকে 'অপারেশন জ্যাকপট' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অপারেশন জ্যাকপট যেমন শত্রু বাহিনীর বিপুল ক্ষতি সাধন করে সাথে সাথে বিশ্বময় খ্যাতি অর্জন করেছিল। তখন হতে বিশ্ব জানতে পারে বাংলাদেশে প্রকৃতই যুদ্ধ চলছে। এ সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' '৭১ অক্টোবর এক প্রতিবেদন ছাপে যে, "নৌ-যোদ্ধারা অন্তত এক ডর্জনের অধিক বহির্গামী জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। ৭টি বৃটিশ জাহাজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।"

এপিপি'র বরাত দিকে "দৈনিক পূর্বদেশ" লেখে, "সরকারী মুখপত্র জানিয়েছে যে, ইউ,এস,এস, লাইটনিং নামের একটি খাদ্যশস্যবাহী মার্কিন জাহাজ সম্প্রতি চালনা বন্দরে 'লিমপেট মাইন, বিষ্ফোরনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডো অভিযান যে দারুন প্রভাব ফেলে তার প্রমাণ মেলে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর তাদের দেশে নৌ-বাহিনীতে একই ধরণের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গবেষণা চালাচ্ছে। ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে শ্রিলংকার তামিল টাইগাররা বাংলাদেশের নৌ-কমাণ্ডোদের পদ্ধতি অনুসরণ করে

জাফনা বন্দরে একটি জাহাজ ডুবি ঘটায়। তামিল টাইগাররা বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সাহায্যে অনুরূপ প্রশিক্ষণ রপ্ত করে বলে ধারণা করা যায়।

মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান এত প্রভাব ফেলে যে, ১৯৭১ সালে ১লা অক্টোবর' বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী নিউইয়র্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা করতে যেয়ে বাংলাদেশের নদী বন্দরে জাহাজ ডোবানোর কথা গুরুত্ব সহকারে সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। এসময় বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলি বাংলাদেশের বন্দর থেকে তাদের জাহাজ সরিয়ে নেয়ার জন্য জাহাজের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়।

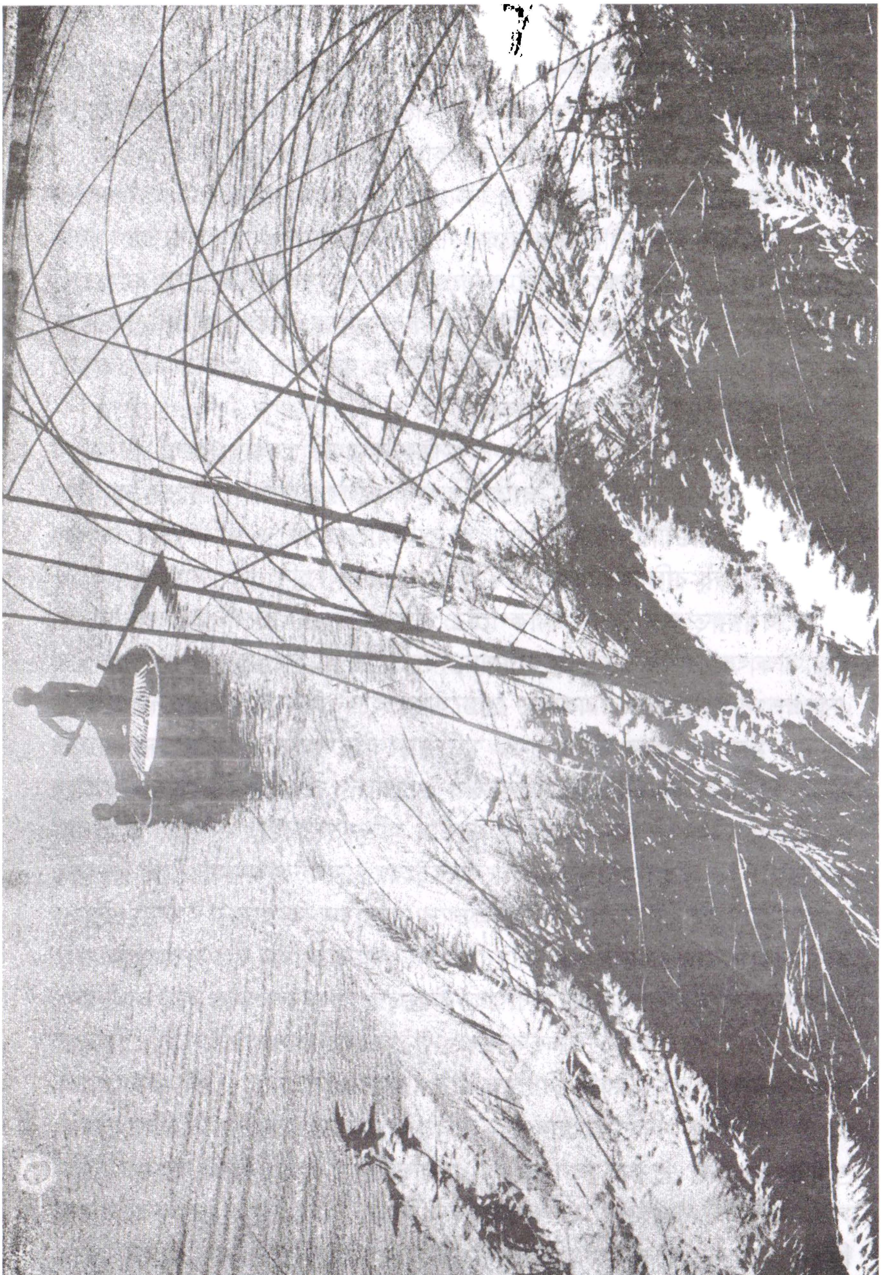
যুদ্ধের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপ্রতুল যুদ্ধাস্ত্র, নিযুক্ত অফিসারের স্বল্পতা, মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে সমন্বয়ের অভাব এবং সাংগঠনিক দূর্বলতার কারণে মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা ক্রমশ স্তিমিত হচ্ছিল। এজন্য সাধারণ মানুষের মনোবল ও ক্রমাগত নীচের দিকে যেতে থাকে। এর পুরাপুরি সুযোগ গ্রহন করে পাকিস্তান। তারা প্রচার করে বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক। সেখানে কোন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছেনা, কিছু দুষ্কৃতকারী বিশৃংখলা ঘটানোর চেষ্টা করলেও তা দমন করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিলনা। এসম্পর্কে মাঈদুল হাসান তার মূলধারা '৭১ গ্রন্থে লিখেছেন, "মুক্তিযুদ্ধের এই অধোগতি ঢাকা পড়ে ১৫ আগষ্ট থেকে বাংলাদেশ নৌ-কমাণ্ডো বাহিনীর দুনিয়াকে চমক লাগানো নৌ-বিধ্বংসী তৎপরতায়।" মাঈদুল হাসান প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ভারত সরকারের উচ্চতর নীতি নির্ধারকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ব্যাপারে বিশেষ আস্থা ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাই নৌ-কমাণ্ডোদের সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। ডঃ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম একজন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও যুদ্ধভিত্তিক অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি বর্ণনা করেছেন "নৌ-কমাণ্ডোদের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম তাঁদেরকে গৌরবময় দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অপারেশনের মাধ্যমে সার্থক বীরের মর্যাদা দান করেছে। এ অদ্বিতীয় কৃতিত্ব শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে।"

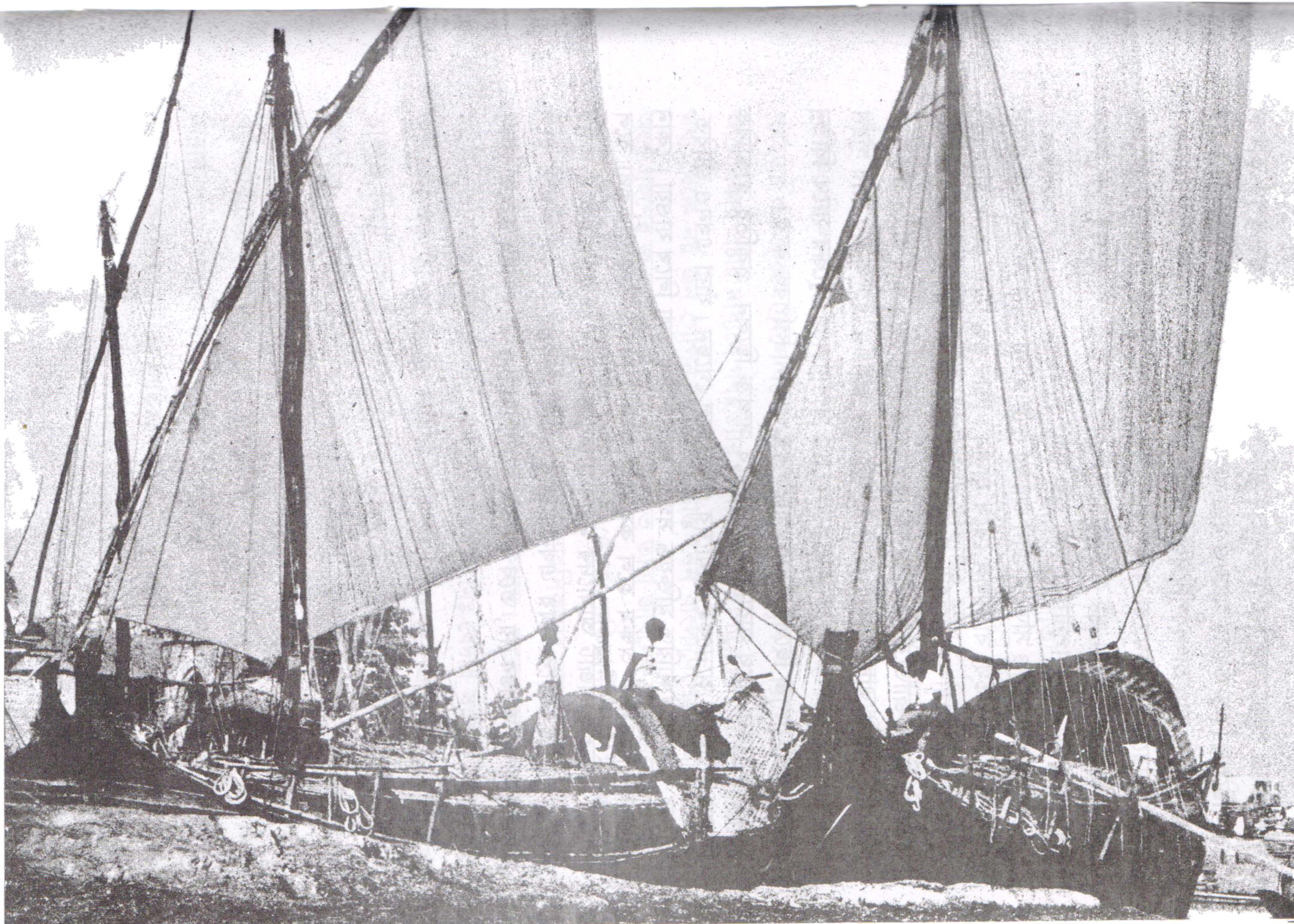
তিনি আরও লিখেছেন, "একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, নৌ-কমাণ্ডোদের সার্থক অপারেশন, চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য বাঙালি জাতির যুদ্ধ জয়ের পথে নতুন গতি পথের সন্ধান দিয়েছিল।"

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেঃ এম,এ,জি, ওসমানী দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "১৯৭১ এর ১৪ই আগষ্ট থেকে আমাদের নৌ-কমাণ্ডোদের আক্রমণ শুরু হয়। তাঁরা যে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই।"

মুক্তিযুদ্ধের উপ সেনাপ্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ,কে খন্দকার বীরউত্তম যুদ্ধের নীতি নির্ধারকদের মাঝে অন্যতম। তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর বক্তব্যে নৌ-কমাণ্ডোদের সাহসিকতা সম্পর্কে বলেছেন, "মুক্তিযুদ্ধে নৌ–কমাণ্ডোদের অভিযান কেবল যুদ্ধে বিজয় অর্জন তরান্বিত করেছিল তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতও করেছে। বাংলার এই দামাল ছেলেরা শ্রেষ্ঠ বীরের মর্যাদার অধিকারী।"

মুক্তিযুদ্ধে এক নম্বর সেক্টরের – সেক্টর কমাণ্ডার মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম এবং মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের ডেল্টা সেক্টরের কমাণ্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং নৌ-অভিযানের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মেজর রফিকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি এবং সাবেগ সিং ১৫ আগষ্ট বিশ্বখ্যাত অপারেশন জ্যাকপটের পরিকল্পনাকারী ছিলেন। মেজর রফিক তাঁর সাক্ষাৎকারে, বিভিন্ন গ্রন্থে, বর্ণনায়, বিবৃতিতে নৌ-যুদ্ধের তাৎপর্য তুলে ধরে এর প্রশংসা করেছেন। একজন শ্রেষ্ঠযোদ্ধা হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের যুদ্ধকে যথাযথ মূল্যায়ন করে তিনি সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকেই সম্মান দেখিয়েছেন। যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় এই সকল বীর যোদ্ধাদের স্বীকারোক্তি সুনিশ্চিতভাবে গুরুত্ব বহন করবে। তাঁদের কথাই জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় উপাত্ত হিসেবে গৃহীত হবে। মুক্তিযুদ্ধে ৮ নং সেকটরের, সেকটর কমাণ্ডার লেঃ কঃ আবু ওসমান চৌধুরী নৌ-কমাণ্ডোদের এভাবে মূল্যায়ন করেছেন, "যাঁরা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে লিখিত বন্ড দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের সর্বাত্মক বীরত্বের খেতাব প্রদান করা সমীচিন। মেজর জেনারেল (অবঃ) সামছুল হক নৌ-যোদ্ধাদের সম্বন্ধে একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নৌ-কমাণ্ডোদের মাঝে অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ছাত্র এবং যুবক যাঁরা দেশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকেই এসেছিলেন। তাঁরা নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন সত্য কিন্তু যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহন করার মত বয়স, মেধা কিংবা যোগ্যতা তাঁদের ছিলনা। ফ্রান্স থেকে যে আটজন নাবিক মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন, তাঁরা





বর্ষায় বাংলাদেশের দৃশ্য

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন কিন্তু তাঁদের মাঝেও মাত্র একজনই ছিলেন জুনিয়র অফিসার। এত বৃহৎ, নিপুন এবং তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। একই কারণে নৌ-কমাণ্ডো বাহিনীর সার্বিক দায়িত্ব প্রধান সেনাপতি নিজের অধীনেই রেখেছিলেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নৌ-যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ ঘটনা 'মুক্তিযুদ্ধ' সম্পর্কে প্রধান সেনাপতি কোন তথ্য বা দলিল রেখে যাননি। তিনি যুদ্ধ নিয়ে কোন স্মৃতিচারণ মূলক লেখা কিংবা আত্মজিবনী ও লেখেননি। অথচ তাঁর কাছে জাতির অনেক প্রত্যাশা ছিল। জাতিকে তিনি অনেক কিছু দিতে পারতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ্ হতে পারতো পৃথিবী খ্যাত একটি তথ্য ভিত্তিক যুদ্ধ দলিল। এই অভাব আর পুরন হবেনা। এই অসম্পূর্ণ কাজ আংশিক হলেও সম্পন্ন সম্ভব, যুদ্ধের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে।

মুক্তিযুদ্ধের সাথে যারা গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ইতিমধ্যে অনেকেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। যাঁরা এখনও জীবিত, তাঁদের আবশ্যিক দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞাত সঠিক তথ্য লিখে যাওয়া। কোন মুক্তিযোদ্ধা লিখতে অক্ষম হলে কমপক্ষে অন্যের নিকট তাঁর স্মৃতিকথা বলে যাওয়া উচিত। কাজটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে অতি ক্ষুদ্রই সম্পন্ন হয়েছে। তবে সময় এখনও শেষ হয়নি, জাতির বিবেক জাগ্রত হলে কাজটি সম্পন্ন অসম্ভব নয়, তবে এসকল উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় ভাবে গ্রহন করতে হবে।

নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী গঠনের গোড়ার কথা

স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম,এ,জি ওসমানীর একান্ত আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে স্থল বাহিনীর পাশাপাশি প্রথম একটি ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান নৌ-বাহিনী, ১৯৬৯ সনে ৫৭ জন নৌ-কর্মকর্তা ও নাবিককে ফ্রান্স থেকে দু'টি সাবমেরিন খরিদ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করে। এদের মাঝে ১৩জন বাঙালি নাবিকও ছিলেন। ৭১'র ২৫ মার্চ, রাতে পাকিস্তানী হানাদাররা নিরস্ত্র বাঙালিদের গণহত্যা শুরু করলে ফ্রান্সে বসেই এই বাঙালি নাবিকবৃন্দ বি,বি,সি ও ভয়েস অব আমেরিকার প্রচার মাধ্যমে গণহত্যার সংবাদ জানতে পারেন। তেরজন নাবিকের মধ্য থেকে নয় জন গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ভারতে যাবেন। সেইমত তাঁরা জীবনের ঝুকি নিয়ে ৩১ মার্চ ফ্রান্সে অবস্থানরত পাকিস্তানী সাবমেরীন থেকে পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহনের উদ্দেশে অসম সাহসিকতার সাথে স্পেনের মাদ্রিদে ভারতীয় দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহন করেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও ভারতীয় দূতাবাস এর চার্জ দ্য এফেয়ার্স মিঃ বেদীর সহযোগীতায় সেই আট জন অকুতোভয় বাঙালি নাবিককে বিশেষ তত্ত্বাবধানে এপ্রিলের ১০ তারিখে ভারতে নিয়ে আসেন, ফলে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্ভব হয়। রোম, জেনেভা ও বোম্বেতে পাকিস্তানী কূটনীতিকরা এই আটজন সাবমেরীনারকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য জোর তৎপরতা চালালেও তাঁদের দৃঢ় মনোবলের কাছে পাকিস্তানীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সাবমেরিন ত্যাগ করে আসার পর নাবিক আব্দুল মান্নান পথে বিদ্রোহী দলের সাথে মিলিত না হয়ে লণ্ডন চলে যান। দিল্লিতে পৌঁছালে অবশিষ্ট আটজন নাবিককে ভারতীয় সামরিক ও নৌ-বাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাঁদের পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগের



নৌকমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের দৃশ্য

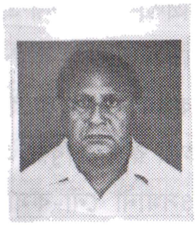




উপরে নৌ-কমাণ্ডোদের জ্যুডো প্রশিক্ষণের দৃশ্য– নীচে কমাণ্ডার ফিরোজ মিয়ার নেতৃত্বে ফকিরাপুলে রাজাকার বাহিনী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।



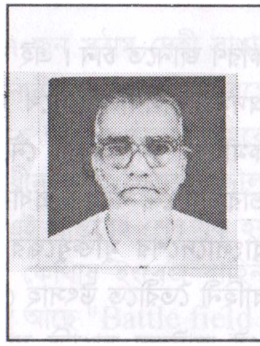
মুর্শিদাবাদ জেলার মানচিত্র



গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ
বীর প্রতীক

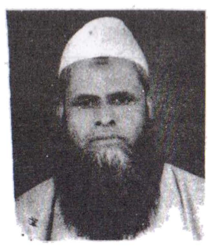


বদিউল আলম বীর উত্তম

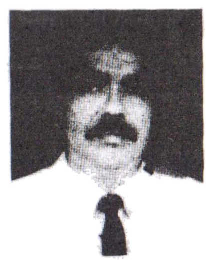


সৈয়দ মোশাররফ হোসেন

আঃ ওয়াহেদ চৌধুরী
বীর উত্তম



আমিনউল্লাহ শেখ
বীর বিক্রম



আবদুর রহমান, বীর বিক্রম

আহসানউল্লাহ, বীর প্রতীক

শহীদ আঃ রকিব মিয়া
বীর বিক্রম

কারণ জানতে চান। এই আটজন নাবিকের মনোবল, একাগ্রতা ও দেশের প্রতি অদম্য ভালবাসা দেখে তাঁদের সাথে পরামর্শ করে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডার শর্মা একটি নৌ-কামাণ্ডো বাহিনী তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারতীয় নৌ-বাহিনী প্রধান এডমিরাল নন্দা,গোয়েন্দা কর্মকর্তা রায় চৌধুরী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম,এ,জি ওসমানী নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী তৈরীতে উৎসাহ দেখান। পরিকল্পনামত ২৩ এপ্রিল থেকে ৮ মে পর্যন্ত' এই আটজন বাঙালি নাবিককে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় দিল্লীর পার্শ্ববর্তী যমুনা নদীতে বিশেষ নৌ-প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লেফটেন্যান্ট এস,কে দাস। একই সময়ে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ এই আটজন বাঙালি বীর নৌ-সেনাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরষ্কার ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীতে সামরিক আদালতের বিচারে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা দেয়া হয়। এই ৮ জন বীর নাবিক হলেন –

ক)	গাজী মোঃ রহমত উল্লাহ (দাদু)	বীর প্রতীক
খ)	সৈয়দ মোশাররফ হোসেন	–
গ)	আমিন উল্লাহ শেখ	বীরবিক্রম
ঘ)	আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী	বীর উত্তম ও বীর বিক্রম
ঙ)	বদিউল আলম	বীর উত্তম
চ)	আহসান উল্লাহ	বীর প্রতীক
ছ)	শহীদ আঃ রকিব মিয়া	বীর বিক্রম
জ)	আবিদুর রহমান	বীর বিক্রম

(উল্লেখ্য যে, আঃ ওয়াহেদ চৌধুরী, বীর বিক্রম খেতাব পেয়েছেন সেখানে নাম উল্লেখ করা হয়েছে এ,ডব্লিউ চৌধুরী)। দিল্লিতে প্রশিক্ষণ শেষে নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী গঠনের জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশে সাবমেরিনার দল ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা সমন্বয়ে কলিকাতা চলে আসেন। কমাণ্ডার সুমন্তের প্রত্যক্ষ সাহায্যে টাকি, মেলাঘর, আম্পিনগর, কাঠালিয়া, হাতিমারা, বক্সনগর, ৯১

বি,এস,এফ, হরিনা যুব শিবির থেকে প্রথমে ৩৫৭ জন সুঠাম দেহী বাঙালি যুবককে নৌ-কমাণ্ডো ট্রেনিং প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগিরথী নদীর তীরে ঐতিহাসিক পলাশী প্রান্তরে সমবেত করা হয়। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজ ক্যাপ্টেন ক্লাইভ বাহিনীর সৈনিকদের এই প্রান্তরেই শেষ যুদ্ধ হয়। এখানে চারিদিকে আজও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত আছে, কোথায় ইংরেজ বাহিনীর অবস্থান ছিল-সব কিছু। যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাঝখানে লেখা আছে "Battle field of polashi 1757" এরই পাশে ভাগীরথীর তীরে ১৯৭১ এর ১৩ই মে, প্রথম নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প "সি-২ পি" সাংকেতিক নাম দিয়ে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী দিনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমাণ্ডার এম,এন সুমন্ত, লেঃ কমাণ্ডার জি,এম মার্টিস এবং সাবমেরিনার আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী। সকলেরই বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, এই স্বল্পতম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী গঠিত হচ্ছে তা মূলত এইটি 'সুসাইডাল স্কোয়ার্ড'। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বুঝিয়ে দেবার পর কমাণ্ডোদের প্রত্যেককেই এইটি করে সম্মতিসূচক ফর্মে স্বাক্ষর করে ছবিসহ কৃর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়। এই বলে যে, "আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে সম্মত হয়েই এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি। যুদ্ধে আমার মৃত্যু ঘটলে কেউ দায়ী থাকবে না" ছবি উঠানোর দায়িত্বটি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষই সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণে অংশ গ্রহনকারী যুবকদের দায়িত্ব এবং এর ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা তখনও তাঁদের ছিলনা, যদিও কতৃপক্ষ প্রথমেই নৌ-কমাণ্ডোদের দায়িত্ব এবং এই কাজ কতটা ঝুকিপূর্ণ তা বুঝিয়ে দেন।

সমন্বিত ৩৫৭ জনের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই এই ফর্মে স্বাক্ষর করেন। যারা এই অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রশিক্ষণ নিতে সম্মত হয়নি তাদের চাকুলিয়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়, গেরিলা যুদ্ধ প্রশিক্ষণের জন্য কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই তাদের ফিরে যেতে দেয়া হয়নি। প্রশিক্ষণ শুরুর কয়েকদিন পর ২২ জুন কর্ণেল এম,এ,জি ওসমানী পলাশীতে নৌ-কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তিনি কমাণ্ডোদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, "নৌ-কমাণ্ডোদের সফলতার উপর স্বাধীনতা যুদ্ধ কতদিন চলবে তা

অনেকাংশে নির্ভর করছে।" তিনি সুস্পষ্টভাবে নৌ- কমাণ্ডোদের উদ্দেশে বলেন, "এই প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর সফল প্রশিক্ষণার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হবে একটি সুসাইডাল স্কোয়াড। সুতরাং যারা এতটা আত্মত্যাগ করতে রাজী নয়, কিংবা যাদের সাহস কম আছে তারা যেন প্রথম অবস্থাতেই প্রশিক্ষণ ত্যাগ করে চলে যায়।" অত্যন্ত কুশলী এবং দক্ষ কমাণ্ডার জি,এম, মার্টিস ছিলেন একজন ভারতীয় বংশদ্ভূত রাশিয়ান এবং খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি বিষধর সাপ ক্ষেতে অভ্যস্ত ছিলেন।

এম,এ,জি, ওসমানীর এই ঘোষণার পর ৩৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্য থেকে কয়েকজন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রথম দলে ৩৫৭ জনের মধ্য থেকে শেষাবধি প্রশিক্ষণে টিকে থাকে ৩১৫ জন। তারপর আরো কয়েক দফায় বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্প হতে কমাণ্ডো বাছাই ও সংগ্রহ করে তিন ব্যাচে মোট ৪৯৯ জনের এই নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী গঠিত হয়। শেষ দিকে কমাণ্ডোদের সাথে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর আরও আটজন বাঙালি নাবিক এসে কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে সংখ্যা ৫১৫ জন। কমাণ্ডো বাহিনীকে একসাথে রিক্রুট নাকরার পিছনে কৌশলগত কারণ ছিল। যুদ্ধ পরিকল্পনাবীদরা এমন ভেবে ছিলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সেইমত অবস্থায় যুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ের যোদ্ধাদের মৃত্যু হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের যোদ্ধাদের স্থলাভিশিক্ত করা হবে।

নৌ-ক্যাম্পের প্রশিক্ষক অফিসার ছিলেন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লেঃ কমাণ্ডার জি,এম মার্টিস, লেঃ সমীর কুমার দাস, লেঃ কপিল। জুনিয়র অফিসার ছিলেন কেঃ সিং, আই, সিং, মিঃ ভট্টাচার্য, পিকে গুপ্তা, চমন সিং, কুন্দন সিং, লাল সিং। একই সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন নিয়ে নৌ-কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ফ্রান্স থেকে আগত ৮ জন বাঙালি নৌ-সেনা। ক্যাম্পের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তা কমাণ্ডার সুমন্ত। যিনি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে গোয়েন্দা বৃত্তি করতে পাক নৌ-বাহিনীতে সাধারণ মেকানিক হিসেবে চাকুরী করেছেন। প্রশিক্ষণ চলাকালে কর্ণেল ওসমানী তিনবার এই ক্যাম্প পরিদর্শন করেছিলেন, জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম একবার এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর প্রধান এডমিরাল নন্দাও একবার

এসেছিলেন (১১জুলাই '৭১)। বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে নৌ-কমাণ্ডোদের পলাশী ক্যাম্পে আনা নেয়ার জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি সামরিক বোয়িং বিমান সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা ছিল। এই নৌ-কমাণ্ডো ক্যাম্পের গোপনীয়তা অসম্ভব ভাবে রক্ষা করা হতো কারণ এই নৌ-কমাণ্ডো অপারেশনের সাফল্যের উপর নির্ভর করছিল মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বহিঃবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নদী ও সমুদ্র বন্দরে কমাণ্ডো অভিযান শুরু হলে কার্যত তাই ঘটেছিল। একের পর এক বিদেশী জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে হামলার শিকার হয়ে ধ্বংস হতে থাকলে পরবর্তীতে আর কোনো জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে ভিড়তে রাজী হতো না, বহিঃনোঙড়ে থেকেই মাল খালাস করে চলে যেতো। কিন্তু বহিঃ নোঙড়েও জাহাজ মাইনে আক্রান্ত হতে থাকলে দখলদার বাহিনী চরম সংকটে পড়ে, মাল আনা নেয়ার জন্য। মূলত তখন থেকে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনেক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে থাকে।

১৯৭১ সালের ১৩ই মে, বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে পলাশীর সেই আম্র কাননে, চারিদিকে বাবলা বনে বেষ্টিত ভাগীরথীর তীরে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী 'সি-২পি' ক্যাম্প নামকরণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। তখন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১২০ জন। প্রশিক্ষণের শুরুতে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। প্রথম দিনে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থান যা ছিল গভীর বন জঙ্গলে ঘেরা, কেটে সাফ করে তাবু টানিয়ে ক্যাম্প তৈরী করা হয়। প্রত্যেক কমাণ্ডোকে দেয়া হয় একটি করে বড় মগ, থালা, একটি গামছা, সুইমিং কষ্টিউম, একজোড়া ফিনস্, একটি করে সতরঞ্চি, কয়েক গজ প্লাষ্টিক। তাঁবুর মধ্যে চারিদিকে ভেজা মাটির ঢিবী দিয়ে বাঁধ দেয়া হয়, যাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে। এই মাটির ঢিবীতে মাথা রেখেই বালিশের অভাব দুর করা হতো। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় এখানে বাস করতো বিরাটকায় বিষধর সাপ। যেগুলি ক্যাম্প বা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়তো। মাঝে মধ্যে ঘুমন্ত প্রশিক্ষণার্থীর বুকের উপর দিয়েও সাপ চলে গেছে। এদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ক্যাম্পের চারিপাশ দিয়ে খোড়া হয় গভীর পরীখা।

ভোর পাঁচটা থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করে দুই ঘন্টা যাবত চলতো পিটি এবং জুডো কারাত (আন আর্মড কমব্যাট), এরপর সকালের নাস্তায় থাকতো এক মগ

চা, দুটো বড় মোটা রুটি। নাস্তা এবং রান্না পালাক্রমে নিজেদেরই তৈরী করতে হতো। নাস্তা শেষে দীর্ঘক্ষণ চলতো সাঁতার এবং নৌকা চালনা প্রশিক্ষণ। নিয়মিত জঙ্গল কেটে রান্নার কাঠ সংগ্রহ করতে হতো। জঙ্গল কাটার মধ্যে ও প্রশিক্ষণের বিষয় থাকতো। বড় বড় গাছের গুড়িতে এক্সপ্লোসিভ জড়িয়ে দূর থেকে সেফটি ফিউজ ও কটেক্স দ্বারা ডেটনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গাছকে দ্বিখন্ডিত করা যায় এ শিক্ষাও পাওয়া যেত, সাথে খড়ি সংগ্রহ। প্রথমে যখন প্রশিক্ষণ শুরু হয় নদীতে পানি ছিল খুবই কম এবং অতি স্বচ্ছ। স্থান ভেদে নদীর পানির গভীরতা ছিল ৪ ফুট থেকে ১০ ফুট এবং স্রোতের তীব্রতা ছিল খুবই ক্ষীণ যা নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ছিল খুবই সহায়ক। নদীতে অনেকগুলো দেশী নৌকা (ইঞ্জিন বিহীন) এবং চারটি স্পীড বোট রাখা হয়। সাঁতার কাটার সময় এসব নৌকা এবং স্পীড বোট কমাণ্ডোদের পাশে পাশে থাকতো। ফিন্স পায়ে দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটতে থাকলে হঠাৎ পায়ের মাংস পেশী আড়ষ্ট হয়ে শক্ত হয়ে যায়, তখন আর তার পক্ষে সাঁতার কাটা সম্ভব হতোনা, পানিতে তলিয়ে যাবার ভয় থাকে। এমন অবস্থা হলে সে কমাণ্ডো সাঁতার বন্ধ করে দুই হাত দিয়ে সজোরে পানি দাঁপিয়ে নিজের বিপদ বোঝালে সাথে সাথে এই সকল নৌকা বা স্পীড বোটের উদ্ধারকারী দল তাকে পানি থেকে তুলে নিতেন। প্রশিক্ষণের প্রারম্ভে এমন ঘটনা বেশী ঘটলেও পরবর্তী সময়ে তা আর লক্ষ্য করা যেতোনা। প্রশিক্ষণ স্থানটি ছিল ফারাক্কা বাঁধের অদূরে ভাঁটিতে। জুলাই মাসের প্রথম দিকেই নদীর পানি বেড়ে কানায় কানায় ভরে যায়। স্রোত ও বেড়ে প্রচন্ড রূপ নেয়। সে সময় এই প্রচন্ড স্রোতের ও প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রশিক্ষণার্থীরা ততোদিনে অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বাংলাদেশে যে সকল নদীতে অপারেশন করতে হবে সেখানে থাকবে প্রচণ্ড স্রোত। তাই এই উপযোগী পরিবেশে শিক্ষা গ্রহন অপরিহার্য ছিল।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে কয়েক দিনের ঘটনা পঞ্জী ঃ

১৪ মে, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডার সুমন্ত প্রথম ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস প্রশিক্ষণার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

১৬ মে, রাতে প্রবল ঝড়ে ভাগিরথীর তীরে কমাণ্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাম্প উড়িয়ে নিয়ে যায়।

১৭ মে, প্রশিক্ষণার্থীরা পুনরায় একই স্থানে তাবু টাঙায়। সাপের ভয়ে ক্যাম্পের চারিদিকে গভীর খাল খোড়া হয় যাতে সাপ ঢুকতে না পারে।

১৯ মে, ক্যাম্পে অবস্থানকারী প্রশিক্ষণার্থীদের চোখে ব্যাপক ভাইরাস দেখা দেয় এবং এদিন কমাণ্ডোদের নাম ক্রমিকানুসারে তালিকাভূক্ত করা হয়।

২০ মে, থেকে পুরাপুরি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। দিনে ৬ ঘন্টা সাঁতার কাটানো হয়। দিনের বাকী সময় পি,টি,দৌড়, কমবাট শেখায়।

২৫ মে, কমাণ্ডোদের দক্ষতানুসারে গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। প্রতি গ্রুপে থাকে ২০ জন করে কমাণ্ডো। ২০ জন কমাণ্ডো এক তাবুতে অবস্থান করে এবং একজনকে গ্রুপ কমাণ্ডার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

২৮ মে, কমাণ্ডোদের প্রথম টি,এন,টি চার্জ ব্যবহার প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

৩০ মে, কমাণ্ডার সুমন্ত পুনরায় আসেন এবং কমাণ্ডোদের সাঁতার প্রতিযোগিতা অবলোকন করেন।

২ জুন, কমাণ্ডোদের প্রথম সুইমিং কষ্টিউম, পোশাক, জুতা, থালা, মগ কম্বল, অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী দেয়া হয়। এর আগ পর্যন্ত কমাণ্ডোদের প্রায় ভিজা মাটিতে শুয়ে রাত কাটাতে হয়েছে।

৩জুন, লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস কমাণ্ডোদের উদ্দেশে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পুনরায় বক্তৃতা দেন, ইংরাজী ভাষাতে। লেঃ রহমতউল্লাহ তাঁর বক্তৃতা বাংলায় তরজমা করে বুঝিয়ে দেন। বক্তৃতার সারমর্ম ছিল "দেশের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। যুগে যুগে সবদেশে জাতির ক্রান্তি লগ্নে যুব সমাজ এমন দায়িত্ব বহন করেছে। একমাত্র দেশপ্রেম এমন আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তাঁরা জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকে।"

৭ জুন, কমাণ্ডোদের খাবার তালিকা পরিবর্তন হয়। এদিন থেকে সকাল-বিকাল ২টি ডিম, এক মগ দুধ, মাছ, মাংস, স্থান পায়। সাথে লাইম জুস, টিনজাত ফল, তাজা ফল এবং মাঝে মাঝে মিষ্টিও দেয়া হয়। কমাণ্ডোদের দায়িত্ব পালনে প্রচুর শক্তি প্রয়োজন সেজন্য পুষ্টি যোগাতে এমন উন্নত খাদ্য তালিকা অর্ন্তভূক্ত করা হয়। (নিয়মিত বাহিনীর খাদ্য তালিকার চেয়ে নৌ-কমাণ্ডোদের উন্নত খাবার দেয়া হতো কারণ হীনবল হলে কমাণ্ডোরা অভিযানে বিফল হবে এবং শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা পাড়ার ভয় থাকে)

১২ জুন, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা, বেসামরিক পোষাকে পরিদর্শনে আসেন। তাঁর পরিচয় জানানো হয়নি। সামরিক হেলিকপ্টারে আসেন। এজন্য পূর্বদিন পাশ্ববর্তী মাঠে হেলিপ্যাড বানানো হয়।

১৩ জুন, কমাণ্ডোদের বিনোদনের জন্য হারমণিয়াম, তবলা ওয়াটারপলো ও ফুটবল খেলার জন্য বল, রেডিও, কেরাম বোর্ট নিয়ে আসে।

১৫ জুন, কমাণ্ডোদের মাঝে সাঁতার প্রতিযোগিতা হয় ABC গ্রুপ ও DEF গ্রুপ। তখন পর্যন্ত ক্যাম্পে কমাণ্ডো সংখ্যা ১২০ জন।

১৯ জুন, অম্পিনগর ও হরিনা ক্যাম্প থেকে ৮০ জন নতুন ছেলেকে ক্যাম্পে আনা হয়।

২১ জুন প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (অবঃ) ওসমানী প্রথম ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন এবং ঘোষণা দেন নৌ-কমাণ্ডোরাই বাংলাদেশের প্রথম নৌ-বাহিনীর সদস্য। দেশ স্বাধীন হলে তাঁদের দিয়েই বাংলাদেশের নৌ বাহিনী গঠন করা হবে। নৌ-কমাণ্ডোদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সুষ্টভাবে বুঝিয়ে বলেন, "এটি একটি সুসাইডাল স্কোয়াড, দেশের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করতে পারবে কেবল তারাই যেন এই প্রশিক্ষণ গ্রহন করে।"

২২ জুন, ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কমাণ্ডোদের পানীয় জলের জন্য দুটি টিউবওয়েল বসানো হয় এর পূর্ব পর্যন্ত ট্রাকে বড় বড় ড্রাম ভরে গ্রাম থেকে পানি আনা হতো।

২৪ জুন, পশ্চিমবঙ্গের টাকী ট্যানজিট ক্যাম্প থেকে পুনরায় ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পলাশী ক্যাম্পে সমবেত করা হয়।

২৫ জুন, নদীর পানি বৃদ্ধি হতে শুরু করে।

২৬ জুন, মেলাঘর ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে আরও ১১৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সমবেত করা হয়।

৩০ জুন, ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী নদীর অপর তীরে সন্দেহ ভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার শরীরে লুকিয়ে রাখা বড় আকারের একটি ছুরি পাওয়া যায়। লোকটিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সম্বন্ধে কমাণ্ডোদের বেশী জানতে দেয়া হয়নি। তাদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারে এমন মনে করে।

১ জুলাই, নদীর পানি বেড়ে কানায় কানায় ভরে যায়। ফলে তাবু সরিয়ে বাধের ভিতরে নিয়ে আসা হয়।

৩ জুলাই, রাত্রে সাঁতরানোর সময় একজন মানুষের লাশ পানিতে ভেসে আসতে দেখা যায়। এসময় সকাল ৬টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলতো, লাশটিকে বাংলাদেশের বাঙালির বলে মনে হলো।

৪ জুলাই, লিমপেট মাইন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়। এর শক্তি ও ব্যবহার বিধি বুঝিয়ে দেয়া হয়।

৬ জুলাই, ষ্টেনগান ফায়ারিং প্রশিক্ষণের জন্য বহরমপুর ফায়ারিং এলাকায় কমাণ্ডোদের নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাড়ী, ইমামবাড়া, হাজার দুয়ারী দেখিয়ে আনা হয়।

৭, ৮ ও ৯ জুলাই, পানির অভ্যন্তরে ১´´ মোটা ও ২০´ লম্বা বৃহৎ আকারের লোহার প্লেট স্থাপন করে মাইনবিস্ফোরন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১১ জুলাই, প্রবাসী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্ণেল ওসমানী ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। কর্ণেল ওসমানী তাঁর ঘোষণা পুনঃ ব্যক্ত করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ প্রকম্পিত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত ভাষনে বলেন, "দেশের জন্য সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকারের জন্য কমাণ্ডোদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। বিনিময়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠবীরের মর্যাদায় সম্মানিত করা হবে", বলে উল্লেখ করেন।

১২ জুলাই, নদীর পানি অসম্ভব বৃদ্ধি পেলে ক্যাম্প সরিয়ে পলাশী মনুমেন্টের পাদদেশে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৩ জুলাই, নৈমিত্তিক সাঁতার, জ্যুডো প্রশিক্ষণের সাথে নদীর তীরে ষ্টেনগান থেকে টার্গেট নিশ্চিত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৪ জুলাই, রুটিন প্রশিক্ষণের সাথে, হাতে কলমে লিমপেট মাইন ব্যবহার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। লোহার পাতটির ওজন ছিল প্রায় ২০ মন, দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট, চওড়া ৮ ফুট, পুরু ১ ইঞ্চি। একটি মাইন বিস্ফোরণের পর দেখানো হলো প্রায় ৪ ফুট গোলাকার যায়গা থেকে লোহা উড়ে গেছে।

১৫ জুলাই, নদীর বিপরীত পারে একজনকে লুকিয়ে ফটো তুলতে দেখা যায় কিন্তু তাকে পিছু নিয়েও ধরা সম্ভব হয়নি।

১৬ জুলাই, পাকিস্তান নেভীর একজন বাঙালি, অফিসার পরিচয়ে সরাসরি ক্যাম্পে চলে আসেন। তার কথাবার্তায়, আচরণে সন্দেহ হওয়ায় লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস তাকে আটক করে ব্যারাকপুর পাঠিয়ে দেন। ক্যাম্পে ওয়েলফেয়ার কর্মকর্তার পরিচয়ে ৬ জন বাঙালি সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা থাকতেন। তাঁরা কমাণ্ডোদের সাথে অত্যন্ত সহৃদয় আচরণ করে চলতেন। কিন্তু শেষ অবধি পরিচয় গোপন থাকেনি।

১৭ জুলাই, নৈমিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ষ্টেনগান ফায়ারিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আজ ফুলমিয়া ও বাবর আলী ক্যাম্প থেকে পালাতে যেয়ে ধরা পড়ে। তাদের ব্যারাকপুর সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়।(দু'জন পাক বাহিনীর গোয়েন্দা ছিল। কমাণ্ডো হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো।)

১৯ জুলাই, আজ কমাণ্ডো নিজেরা নদীতে সাঁতরিয়ে বিপরীত তীরে লোহার প্লেটে মাইন বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে প্রশিক্ষণ রপ্ত করে।

২০ জুলাই, ভারতীয় নৌ-বাহিনী প্রধান ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তিনি কমাণ্ডোদের মাইন বিষ্ফোরণের প্রশিক্ষণ কালে দাশ বাবুর সাথে অনেকগুলি গ্রুপের ফটো তোলেন।

২১ জুলাই, ষ্টেনগান প্রশিক্ষণ এবং রাতে সমারোহে ভ্যারাইটি শো আয়োজন করা হয়। আজ নিয়মিত খাদ্যের সাথে উন্নত খাদ্য পরিবেশিত হয়।

২২ জুলাই, স্থানীয় একদল লোক নাশকতা মূলক মনোভাব নিয়ে বেড়ীবাধ কাটতে আসলে গ্রামের অন্য দুজন এসে সংবাদ দিলে তাদের ঘিরে ধরে ফেলে।

২৬ জুলাই, পুনরায় ষ্টেনগান ফায়ারিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২৭ থেকে ৩১ জুলাই, যেমন প্রশিক্ষণের প্রতিযোগিতা চলে কমাণ্ডোদের মাঝে ও দারুন প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যায়। কারণ শোনা যাচ্ছিল শীঘ্রই অপারেশনের জন্য কমাণ্ডোদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

১ আগষ্ট, লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস নিজে টার্গেট নির্দিষ্ট করে কমাণ্ডোদের মাইন বিস্ফোরণ প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন এবং এদিনই ছিল প্রথম গ্রুপের ডেমনেশনের শেষ দিন।

২ আগষ্ট, চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য ৬০ জন কমাণ্ডোর দল এ, ডব্লিউ চৌধুরীর নেতৃত্বে ক্যাম্প থেকে বিদায় নিয়ে যায়।

৩ আগষ্ট, চাঁদপুর ও নারায়নগঞ্জের জন্য ৪০ জন কমাণ্ডোর দু'টি দল বদিউল আলম ও আবেদুর রহমানের নেতৃত্বে ক্যাম্প থেকে বিদায় নেয়।

৪ আগষ্ট, মংলা বন্দরের উদ্দেশ্যে ৬০ জন কমাণ্ডোর দল সাবমেরীনার আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়। আমিও এই দলের সাথে ক্যাম্প থেকে বিদায় গ্রহণ করি। **(কমাণ্ডো জি,এম, গফ্ফার নং-০০৪৯-এর '৭১ এ লিখিত ডায়রী থেকে সংকলিত)**

প্রথম অবস্থায় খালি সাঁতার শেখানো হতো। কয়েক দিন পরই প্রত্যেক কমাণ্ডোকে শরীরের সাথে গামছা দিয়ে বেঁধে নিতে হয় ৪/৫ কেজি ওজনের মাটির ঢিবি বা ইট। সাঁতার কাটার সাথে সাথে শেখানো হতো পানির নীচে বিস্ফোরণ ঘটানোর কৌশল। পানির নীচে মোটা চওড়া লোহার পাতরেখে তার গায়ে মাইন বা বিস্ফোরক স্থাপন করে বিস্ফোরণ ঘটানোর শিক্ষাই ছিল মূলত প্রধান। মাইন স্থাপন করে সুইচ চালু করে কমপক্ষে ৫০০ গজ দূরে চলে যেতে না পারলে তা ছিল বিপদজনক। কারণ এই অতীব শক্তিশালী মাইনে ৫০০ গজের মধ্যে পানিতে থাকলে বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় মানুষ বা প্রাণীর ফুঁস ফুঁস এবং হৃৎপিণ্ড ফেটে যেতে পারে। তাই এই প্রশিক্ষণ চলতো অতীব সাবধানতার সাথে যত্ন সহকারে। যে মাইন ব্যবহার হতো তার নাম ছিল লিম্পেট মাইন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি মাইনগুলি জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তৈরী করেছিল। যুগোস্লাভিয়ায় মাইনগুলি এতদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল।

ভারত-বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোদের দ্বারা ব্যবহারের জন্য এগুলি খরিদ করে নিয়ে আসে। ভারতীয় বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞবৃন্দ মাইনগুলি পানির নীচে ব্যবহারের জন্য কাঠামোগত কিছুটা পরিবর্তন করেন। প্রতিটি মাইনের মূল্য ছিল বারোশত ইউ এস ডলার। ভারত দু'হাজার টি মাইন যুগোস্লাভিয়া থেকে খরিদ করে। ওজন ৫ কেজি। মাইন গামছা দিয়ে পেটের উপর বেঁধে জাহাজের গা বা যে কোন লোহার সাথে স্থাপন করে বিস্ফোরণ ঘটানোই মূল প্রশিক্ষণ ছিল। পানির নীচে ৪ থেকে ৫ ফুট গভীরে যে কোন পদার্থের সাথে মাইন স্থাপন করা যেত মাইনের সাথে সংযুক্ত শক্তিশালী চুম্বকের মাধ্যমে। প্রথমে ডুব দিয়ে সাথের ধারালো ছুরি বা ড্যাগার দিয়ে জাহাজের গায়ের শ্যাওলা পরিস্কার করে, পরবর্তী ডুবে কোমর থেকে গামছা দিয়ে বাঁধা মাইন খুলে ওই পরিস্কার স্থানে লাগিয়ে সুইজ ভেঙ্গে দিয়ে সাঁতার কেটে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হতো। এই ডি-লে সুইজ এর সময় থাকতো ৪০ থেকে ৫০ মিনিট। দুপুর দুইটা পর্যন্ত চলতো এই প্রশিক্ষণ। তারপর এক ঘণ্টার জন্য খাওয়ার বিরতি ছাড়া ছয়টা পর্যন্ত চলতো বিরামহীনভাবে প্রশিক্ষণ। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ নিতে হতো গ্রেনেড ছোঁড়া, রাইফেল চালানো ও টার্গেট সঠিক করা, স্থলভাগে বিস্ফোরণ ঘটানোর পদ্ধতি আয়ত্ত করা, কমব্যাট শেখা, ফুটবল খেলা, ওয়াটার পোলো। পানির নীচে অধিক সময় ডুব দিয়ে থাকারও অভ্যাস গড়তে হতো। কারণ কমাণ্ডোদের অপারেশন পরিকল্পনা ছিল পানির নীচে। সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাটি ছিল মরন খেলা।

ভারতীয় শিখ সেনারা যে আন-আর্মড কমব্যাট শিক্ষা দেন তার মাধ্যমে যে-কোন যুবক অতি ক্ষীপ্রতার সাথে যে-কোন সশস্ত্র শত্রুর নিকট থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া কিংবা সংকটাপন্ন অবস্থায় শত্রুকে ঘায়েল করে নিরাপদ স্থানে সরে পড়তে সক্ষম হওয়ার শিক্ষা লাভ করতো যা একেবারেই জাপানী জুডো কারাতের অনুরূপ। এর পর সন্ধ্যা ছয়টায় পূনরায় পানিতে নেমে অন্ধকারে সাঁতার কাটা এবং বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ চলতো রাত নয়টা পর্যন্ত। প্রতিদিন ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিতে হতো। এই দুঃসাহসিক কাজে অতি অল্প সময়ে অধিক পারদর্শিতা অর্জনের জন্যই কমাণ্ডোদের এত দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণ চলতো। প্রশিক্ষণের সময় কেবলমাত্র সুইমং কষ্টিউমই গায়ে থাকতো। যা ছিল এক বিচিত্র এবং স্মরণীয় ঘটনা। শত শত যুবক সকলেই একসাথে সাঁতারের

জন্য সূতার কাপড়েরর তৈরী, চিকন জাঙ্গিয়া পরে চলা ফেরা করছে, প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, কিন্তু কেউই লজ্জা বা সংকোচ অনুভব করছে না। দেশপ্রেম যে মানুষকে কতটা উজ্জীবিত করতে পারে তা পলাশীর প্রান্তরে সেই নৌ-কমাণ্ডোদের স্মৃতিতে গাঁথা আছে। সকালে নৈমিত্তিক আরও একটি বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা ঘটতো, যখন ৪০০ যুবক একই সাথে খোলামাঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে সারিবদ্ধ ভাবে বসতো। নিতান্ত আদিম মনে হলেও দেশের জন্য তারা এসবই মেনে নিয়েছে। প্রস্থালন কার্য নদীতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে সম্পন্ন করতো। এই কাজ সকলকে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হতো। সময় নষ্ট করার সুযোগ ছিলনা। তাই ঘর বানিয়ে কিউ দিয়ে পায়খানা করার সময় কোথায়? সুতরাং লজ্জাকে নিবারণের অভ্যাস তৈরী করা হয়।

ভারতীয় অফিসারদের মাঝে ছিলেন একমাত্র বাঙালি লেঃ সমীর কুমার দাস(দাস বাবু)। বাংলাদেশের বিক্রমপুরে তার পুর্ব পুরুষের নিবাস ছিল। তিনি এই বাঙালি নৌ-কমাণ্ডোদের এত নিজের করে শিক্ষা দিতেন যে আজও নৌ-কমাণ্ডোদের হৃদয়ে দাস বাবুর স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। প্রশিক্ষণের জন্য তিনি অতি অল্প খরচে লিম্পেট মাইনের পরিবর্তে একই কার্যকারিতার নতুন মাইন উদ্ভাবন করেন। নৌ-কামাণ্ডোরা দাস বাবুর ভালবাসাকে স্বীকৃতি জানিয়ে এই মাইনের নামকরণ করেন "দাস মাইন"। স্বল্প ভাষী এই অফিসার রাতে কমাণ্ডোদের তাঁবুতে ঘুরে খোঁজ খবর নিতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে ঝোপের আড়ালে একাকী কাঁদতে দেখা গেছে কারণ হয়ত ভাবতেন তিনি এই ছেলেদের মুত্যুর জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন। অথচ দাস বাবু, মেঘালয়ে এক মটর দূর্ঘটনায় নিহত হন। নৌ-কমাণ্ডোদের নিয়েই তিনি মেঘালয় গিয়েছিলেন অভিযানের জন্য পৌছে দিতে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত, সাথের চালক গাড়ী চালাতে-চালাতে ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ গাড়ী রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা লেগে চুর্ণ হয়ে দাশ বাবু মারা যান। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এই অসমসাহসী নাবিকের স্মৃতি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে নৌ-কমাণ্ডোদের হৃদয়ে। যাঁর নিগূঢ় প্রেরণা নৌ-কমাণ্ডোদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে সাহসী করে তুলেছিল। দুই মাস সতেরো দিন একটানা প্রশিক্ষণের পর প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয় আগষ্ট মাসের ১ তারিখ। প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে সক্ষম হন ৩৫৭ জন। যদিও এক হাজার সদস্যের এ বাহিনী

গঠনের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তিন ব্যাচে মোট ৪৯৯ জন সদস্য এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। দেশ স্বাধীন তরান্বিত হওয়ায় শেষের ১৫০ জনকে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়নি। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং কৌশল গত কারণে একসঙ্গে ৫০০ অথবা ১০০০ সদস্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি। পরিকল্পনাকারী গণের ধারণা ছিল, যে কমাণ্ডোদল যুদ্ধে যাবে তার অধিকাংশ মৃত্যুবরণ করবে, তাতে কমাণ্ডোদের মাঝে ভয় ভীতি ও জন্মাতে পারে। এজন্য একসাথে বেশি সদস্য নিযুক্ত করা হয়নি। এছাড়াও সংখ্যাধিক সদস্য একসাথে হলে মেইনটেনেন্স এর অসুবিধা হতো। ফলে উন্নত প্রশিক্ষণ সম্ভব হতোনা। গোপনতা রক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ বিভিন্নদিক বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।

প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর ২ আগষ্ট থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিকল্পনা মত অপারেশন বা অভিযানে পাঠানো শুরু হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কেবল মাত্র স্থলে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল, এতে শত্রু সেনার বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিল না মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। এছাড়া জলপথে-শত্রু বাহিনীর খাদ্যশষ্য, সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনেও তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না, ফলে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এতদিন গরুত্ব পায়নি। নৌ-কমণ্ডোদের সফল আক্রমণ শুরু হলে পাকিস্তান শাসকদের টনক নড়ে। উপর্যুপরি হামলায় হানাদার সেনাদের মনোবল অনেক ভেঙ্গে যায়। এছাড়া বিদেশী কোন জাহাজ আর বাংলাদেশের নদী বন্দরে মাল নিয়ে আসতে রাজী হতো না। বীমা কোম্পানী ও জাহাজের ক্ষতি পূরণ দিতে অস্বীকার করে, ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বিদেশীরাও তখন থেকে মুক্তিযুদ্ধকে প্রাধান্য দিতে থাকে। এসময় বাংলাদেশ নামক পত্রিকা লেখে, "মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরের এক মুখপাত্র জানান যে, নৌ-কমাণ্ডোরা বাংলাদেশের জলসীমায় ২৩টি স্টীমার, লঞ্চ ও বার্জ ডুবিয়ে দিয়েছে। ঢাকা, চাঁদপুর ও চট্টগ্রামে আরও ৮টি নৌ-যান ডুবিয়ে দিয়েছে।" বি.বি.সি এবং রেডিও অষ্ট্রেলিয়া এমনই সংবাদ প্রচার করে।

প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানী সেনারা এই নৌ-কমাণ্ডো হামলা কিভাবে হচ্ছে বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের ধারণা ছিল নৌকায় করে এসে রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধারা মাইন লাগিয়ে এই ধ্বংসাত্মক কাজ চালাচ্ছে।

ফলে আগষ্ট মাসের শেষের দিক থেকে পাকিস্তানী সেনারা নদীপথে নৌকা চলাচলের উপর কড়াকড়ি আরোপ করে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরে আক্রমণ অব্যাহত থাকলে কোন কোন সময় তীক্ষ্ম সার্চ লাইটের মাঝে নদীতে নৌ-কমাণ্ডোর চেহারা পাকিস্তান বাহিনীর চোখে ভেসে ওঠে এবং কোন কোন আক্রমণে ২/১ জন নৌ-কমাণ্ডো ধরা পড়ার পর পাকিস্তানী জান্তার কাছে এই নৌ-কমাণ্ডো পরিকল্পনা পরিস্কার হয়ে যায়। কিন্তু ততদিনে নৌ-কমাণ্ডোরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে নিয়েছে। তখন সকল নৌ-বন্দর প্রায় অকার্যকর। ভারতীয় নৌ-কর্মকর্তা সহ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমাণ্ডারবৃন্দ প্রায়সই নৌ-কমাণ্ডোদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা কালে বোঝাতে চাইতেন, নৌ-হামলার গুরুত্ব। নৌ-হামলায় যত তাড়াতাড়ি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রচার সম্ভব অন্য কোন ভাবে তা সম্ভব নয়, তাই নৌ-অভিযান পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নে প্রথম থেকেই কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

প্রথম ব্যাচের ৩৫৭ জন কমাণ্ডোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৬০ জন নৌ-কমাণ্ডোকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে একজন সমন্বয়কারীর অধীনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। প্রথম অভিযান চালানোর জন্য নির্ধারিত হয় মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, চাঁদপুর, নারায়নগঞ্জ ও দাউদকান্দি নদীবন্দর। সমন্বয়ক হিসাবে ছিলেন মংলা ও হীরন পয়েন্টের জন্য সাবমেরিনার কমাণ্ডো আহসান উল্লাহ। এই দলে ছিলেন মোট ৬০ জন কমাণ্ডো। চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে ছিলেন সাবমেরিনার আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী। এই দলে ছিলেন মোট ৬০ জন নৌ-কমাণ্ডো। নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর অভিযানে ছিলেন, সাবমেরিনার আবদুর রহমান। এই দলে ছিলেন ২০ জন নৌ-কমাণ্ডো। এই ২০ জনের মধ্য থেকে ৯জন কমাণ্ডোকে পৃথক করে শাহজাহান সিদ্দিকীসহ দাউদকান্দি ফেরীঘাটে আক্রমণের জন্য আলাদাভাবে পাঠানো হয়। চাঁদপুর নদী বন্দর অভিযানে ছিলেন সাবমেরিনার মোঃ বদিউল আলম। এই দলে ছিলেন ২০ জন নৌ-কমাণ্ডো।

১৪ই আগষ্ট মধ্যরাতের পর হামলার সময় নির্ধারিত ছিল। এইদিন ছিল পাকিস্তানীদের স্বাধীনতা দিবস। এদিনে সৈন্যরা স্বাধীনতা উদযাপনে ব্যস্ত থাকবে। এই সুযোগ কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু কিভাবে

দেশময় রটে যায় যে, এই দিনে মুক্তি বাহিনী বড় ধরণের আক্রমণ চালাতে পারে। ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরাও এদিন অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। এজন্য আক্রমণ ও একদিন পিছিয়ে দিতে হয়। প্রতিটি দল কোন পথে, কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকবে, রাস্তার ম্যাপ, আকস্মিক ভাবে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য সশস্ত্র 'ফ্রিডম ফাইটার', এবং 'গাইড' প্রতিদলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট বন্দরের অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থান এবং জোয়ার ভাটার গতি সকল বিষয়ে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেয়া হয়। এবং প্রত্যেক দলনেতার সাথে একটি করে এক ব্যাণ্ডের ছোট রেডিও দেয়া হয় এবং অপারেশন যাত্রার পর প্রতিদিন সকালে ৭-৩০ মিনিট আকাশবাণী 'খ' কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য বলা হয়। দল নেতাকে জানিয়ে দেয়া হয়, এই কেন্দ্র থেকে পঙ্কজ মল্লিকের "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান"টি শুনলে বুঝতে হবে দলনেতাকে অপারেশনের জন্য সব রকম প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এর "আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ী" গানটি শোনা মাত্র যত প্রতিকূল অবস্থা থাকুকনা কেন, সেদিন রাত ১টা থেকে ২টার মধ্যে নির্দিষ্ট জাহাজে বা বিষয় বস্তুতে (টার্গেট) হামলা করতেই হবে, যার পরিকল্পনা পূর্বে জানিয়ে দেয়া ছিল। এই গান দুটির কথা দলনেতা ছাড়া অন্য কেউ জানতেন না। সকল সমন্বয়কারীকে পলাশী থেকে দিল্লী নিয়ে অতি গোপনীয় ভাবে এই সাংকেতিক গানের কথা জানিয়ে দেয়া হয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার সাথে। প্রতি কমাণ্ডোকে দেয়া হয় একজোড়া ফিন্‌স, একটি লিম্‌পেট মাইন, একটি করে ড্যাগার, একটি গামছা, এবং সঙ্গে অল্প কিছু টাকা। প্রতি দলে থাকে (৭ জনের একটি ছোট দল) একটি করে এস, এম,জি। সকল দল, ২ আগষ্ট থেকে ৪ আগষ্ট এর মধ্যে পলাশী নৌ-প্রশিক্ষণ ঘাটি থেকে সমন্বয়কারীর অধীনে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে 'নৌ-কমাণ্ডো অভিযান' এর তাৎপর্য হলো, সকল কমাণ্ডোকে দৃঢ়ভাবে মেনে নিতে হয় যে, তার জীবনটি দেশের জন্য উৎসর্গ করতে হবে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, পশুর এর মত ভয়াল নদীতে, সকল রকম নিরাপত্তা ছাড়া প্রচণ্ড একটি শক্তিধর মাইন জাহাজের গায়ে স্থাপন করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জীবনে বেঁচে থাকার আশা ছিল নিতান্তই অলীক। যুদ্ধকালে

শত্রুসেনার গানবোট ছিল সার্বক্ষণিক টহলরত। এদের দৃষ্টি এড়িয়ে, জলে কুমির-হাঙ্গরের ন্যায় হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কল্পনা করা যেতো না। এছাড়া বর্ষায় বাংলাদেশের নদীগুলি যে ভয়াল রূপ ধারণ করে তারমাঝে গভীর রাতে নদী পাড়ি দিয়ে শত্রু জাহাজে মাইন লাগানো এবং ফিরে আসার সংকল্প জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে আত্মাহুতি দেয়ার সামিল। কমাণ্ডোদের ৩ থেকে ৫ মাইল নদী কখনও কখনও সাঁতরাতে হয়েছে। বিপর্যয়ের মুখে একাধারে ২/৩ দিন পানির নীচে আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে আড়াল করে রাখতে হয়েছে। এসব কিন্তু কল্পকাহিনী, আরব্য উপন্যাসের গল্প অথবা আজকের কোন এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী নয়। ৭১'র মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি এমনই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অভিনব উপায়ে ধ্বংস করেছেন, শত্রুর জাহাজ, নৌপথে সৃষ্টি করেছিলেন দূর্ভেদ্য প্রতিরোধ। লেখকের বর্ণনায় এ অভিব্যক্তি পুরোপুরি প্রকাশ সম্ভব নয়। হৃদয়ের গভীর ভালবাসা এবং দেশের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই আত্মোৎসর্গীকৃত কমাণ্ডোদের দেশপ্রেম এবং ত্যাগকে নিরিখ করা যায়।

আটজন বাঙালি সাবমেরিনারের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ

(লেঃ (অবঃ) গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ বীর প্রতীক, সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, বদিউল আলম বীর উত্তম ও আবেদুর রহমান বীর বীক্রম এর সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে সংকলিত)।

তুলন শহরে যৌবনের সোনাঝরা স্বপ্নভরা মায়াবী কর্মময় দিনগুলি ভালই কাটছিল। যেদিকে তাকাই শুধু সুন্দরের ছড়াছড়ি। সৃষ্টি কর্তা তার ভাণ্ডারের সমস্ত রঙ ছিটিয়ে এই শহরকে সাজাতে কার্পন্য করেনি। একই সাথে চারিদিকে নীলনয়নারা তাদের পেখম মেলে যেন নিবেদনের ভঙ্গিতে বিদ্যমান। শহরের পার্ক, ক্লাব, বার, রেস্তোরায়, রাস্তাঘাটে প্রতিটি জায়গায় মানব-মানবীরা যৌবনের জয়গান গেয়ে চলেছে। শোক, দুঃখ, ব্যাথাকে ওরা পরাজিত করেছে যৌবনের উচ্ছলতায়। দুঃখ-ব্যথা তারা বোঝেনা, বুঝতে চায়না। ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি ধারণকারী পাশ্চাত্যের এই ছোট অথচ সুন্দর শহরে সরকারী দায়িত্ব পালনের অবসরে তাদের সাথে আমরাও গা ভাসিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। দুচোখ ভরে উপভোগ করছিলাম সুন্দরকে। ঝাপসা হয়ে এসেছিল বাংলার পর্ণ কুঠিরের স্মৃতি।

ফ্রান্সের তুলন পোতাশ্রয়ের জলসীমায় ভাসমান সাবমেরিন পি,এন,এস ম্যাংগোতে আমরা ৫৭ জন পাকিস্তানী নৌ-সেনা প্রশিক্ষণরত ছিলাম। ৫৭ জনের মাঝে ১৩ জন ছিলাম বাঙালি। হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড়ের মত ঢাকাসহ বাংলাদেশে ২৫ মার্চের রাতের ঘটনা বিবিসি'র সংবাদ বুলেটিনে শুনে অতর্কিত আমাদের সেই উচ্ছল সোনালী স্বপ্ন, কাচের মত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। জানতে পারলাম পশ্চিমা বাহিনী নির্বিচারে নিরস্ত্র বাঙালি হত্যা শুরু করেছে, সশস্ত্র বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঙালি সৈনিকরা অস্ত্র সম্বরণ না করে নিজের অবস্থানে থেকে প্রতিরোধ করতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। অনেকে অস্ত্রসহ সেনানিবাস ছেড়ে চলে এসেছে। পুরা সংবাদ আমাদের নিকট না পৌঁছলেও সৈনিক হিসেবে অনুমান করতে কষ্ট হলোনা যে বাংলাদেশে কি ঘটছে। তাই সুদূর ইউরোপে বসেও মাতৃভূমির এহেন দুঃসংবাদে হৃদয় মন কেঁদে উঠল। দেশের এই সন্ধিক্ষণে দায়িত্ববোধ বিবেককে দংশন

করতে থাকলো। প্রবাসে হলেও আমরা সশস্ত্র বাহিনীর কঠর নিয়ম শৃংখলাকে উপেক্ষা করতে পারিনি। প্রশিক্ষণ রত ১৩ জন বাঙালির মাঝে পরস্পর মত বিনিময় করে বোঝার চেষ্টা করলাম একে অন্যের মনোভাব। ২৭ মার্চ বিকেল ৫ টায় ডিউটির পর পূর্ব পরিকল্পিত মত ৯ জন বাঙালি সাবমেরীনার একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে করনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একত্রিত হলাম। বাকী ৪ জনকে সমমনা না ভেবে তাদের কিছুই জানতে দিলাম না।

উল্লেখ্য যে ৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার তার নৌ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ফ্রান্স থেকে ৩টি সাবমেরিন খরিদ করে। এগুলো পরিচালনা করতে প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের ৫৭ জনের দলটিকে পাঠানো হয়েছিল। অপর দুটি জাহাজ ২৫ মার্চের পূর্বেই তুলন ঘাটি ত্যাগ করে পাকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করে। ওই জাহাজেও বাঙালি নাবিক ছিলেন। আমাদের জাহাজ পি,এন,এস ম্যাংগ্রো'র ১লা এপ্রিল তুলন ত্যাগ করার কথা। যাহোক বৈঠকে লক্ষ্য করা গেল উপস্থিত প্রত্যেকেই দেশমাতৃকার এই সংকটে নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য একমত। প্রথমে সিদ্ধান্ত হলো, আমরা যে সাবমেরীনে প্রশিক্ষণরত এই সাবমেরীনটি ডুবিয়ে দিব। ২৮ মার্চ দেশের অবস্থা জানার জন্য অল-ইণ্ডিয়া, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ শোনার পর পুনরায় গোপন বৈঠকে বসলাম। তখন আমরা জানতে পেরেছি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি সৈনিকরা প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত, নিরিহ, নিরস্ত্র জনগণ দেশত্যাগ করে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। ভারত সরকার বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করছে এবং পাকিস্তানের জঙ্গী কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় মুখর। তাই জাহাজ ডুবিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পুনঃসিদ্ধান্ত নেয়া হলো জাহাজ ত্যাগ করে যেভাবেই হোক মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে। তাতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি যেমন সবল হবে, সাথে পশ্চিমাদের প্রভূসুলভ আচরণের সমুচিত জবাব দেবার সুযোগও হাতছাড়া করতে রাজী ছিলাম না। আমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা এবং সংযত আচরণ করে চলছিলাম। যাতে পশ্চিমা সৈনিকরা কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে। তুলন পোতাশ্রয়টি যেমন সুরক্ষিত এর অবস্থান নির্ণয় ও খুব কঠিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানরা ফ্রান্স দখল

করার পর বন্দী সৈনিকদের দ্বারা সমুদ্র সংলগ্ন পাহাড়েরর গা কেটে পানির নীচে জাহাজ রাখার এই গোপন ঘাটি তৈরী করে। সমগ্র ইউরোপসহ বিশ্বে এই পোতাশ্রয়ের গুরুত্ব অনেক বেশী। সব সময় দেশী বিদেশী ডুবোজাহাজ এখানে ভিড়ে। উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য অনেক দেশ থেকে নাবিক পাঠানো হয়। ফলে এখানে ফ্রান্সের বৃহৎ মেরিন একাডেমী ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রান্সবাসীর কাছে তুলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাকিস্তানী সহকর্মীদের দৃষ্টিকে ফাঁকিদেবার জন্য আমরা ৯ জন বিদ্রোহী নাবিক সবাই কর্তব্য কাজে আগের চেয়েও বেশী আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে থাকি। আমরা বোঝাতে চাই যে, আমরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানিনা এবং পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হোক এটা আমরা পছন্দ করিনা। ৩০ মার্চ আমাদের প্রশিক্ষণ শেষ। সাবমেরীনের পোতাশ্রয় ত্যাগের আর মাত্র দু'দিন বাকি। আস্থা দৃঢ় কারার জন্য আমরা আমাদের মালপত্র নেভাল মেস্ হতে জাহাজে উঠিয়ে ফেলি। প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় আমাদের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু নাবিক ও প্রশিক্ষণরত ছিলেন। যাদের সাথে আমাদের বেশ সখ্যতা গড়ে উঠে। দক্ষিণ আফ্রিকা তখনও বৃটিশ উপনিবেশ। তাই শ্বেত চামড়ার মানুষদের প্রতি তাদের ঘৃণা পুঞ্জিভূত ছিল। সেযাই হোক আমরা শেষ মুহুর্তে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা আফ্রিকান বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে সাহায্য প্রার্থনা করি। বন্ধুরা ও সম্মত হয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তারা আমাদের ছোট এক একটি ব্যাগ পোতাশ্রয়ের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছে দেন। কিন্তু দেশ ত্যাগ করতে আমাদের প্রয়োজন পাসপোর্ট এবং অর্থ। এগুলো ছিল সাবমেরীনের একটি লকারের অভ্যন্তরে এবং কি-বক্স থেকে লকারের নির্দিষ্ট চাবি সংগ্রহ ছিল দুরূহ কাজ।

এই দুরূহ ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজটির দায়িত্ব দেয়া হলো বদিউল আলম ও আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরীর উপর। তখন হাতে সময় খুবই কম। ভাগ্য প্রসন্ন তাঁরা উভয়ে গোপনে পাসপোর্টগুলি হস্তগত করতে সমর্থ হলেন। ৫৭ টি পাসপোর্ট ভর্তি ব্যাগ এনে নির্দিষ্ট ৯ টি পাসপোর্ট রেখে বাকীগুলি আগুনে জ্বালিয়ে ফেলি। সমস্ত কাজগুলি আমাদের করতে হচ্ছে অতি সন্তর্পনে। ধরা পড়লে মৃত্যুদন্ড অনিবার্য। কিন্তু দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্খা এতটা উদ্বুদ্ধ করেছে যে মৃত্যুভয় তখন আমাদের কাছে তুচ্ছ।

ম্যাংগ্রো পাকিস্তানের পথে যাত্রার ঠিক আগের দিন ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় আমরা আফ্রিকান বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে একজন একজন করে মার্কেটিং করার কথা বলে পোতাশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়ি। পরিকল্পনামত বিভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চললেও একই স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হই। সেখান থেকে একশ কিলোমিটার দূরে ফ্রান্সের অপর শহর মারসেলীতে একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনে চড়ে যাত্রা শুরু করি।

আফ্রিকান বন্ধুরা মার্সেলী পর্যন্ত আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। মার্সেলীতে এই বন্ধুদের নিকট হতে বিদায় নিতে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে, যা আজও আমাদের স্মৃতিতে দাগ কেটে আছে। রাত তখন এগারোটা।

সম্মুখে কন্টকিত, অনিশ্চিত, দূর্লঘ্ন মৃত্যুর অন্ধকার পথযাত্রা জেনেও আমরা এগিয়ে চলি। আমাদের মাঝে আব্দুল মান্নানকে কেবল মার্সেলীতে দেখা পাওয়া যায়নি। কিন্তু আব্দুল মান্নানের জন্য কাল ক্ষেপন নির্বুদ্ধিতা মনে করে আমরা আটজন জেনেভার উদ্দেশে ট্রেনে চেপে বসি। ১লা এপ্রিল সকাল ৮টায় আমরা জেনেভা পৌছি। কিন্তু আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট থাকা সত্বেও ভিসা না থাকায় কাষ্টম কর্তৃপক্ষ আমাদের গতিপথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাই যে, আমরা নৌ-বাহিনীর শিক্ষানবীশ হওয়াতে আমাদের ভিসা দেয়া হয়নি। কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম যে, ওরা পাকিস্তান দূতাবাসে ফোনে আমাদের সম্বন্ধে খোজ না করে। সাবমেরীনার আবেদুর রহমান ছাড়া বাকী ৭ জনকে কাষ্টম কর্তৃপক্ষ আটক করে পাসপোর্ট নিয়ে নিলো। কর্তৃপক্ষকে সবিনয় অনুরোধ জানিয়েও নিষ্ফল হয়। একঘণ্টা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাটানোর পর একজন পুলিশ কর্মকর্তা পাসপোর্টগুলি আমাদের প্রতি এগিয়ে দিয়ে ভারী কণ্ঠে জানালেন ভিসা ছাড়া কাউকেই জেনেভা ঢুকতে দেয়া হবেনা। তোমাদের পুনরায় ফ্রান্স ফিরে যেতে হবে। এটিও আমাদের কাছে অধিক পাওনা মনে হলো। কারণ আমরা সার্বক্ষনিক মনে করছিলাম, আমাদের পাকিস্তান দূতাবাসে ফেরত পাঠানো হবে।

এযাত্রা রক্ষা পেয়ে পাসপোর্টগুলি বুকে বেধে আমরা পুনরায় প্যারিসে ফিরে গোপনে পাকিস্তান দূতাবাসে খোজনিয়ে জানতে পারি দূতাবাসের সকলেই তুলন গেছে ম্যাংগ্রোকে বিদায় জানাতে। আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা নিরাপদ না ভেবে ফ্রান্সের অপর সীমান্ত শহর লিয়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি।

১লা এপ্রিল ম্যাংগ্রো তুলন ঘাটি ত্যাগ করার পূর্বে সাবমেরীনের লোকজনের কাছে ধরা পড়ে যে, ৯ জন বাঙালি নাবিক পলাতক। কিন্তু সম্ভাব্য সকল স্থানে খোজ নিয়ে তাঁদের অবস্থান সম্বন্ধে সন্দিহান হলেও পাকিস্তান দূতাবাস ও জাহাজের কর্মকর্তাবৃন্দ বিষয়টি গোপন রাখে। কারণ তাদের ভয় ছিল ফ্রান্স কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনা জানাজানি হলে (ফ্রান্স) ম্যাংগ্রোর যাত্রার নির্দেশ বাতিল করে দিতে পারে। ম্যাংগ্রো, ফ্রান্স ত্যাগ করে স্পেনের বন্দরে পৌঁছে আমাদের পলায়নের ঘটনা বার্তা পাঠিয়ে ফ্রান্স কর্তৃপক্ষের নিকট জানিয়ে দেয়। সাথে সাথে সকল গোয়েন্দা সংস্থা চারিদিকে আমাদের খুঁজে বের করার জন্য হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। পাকিস্তান দূতাবাসের মাথায় হাত পড়ে।

আমরা সন্ধ্যায় লিয়ন পৌঁছে হোটেলে অবস্থানের জন্য খোঁজাখুজি করতে যেয়ে বুঝতে পারি যে, আমাদের পুলিশ খুঁছে বের করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণে দুটি হোটেল মালিক আমাদের পরিচয়পত্র দেখতে চায়। কোথাও ঠাই না পাওয়ায় আমাদের যাত্রা পুনরায় অনিশ্চিত মনে হলো। কিন্তু ফ্রান্সের মাটিতে অবস্থান আমাদের কাছে বিপদজনক মনে হতে লাগলো। যে করেই হোক ফ্রান্স ছেড়ে যেতে হবে।

লিয়নে অনেক কষ্টে পাশাপাশি দুটি হোটেলে আমরা অবস্থান করতে থাকি। একইসাথে যে কোন উপায়ে ফ্রান্স থেকে অন্যদেশে যাওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকি। একদিন ট্যুরিষ্ট অফিসে খোজ নিয়ে রহমতউল্লাহ সাহেব জানতে পারেন যে, স্পেন সরকার মাত্র তিন মাসের জন্য বিদেশীদের স্পেনে প্রবেশে কোন ভিসা লাগবেনা এই মর্মে একটি নির্দেশ জারী করেছে। এই সংবাদ জেনে মনে হলো আমরা গভীর তিমির থেকে আলোর পথ পেয়েছি। বিন্দুমাত্র দেরী না করে পরের দিন সকালে আমরা ৮ জন স্পেনের পোর্টবো রেল ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। এখানকার কর্তৃপক্ষকে পার্সপোর্ট দেখাতেই তারা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে শহরের তিন-চারটি হোটেলের নাম ঠিকানা জানিয়ে দিল। আমরা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে খোঁজ খবর নিয়ে শহরের একটি অখ্যাত হোটেলে অবস্থান নিলাম, যাতে পরবর্তীতে আমাদের অবস্থান কেউ জানতে না পারে।

সেসময় বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা আমাদের পক্ষ ত্যাগ করার কথা সম্প্রচার করে। পোর্টবো থেকে আমরা ৮ জন দু'দলে বিভক্ত হয়ে স্পেনের অপর

শহর বার্সিলোনা পৌঁছি। এখানে আমরা পুনরায় দু'দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। একদল অন্য দলকে হারিয়ে ফেলি। বার্সিলোনা ষ্টেশনে বহু খোঁজাখুজির পর পুনরায় সকলে মিলিত হই। ষ্টেশন ছেড়ে হোটেলের খোঁজে বের হই। বার্সিলোনার এক হোটেল মালিকের সহানুভুতির কথা আজও স্মৃতিকে নাড়া দেয়। স্পেনেও তখন পুলিশ আমাদের খোঁজ করছে। হোটেল মালিকের কন্যা পুলিশকে জানিয়ে দেয় যে, আমরা তাঁদের হোটেলে রাত্রি যাপন করে সকালে হোটেল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছি। পুলিশ এবং পাকিস্তান দূতাবাসের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হোটেল থেকে চলে যাবার পরপরই পরস্পর মত বিনিময় করে সিদ্ধান্ত নেই যে, অতি দ্রুত ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগীতায় দেশে ফেরার চেষ্টা চালাতে হবে।

এবার হোটেল মালিক ও তার কন্যার সহযোগীতায় দুটি ট্যাক্সি ভাড়া করে আমরা মাদ্রিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে অনেক উৎকণ্ঠার মাঝে কোন বাঁধা বিপত্তি ছাড়াই শেষ পর্যন্ত আমরা মাদ্রিদ পৌঁছতে সক্ষম হই। পুনরায় হোটেল সন্ধানের বিড়ম্বনায় পড়ি। পিছনে ভয় ছায়ার মত সঙ্গ নিয়ে চলেছে কখন পুলিশ এসে ধরে ফেলে। তখন সময় নষ্ট নিজেদের কাছে অসহনীয় মনে হতে লাগলো। অনেক মহৎ উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব পালনের জন্য এই দূর্গম যাত্রা, একই বন্ধনে শুরু হলেও বাস্তবতা তখন একে অপরকে কিছু দূরে সরিয়ে ফেলেছে। সামান্যতেই পরস্পরের মাঝে মনের অমিল ঘটতে থাকে। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে মতদ্বৈততা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতে পৌঁছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সকলে ঐক্যবদ্ধ। পরদিন রহমতউল্লা ও মোশারফ সাহেব মাদ্রিদস্থ ভারতীয় দূতাবাসে পৌঁছেন, যোগাযোগ করার জন্য। দূতাবাসের সাথে সকল যোগাযোগ সম্পন্ন করে ফিরে আসার পর এদিন বিকেলেই পুনরায় আমরা আটজন দূতাবাসে পৌঁছি। সেখানে তখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অনুপস্থিত থাকায় চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মিঃ বেদী আমাদের অভ্যর্থনা জানান এবং অত্যন্ত প্রীত হন আমাদের পেয়ে।

তিনি আমাদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে ভারত সরকারের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় চাইছি এই মর্মে আবেদন পত্র গ্রহন করেন। দূতাবাসের কাজ সম্পন্ন করে পুনরায় হোটেলে ফিরে আসি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রী বেদী আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। দু'দিন পর

বেদী সাহেব আমাদের জ্ঞাত করান যে, ভারত সরকার আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে। তাঁর কথামত আমরা পাকিস্তানী পাসপোর্ট দূতাবাসে জমা দেই। পরদিন দূতাবাস থেকে আমাদের প্রত্যেককে জরুরীভাবে ভারতীয় পাসপোর্ট প্রদান করে একটি ইতালীয় বিমানে রোমের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। জানিয়ে দেন যে, রোম বিমান বন্দর থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটি বিমানে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হবে। ভারতীয় দূতাবাস রাজনৈতিক কারণে আমাদের উক্ত প্লেনে রোমের পথে যাত্রা করার খবর প্রকাশ করে দেয়। ফলে রোম এয়ারপোর্টে প্রায় দু'শত সাংবাদিক আমাদের ঘিরে ফেলে এবং প্রশ্নবানে বিদ্ধ করতে থাকে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা উত্তর প্রদান করি যে, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশেই আমরা পাকিস্তানী নৌ-বাহিনী ত্যাগ করে চলে এসেছি। মাতৃভূমির জন্য আমরা যুদ্ধ করবো। এসময় পাকিস্তান দূতাবাস থেকে কর্মকর্তারা ওখানে পৌঁছে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন আমরা একটা নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ি। কিন্তু সাথে সাথে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দের হস্তক্ষেপে আমরা এয়ারপোর্ট সংলগ্ন একটি ভি,আই,পি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং দূতাবাসের নির্দেশে হোটেলে আমাদের কড়া পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।

পাকিস্তানী দূতাবাস ইতালী সরকারের নিকট এই মর্মে অভিযোগ উপস্থাপন করে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর আটজন নাবিককে ফুঁসলিয়ে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ইতালী সরকারের প্রতি পাকিস্তান দূতাবাস অনুরোধ জানায় তাঁদের আটক করে যেন পাকিস্তানীদের কাছে হস্তান্তর করে। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে ভেবে ভারতীয় দূতাবাস আটটি টিকেট সংগ্রহ করে অতিদ্রুত সুইজ এয়ার লাইনের একটি বিমানের পিছন দরজা দিয়ে পুলিশ প্রহরায় আমাদের প্লেনে তুলে জেনেভার পথে রওয়ানা করিয়ে দেয়। এই প্লেন জেনেভা হয়ে বোম্বে পৌঁছবে। তড়িঘড়ির কারণে আমাদের অনেক মূল্যবান মালপত্র হোটেলে থেকে যায়। এসময় অর্থসম্পদ আমাদের কাছে মূলহীন ছিল।

জেনেভা বিমান বন্দরে নামার পর সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা আমাদের অভ্যর্থনা জানায় এবং সুড়ঙ্গ পথে ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে যায়। পূর্বে আমরা জেনেভা ত্যাগ করেছি তখন আমরা ছিলাম পাকিস্তানী এবার বাঙালি, যদিও সাথে ছিল ভারতীয় পাসপোর্ট। সমগ্র বিমান বন্দর এলাকা সশস্ত্র সৈন্য

দিয়ে ঘেরাও। জানতে পারি সম্ভাব্য বিমান দুস্যুতা এড়াতে এই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। এখানে আমাদের নিরাপত্তার ত্রুটি না থাকলেও অল্পক্ষণেই কয়েকজন পাকিস্তানী কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিতে সম্ভাব্য সকল রকম প্রস্তাব দেয় কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়। জেনেভাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা আমাদের বাইরে অবস্থান নিরাপদ নাভেবে বিমান উঠার জন্য পরামর্শ দেয়। আমরা সুড়ঙ্গ পথে পুনরায় বিমানের সিড়ির গোড়ায় পৌছি। পাকিস্তানীরা তখনও আমাদের অনুসরণ করছে। বিমানের ছিটে বসে পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেই। করাচি শহরের উপর দিয়েই একসময় আমরা বোম্বে এয়ারপোর্টে এসে পৌছি। তুলন নৌ-ঘাঁটি থেকে অনিশ্চিত যাত্রার পর অনেক ভাগ্য বিড়ম্বনার সমাপ্তি ঘটে ৮ এপ্রিল বোম্বে এয়ারপোর্টের মাটিতে পা রাখার মধ্য দিয়ে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ প্রনিধানযোগ্য যে, আমরাই হলাম প্রবাসে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী বাঙালি প্রথম এবং বৃহৎ সেনা দল। তাই বিষয়টি পাকিস্তানকে যেমন ভাবিয়ে তোলে, সারা বিশ্বে আমাদের অবস্থান পরিবর্তনের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় পাকিস্তান সরকারেরও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জন্য তারা আমাদের ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়ে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। পরবর্তীতে আমাদের অবর্তমানে সামরিক আদালতে বিচার করে প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড রায় প্রদান করে। নরপশুরা বর্বরোচিত ভাবে বিনা বিচারে এদেশে ত্রিশলক্ষ মানুষকে হত্যা করলেও বৈধভাবে আমাদের হত্যা করতে পারেনি।

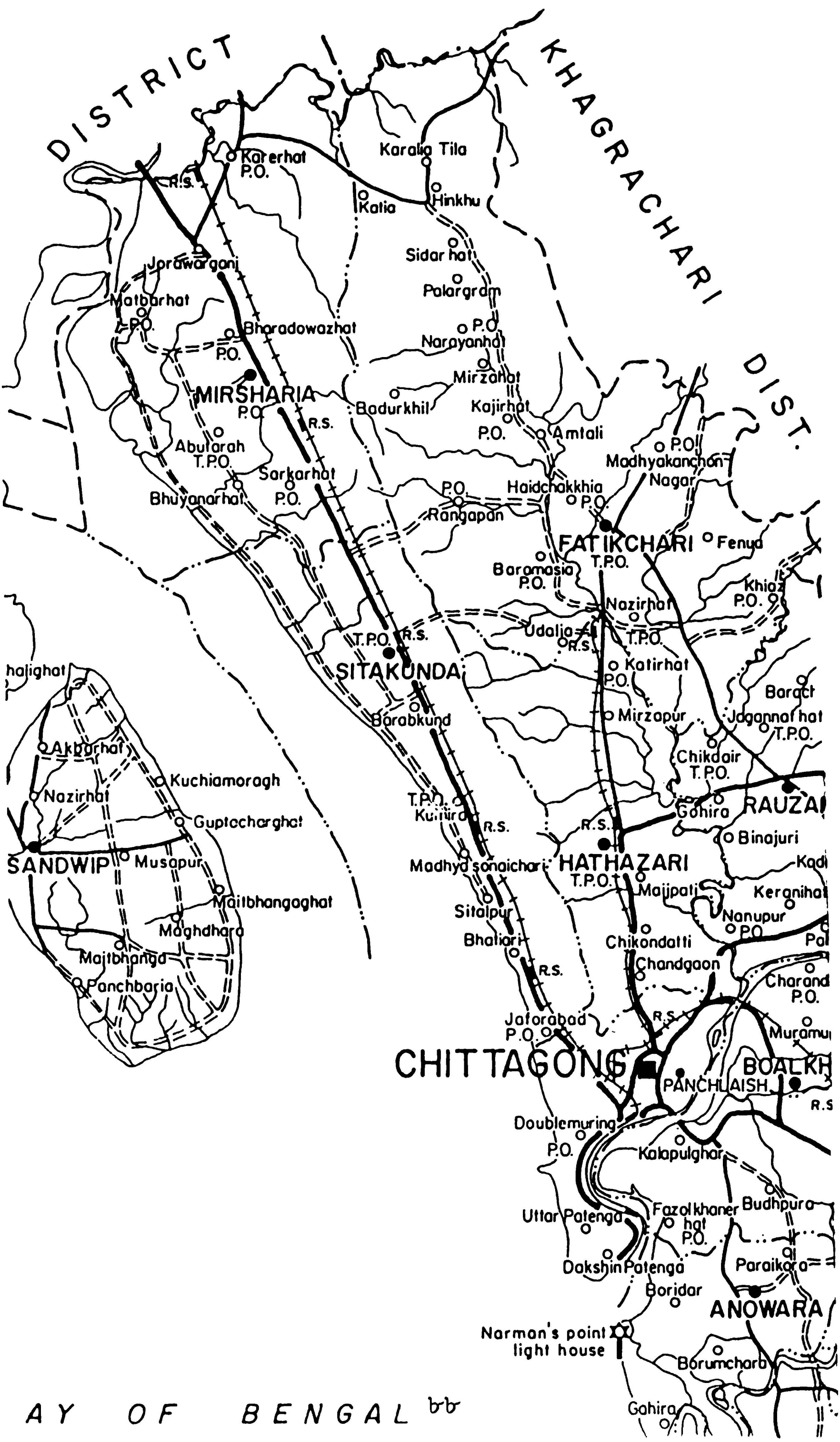
বোম্বে এয়ারপোর্টে পূর্বাহ্নেই আমাদের সম্পর্কে অবহিত করাছিল। পৌছানোর সাথে সাথে আমাদের ৮জনকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভারতীয় সামরিক বিভাগের কর্মকর্তারা আমাদের কাছে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর নানা গোপন তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। একদিন পর, ১০ এপ্রিল সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রহরায় আমাদের দিল্লী পাঠিয়ে দেয়া হলো। দিল্লী পৌছলে বিমান বন্দরে থেকে সামরিক গাড়ীতে আমাদের নিয়ে তোলা হলো হোটেল রনজিৎ-এ। এখানে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডার মিঃ শর্মার সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তাকে দেখে ও কথা বলে অত্যন্ত বিনয়ী ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা মনে হলো। তিনি আমাদের থাকা-

খাওয়ার সকল রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। এখানে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা প্রতিদিনই পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর তথ্যাদি খুটিয়ে জানতে চেষ্টা করতেন। কয়েকদিন হোটেলে অবস্থানের পর হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রোডের একটি আলাদা বাড়ীতে আমাদের স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। যদিও এসময় জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন ছিল। এই জিজ্ঞাসাবাদে আমরা বিব্রত হতামনা কারণ আমরাও ভাবতাম যুদ্ধমান পরিস্থিতিতে শত্রু–মিত্র যাচাই করা যেমন প্রয়োজন, চিহ্নিতকরণ ও খুব কঠিন কাজ। যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে কিছু বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তর তা আরও পরিস্কার হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে। মুক্তি বাহিনীতে অনেক অনুপ্রবেশকারী ছিল যারা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং দেশের ধ্বংশের কারণ হয়েছে। '৭১ এ তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহন ছিল কেবল আত্মরক্ষামূলক। কোন কোন নেতৃত্বদানকারী যোদ্ধাও এমন দোষে দুষ্ট ছিল। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তারা স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর অপারেশন
(অপারেশন জ্যাকপট)

অপারেশন জ্যাকপটের আওতায় ১৫ আগষ্ট '৭১, চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে যে বড় আকারের কমাণ্ডো দল তৈরী করা হয় তার সমন্বয়ক মনোনীত হয়েছিলেন সাবমেরিনার আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী। বৃহৎ সাফল্যের কথা চিন্তা করে প্রথম অপারেশনে স্বভাবতই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের চৌকস কমাণ্ডোদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। একই সাথে এই অভিযানের সার্বিক গোপনীয়তা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নেয়া হয়। মধ্য জুলাই থেকে বাংলাদেশের নদীবন্দরের অবস্থা, শত্রু সৈন্যের অবস্থান ও শক্তি, বন্দরে পৌঁছানোর সম্ভাব্য নিরাপদ গতিপথ, আশ্রয় স্থল, নদী ও সমুদ্র বন্দরের টাইডাল চার্ট, মানচিত্র, সাংকেতিক নির্দেশনা, কমাণ্ডোদের প্রত্যাগমণ ও নিরাপত্তার জন্য সাহায্যকারী দল, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক পরিকল্পনা ও যোগাযোগ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টরের কমাণ্ডার রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম ও মিত্র বাহিনীর পূর্ব অঞ্চলের ডেল্টা সেক্টরের কমাণ্ডার ভরতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং।

২রা আগষ্ট দুপুরে এদল প্রথম চট্টগ্রামের উদ্দেশে পলাশী প্রশিক্ষণ ঘাটি ত্যাগ করে। দীর্ঘ জীবনের মাঝে মাত্র আড়াই মাসের পরিচয়. কিন্তু এত অল্প সময়েও একে অপরের সাথে যে হৃদ্যতা গড়ে উঠে তা সমস্ত জীবনের বন্ধুত্বের চেয়ে কম নয়। সকলেই জানতেন এই বিদায় কারো কারো জন্য শেষ যাত্রা। এক মর্মস্পর্শী, পরিবেশের মধ্যে অশ্রু সজল চোখে একে অন্যের থেকে বিদায় নিলেন। এই সময়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সবচেয়ে কঠিন যে ব্যক্তিটি ভারতীয় জাঠ রেজিমেন্টের সদস্য এবং কমব্যাট প্রশিক্ষক নানা আবুজ, তার চোখেও পানি ছল-ছল করছিল। এমন শুষ্ক পরিবেশকে হালকা করতে যাত্রাপথকে শুভ কামনা করে ঠোটে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে দুপুর একটায় ৬০ জন কামাণ্ডো সামরিক বাহিনীর ট্রাকে চেপে বসেন। এ স্থানটি বাংলার স্বাধীনতা হরনের স্বাক্ষর বহনকারী 'রাক্ষসী পলাশী' হিসেবে অবিহিত। একসময় পীচঢালা পথ ধরে সামনে এগিয়ে চলে কমাণ্ডো বাহিত সামরিক ট্রাক দুটি। ঘড়িতে তখন দুপুর দু'টো বাজে। দৈত্যের বেগে রাত নয়টা নাগাদ ট্রাকগুলি এসে পৌঁছে ব্যারাকপুর



DISTRICT
KHAGRACHARI DIST.
MIRSHARIA
SITAKUNDA
FATIKCHARI
HATHAZARI
RAUZAN
SANDWIP
CHITTAGONG
PANCHLAISH
BOALKHALI
ANOWARA
Karerhat P.O.
Karalia Tila
Hinkhu
Kalia
Sidar hat
Palargram
Narayanhat P.O.
Mirzahat
Kajirhat P.O.
Amtali
Badurkhil
Jorawarganj
Matbarhat P.O.
Bharadowazhat P.O.
Abutorah T.P.O.
Bhuyanarhat
Sarkarhat P.O.
Rangapan P.O.
Haidchakkhia P.O.
Madhyakanchon Nagar P.O.
Fenua
Baromasia P.O.
Nazirhat T.P.O.
Udalia R.S.
Khiaz P.O.
Katirhat P.O.
Mirzapur
Baroct
Jagannat hat T.P.O.
Chikdair T.P.O.
Gohira
Binajuri
Borabkund
Kumira T.P.O.
Madhya sonaichari
Sitalpur
Bhatiari
Jaforabad P.O.
Majipati
Keranihat
Nanupur P.O.
Chikondatti
Chandgaon
Charandi P.O.
Muramuri
Doublemuring P.O.
Kalapulghat
Uttar Patenga
Fazolkhaner hat P.O.
Budhpura
Dokshin Patenga
Paraikora
Boridar
Narman's point light house
Borumchara
Gohira
R.S.
T.P.O.
halighat
Akbarhat
Nazirhat
Kuchiamoragh
Guptacharghat
Musapur
Maitbhangaghat
Maghdhara
Maitbhanga
Panchbaria
AY OF BENGAL

সেনানিবাসে। এখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন দমদম বিমানঘাটি থেকে সামরিক বাহিনীর বিরাটকায় ড্যাকোটা বিমান কমাণ্ডোদলকে নিয়ে বাতাসে ডানা মেলে শহরে ইট পাথরের বড় বড় দালান কোঠার উপর দিয়ে। গ্রামের সবুজ-শ্যামল ক্ষেতের উপর ছায়া ফেলে সামরিক বিমান কানফাটা শব্দে এগিয়ে চলেছে। ককটিপে বসা সুদর্শন চালক এবং ক্রুবৃন্দ। কমাণ্ডোদলের সবার চোখ বিমানের বাইরে নিবদ্ধ। কেউ আকাশে সাদা-ধূসর মেঘরাজী দেখে পুলকিত হয়ে উঠছেন। কেউ নীচে মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবছে পৃথিবী বুঝি সবুজ চাঁদরে ঢাকা।

কমাণ্ডোদের এই যাত্রা পথের বর্ণনা দিয়ে সুণীল গঙ্গপাধ্যায় তাঁর 'পূর্ব-পশ্চিম' গ্রন্থে লিখেছেন,– প্লেনে চাপলো সিরাজুল। এর আগে আকাশ দিয়ে সে প্লেন উড়তেই দেখেছে শুধু, সে যে কখনো আকাশ পথের যাত্রী হবে, তা যেন স্বপ্নেও ভাবেনি। তার ধারণা ছিল প্লেনে বুঝি শুধু স্যুট-টাই পরা বড় লোকরাই যাওয়া-আসা করে। কিন্তু আগরতলার এই প্লেনের অনেক যাত্রীরই চেহারা ও পোশাক গ্রামে-গঞ্জে দেখা মানুষের মতন। কেউ কেউ সঙ্গে এনেছে চটের থলে, তার থেকে উপছে বেরিয়ে আসছে লাউ-কাঁঠাল। অনেক দিন পর সিরাজুল নিজেই পরেছে পরিষ্কার নতুন জামা কাপড়, পায়ে কেড্স। তাকে দু'সেট এই পোশাক কিনে দেয়া হয়েছে।

আকাশ আজ পরিষ্কার, বিমানের জানালা দিয়ে নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। প্রথম প্রথম তো ছোট ছোট বাড়ি ও মাঠের লাঙল হাতে চাষা আর গরুর পালও সুষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, একটু পরে বন-জঙ্গল ও পাহাড়, তারপর একটা নদীতে পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে। মোচার খোলার মতন ছোট্ট, দেখাচ্ছে নৌকোগুলোকে, তবু ঐ নদীর দৃশ্য দেখে সিরাজুলের বুকটা মুচড়ে উঠলো। এটা কি তার খুব চেনা মেঘনা নদী? ইণ্ডিয়ার প্লেন কি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যায়?

তার পাশ থেকে মতিনও গলা বাড়িয়ে জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। তাকে সিরাজুল জিজ্ঞেস করলো, এইডা কোন নদী রে?

মতিন ও বলতে পারেনা। আকাশ থেকে দেখা ভূচিত্র সম্পর্কে তারও কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এখনও ওরা জানেনা যে ওদের গন্তব্য কোথায়।"

পরের দিন ভোরে কামাণ্ডোদল সহ বিমান ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা পৌঁছায়। বিমান অবতরণ করে জঙ্গলের অভ্যন্তরে এক গোপন বিমান ঘাটিতে। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নির্মিত। এখানে তাদের অভ্যর্থনা

জানান মেজর রায়। আগরতলা শহর থেকে ৫/৭ মাইল উত্তরে শালবন এলাকায়, এক নির্জন কোণে পূর্বেই তাবু খাটিয়ে তারকাটার বেড়া দিয়ে বি,এস,এফ-এর পাহারা বসিয়ে ক্যাম্প প্রস্তুত করা হয়েছে। নাম 'নিউ ক্যাম্প'।

পরের দিন ৬ তারিখ কিছু বিস্কুট এবং সিগারেট নিয়ে কমাণ্ডো দলকে স্বাগত জানাতে এলেন ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং। এখানে দু'দিন রেখে কমাণ্ডোদের সকল রকম প্লানিং, ব্রিফিং, গ্রুপিং, সমন্বয়, গতিপথ, চট্টগ্রাম বন্দর ও কর্ণফুলী নদীর ম্যাপ ও চার্ট, জোয়ার-ভাটার সময়, স্রোতের গতি এবং আরো অসংখ্য তথ্য বুঝিয়ে দেয়া হয়। যাত্রাপথে কোথায় কি ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং শাস্ত্রীরা কোথায় কিভাবে পাহারার ব্যবস্থা করেছে এসব জানিয়ে দেয়া হয়। সে সময়ে রাতের বেলায় নদীপথে সকল রকম নৌ-চলাচল নিষিদ্ধ ছিলো। বন্দরে কয়েকটি গানবোর্ট সার্বক্ষণিক টহল দিত। সে কথাও সতর্ক করে দেয়া হয় কমাণ্ডোদের। সীমান্ত অতিক্রম করে বন্দর পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথ লোকালয়। তাই নিরাপদ যাত্রার জন্য অধিক সতর্কতা ও যোগাযোগ পূর্ব থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। এই যোগাযোগ সম্পন্ন করেছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম এবং তিনি যাত্রার জন্য একাধিক সম্ভাব্য নিরাপদ রাস্তার সন্ধ্যান রেখেছিলেন। হরিণা থেকে বন্দরের অপর পার চরলক্ষ্যা পর্যন্ত।

৮ আগষ্ট 'নিউ ক্যাম্প' ছেড়ে সম্পূর্ণ দল পুনরায়, সামরিক ট্রাকে হরিনা ক্যাম্পে এসে পৌছে। এখানে কমাণ্ডো গ্রুপের দলনেতা এ,ডব্লিউ চৌধুরী, ১নং সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর রফিকের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী ও সামরিক সরঞ্জাম বুঝে নেন। চট্টগ্রাম বন্দর ছিল ১ নং সেক্টরের অধীন সুতরাং যুদ্ধ সংক্রান্তে সেক্টর কমাণ্ডারের প্রাধান্য অনস্বিকার্য। তাছাড়া সেক্টরের অভ্যন্তরে যুদ্ধে কৃতকার্যতা যেমন সেক্টর কমাণ্ডারকে গৌরবান্বিত করে ব্যর্থতার দায়ভার ও তাঁকে বহন করতে হয়। এছাড়া একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সেখানে সকল পর্যায়ের যোদ্ধার সমন্বয় রক্ষা অতি গুরুত্ব বহন করত।

মেজর রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম জানিয়েছেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরের যাবতীয় খবর সংগ্রহ করতেন একজন বাঙালি শিক্ষিকার নিকট থেকে। ওই শিক্ষিকার স্বামী সেনা বাহিনীর অফিসার ছিলেন। তার সমগ্র পরিবারের নিরাপত্তা দেয়া হবে এই সত্ত্বে শিক্ষিকা স্বামীর নিকট থেকে খবর সংগ্রহ করে গোপনে মুক্তিবাহিনীর নিকট পাঠাতেন।

৮ আগষ্ট মধ্যাহ্ন ভোজের পর হরিণা ক্যাম্প থেকে মেজর রফিক ও সাবেগ সিং কমাণ্ডোদের কাঁধে হাত রেখে সাহসের সাথে সাফল্য লাভের কথা বলে বিদায় জানালেন। এদিন সন্ধ্যায় সম্পূর্ণদল সামরিক জীপে পাহাড়ী পথ বেঁয়ে এসে পৌঁছে শ্রীনগর ক্যাম্পে। এখানে রাতের আহার সেরে প্রথম বাংলাদেশে প্রবেশ। ভারতীয় সেনা বাহিনীর মেজর রায় সীমান্ত পর্যন্ত দলকে সঙ্গ দিয়ে বিদায় জানান। ভারতীয় অফিসারদের আন্তরিকতা কমাণ্ডোদের যথেষ্ট অনুপ্রেরিত করে।

সামগ্রিক সাফল্যের কথা বিবেচনা করে ৬০ জন কমাণ্ডো দলকে ৩টি উপদ্দলে ভাগ করে এক-একজন কমাণ্ডোর উপর ২০ জন কমাণ্ডোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ২০ জন কমাণ্ডোর একটি দলের দায়িত্ব লাভ করেন ডাঃ শাহ আলম এবং বাকী দু'জন হলেন মাযহারউল্লা ও আব্দুর রশীদ। এখানে পথ চলার জন্য স্থানীয় গাইড এবং নিরাপত্তা দানের জন্য ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থল বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা, কমাণ্ডোদের সাথী করে দেয়া হয়। নিশুতি অন্ধকার, চারিদিকে নির্জনতা কিন্তু এক নাগাড়ে ঝি-ঝি পোকার ডাক। পাহাড়ী মশা তার সাথে জোক। অদ্ভুত ভিতিময় পরিবেশ। যাত্রাপথ কমাণ্ডোদের সম্পূর্ণ অচেনা। সামনে লোক পাঠানো হয়েছে, ফিরে ক্লিয়ারেন্স দেবে তারপরই অগ্রযাত্রা শুরু হবে। এই ফাঁকে সকলেই তাদের শৈশব, কৈশোরের দিনগুলো-সহপাঠী, বাপ-মা, ভাই-বোনের মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল। স্মৃতি মনে করা বড় মধুর। কিন্তু এই তরুণ যোদ্ধা কেউই সুখকর স্মৃতি নিয়ে যুদ্ধে আসেননি। তাই দেখা না গেলেও এসময় কারও কারও চোখ ভিজে উঠে।

পূর্ববর্তী ব্যক্তি ফিরে ক্লিয়ারেন্স জানালো। সাথে সাথে দীপ্ত পদে, অসীম সাহস সম্বল করে সতর্কতার সাথে পথ প্রদর্শককে অনুসরণ করে সামনে এগোতে লাগলো। সাব্রুম সীমান্ত থেকে সারারাত দীর্ঘ এবং ঝুকিপূর্ণ পথ পায়ে হেঁটে ছাগল নাইয়া থানার জিনারহাট, রানাঘাট এবং ফাজিলপুর হয়ে মুহুরী নদীর তীরবর্তী কৃষ্ণমন্দার বাজার এলাকায় তারা এসে পৌঁছেন। তখন রাত প্রায় শেষ। রাতভর পাহাড়ী ও কর্দমাক্ত পথ চলে সকলেই ক্লান্ত। এছাড়া সকলের কাছে রয়েছে একটি লিমপেট মাইন, ফিনস্, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ, শুখনা খাবার, কাপড় চোপড় ইত্যাদি। সব মিলিয়ে ২০ কেজির একটি বোঝা। এখানে পৌঁছে গাইডের পরিবর্তন হয়। পায়ে হাটার এই দীর্ঘপথ কষ্টকর হলেও শেষ পর্যন্ত পথে তাদের কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়নি। বরঞ্চ পথে স্থানীয়

মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎ পেয়ে আরও সাহসে পথ চলেছে। সমস্ত রাতই ছিল বর্ষণ মুখর। এতে কমাণ্ডোদের পথচলা নির্বিঘ্ন হলেও কষ্টের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। তাতে শারিরীক ভাবে সমর্থ কমাণ্ডোরা নুয়ে পড়েনি।

ঘাটে অপেক্ষমান তিনটি বড় আকারের নৌকায় চেপে সম্পূর্ণদল মুহূরী ও ফেনী নদী হয়ে ৯ আগষ্ট দুপুরে মীরশ্বরাই থানার ইছাখালি গ্রামে এসে পৌছে। কৃষ্ণমন্দার বাজার থেকে ইছাখালি পর্যন্ত নদীপথ টি অতিক্রম ছিল বিপদজনক। এই দূরত্বে দুটি রাজাকার ঘাটির পাশ কাটিয়ে চলতে হয়েছে। ইছাখালিতে কমাণ্ডোদেরই একজন রাজামিয়ার বাড়ী। সে এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক কর্মী মঙ্গল ভূঁয়া বাড়ীর শাহ আলম, কমাণ্ডোদের গোপন আশ্রয়, খাওয়া এবং যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগীতা করেন। শুভপুর ব্রীজ থেকে ২০ জন কমাণ্ডোর আর্মস ও এ্যমুনিশন সাগরের তীর বেয়ে সাম্পানে ফৌজদারহাটের উদ্দেশে নিয়ে যান পথ প্রদর্শক (গাইড) ভাটিয়ারীর মূর মুহাম্মদ।

১০ আগষ্ট রাতে ২টি দল পুনরায় যাত্রা শুরু করে এবং পায়ে হেঁটে মলিয়াইশ, সুফিয়া মঘাদিয়া, মায়ানী, শাহেরখালী ও ডোমখালী অতিক্রম করে সমিতির হাটের সন্নিকটে করম আলী বাজারের পশ্চিমে জনৈক বদিউল আলমের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রখ্যাত ছাত্রনেতা ইউসুফ এখানে কমাণ্ডোদলকে দুদিন আশ্রয় ও খাবারের জন্য সহযোগীতা করেন। পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী পথে পর পরই গাইডের পরিবর্তন হয়। ১২ আগষ্ট মধ্যরাতে চট্টগ্রামের জন্য নির্দ্ধারিত বৃহত্তম দল এসে পৌছায় ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের সন্নিকটে সমিতির হাট নামক স্থানে। এখান থেকে চট্টগ্রাম শহরে পৌছনো ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রধান সড়ক ধরে চট্টগ্রাম যেতে হবে। পথিমধ্যে কিছু দূর পর পরই ছিল পাক সেনাদের চেকপোষ্ট। কমাণ্ডোদের সাথে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধ সামগ্রী। সকলে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ১২ আগষ্ট, ৪০ জনের এই দল সমিতির হাটে আত্মগোপনে থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছনোর পথ খুঁজতে থাকে। ১৩ আগষ্ট সকালে চট্টগ্রাম পৌঁছতে হবে। মাইন এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম লুকিয়ে নেয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়া হলো। স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত তরিতরকারী ও ঝুড়ি খরিদ করে, ঝুড়ির নীচে মাইন ও বিস্ফোরক রেখে উপরে কপি, আলু, শাঁক ইত্যাদি সাজিয়ে দারগার হাট থেকে যাত্রীবাহী বাসে উঠিয়ে চট্টগ্রামে নেয়া হয়। এসব ঝুড়ি বাসের ছাদে

উঠাতে বাসের কন্ট্রাকটর ঝুড়িগুলি অধিক ভারী এবং যাত্রীদের চেহারা দেখে বুঝে ফেললেও তারা নিরব থেকে কমাণ্ডোদের বয়ে নিয়ে যায়। কমাণ্ডো খুরশিদ আলমকে ওইদিন সকালেই শহরে পাঠানো হয়, কমাণ্ডোদের শহরে নেয়ার জন্য কোনো বহণকারী গাড়ীর ব্যবস্থা করার জন্য। কমাণ্ডো খুরশিদ আলম বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকৌশলী আজিজুর রহমান এর সহায়তায় বিদ্যুতের লাইন মেরামতের গাড়ীসহ আরও একটি পিক-আপ নিয়ে আসেন মাইন ও বিস্ফোরক সামগ্রী বহণের জন্য। হাট থেকে গাড়ীতে এক গ্রুপের যুদ্ধাস্ত্র তুলে দিয়ে কমাণ্ডোরা ২-৩ জনের পৃথক পৃথক দল যাত্রীবাহী বাসে চট্টগ্রাম পৌছান। সহযোগী যোদ্ধা জানে আলম নিজে পিক আপ চালিয়ে কয়েকজন যোদ্ধাকে শহরে নিয়ে যান।

২০ জন কমাণ্ডোর যে দল সীতাকুণ্ড থানার সলিমপুরে জেলে পাড়ায় পাক বাহিনীর প্রতিরোধে আটকা পড়ে, তাঁরা অপারেশন জ্যাকপটে অংশ নিতে পারেননি। স্থানীয় বাসিন্দা ডাঃ ফয়েজ আহমদ, বশির মাষ্টার, নূরুল আলম, জানে আলম তাঁদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করেন। বাজার থেকে তাঁদের চুলদাড়ি ছাঁটিয়ে নিয়ে আসেন জানে আলম। সলিমপুরের মোঃ নাদের, কবির আহমদ, সালে আহমদ, মোঃ ইউসুফ মাইনগুলি সাম্পান থেকে উঠিয়ে কাশেম বলির বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন। দাউদ ও লোকমান মাইনগুলি শহরে কবির সওদাগরের বাড়ীতে পৌছে দেন। (তথ্য জানিয়েছেন করোলা করপোরেশনের কর্মচারী জানে আলম)।

শহরের যত কাছাকাছি কমাণ্ডোরা যাচ্ছেন বিপদ ও ততোই বাড়ছে। এর মধ্যে ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় ২টি গ্রুপের সব কমাণ্ডো আলকরণের মতিন টেইলার্সে এসে পৌছে এবং সেখান থেকে আগ্রাবাদে পূর্ব থেকে নির্দ্ধারিত 'মমতাজ মহলে', আশ্রয় গ্রহণ করেন। এছাড়াও নাসিরাবাদ এলাকায় নিজাম রোডে, সিডিএ মার্কেটের পাশে কাকলী নামের আরও একটি বাড়ীতে, মৌলভী পাড়া, সবুজবাগ, পানওয়ালা পাড়া, এমপি ইসহাক সাহেবের বাড়ী, কমাণ্ডো খোরশেদের বাড়ী, চকবাজারে কবির সওদাগরের বাড়ী, পূর্ব নাছিরাবাদ এখানেও কয়েকজন কমাণ্ডোকে আশ্রয় দেয়া হয়। শহরে আরও কতিপয় বাড়ীতে কমাণ্ডোরা আশ্রয় গ্রহণ করেন। কমাণ্ডো খুরশিদ আলম ও শাহীন বিরানী হাউসের মালিক জানে আলম কমাণ্ডোদের আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারে অসমসাহসীকতা ও দক্ষতার পরিচয়

দেন। কাকলী বাড়ীটির মালিক এনায়েত মাওলা পূর্ব থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। সবুজবাগের হাজীর হোটেলটিও ছিল কমাণ্ডোদের সম্মিলনের কেন্দ্র। একজন কমাণ্ডো অপরকে চেনার জন্য বিভিন্ন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করতেন। বিড়ি জ্বালিয়ে ও পরস্পরের বার্তা বিনিময় হতো। সেই সময়ে হাসি কিংবা, কাশি দিয়ে শুভ অথবা অশুভ সংবাদ জানানো হতো। এনায়েত মাওলা আশ্রয়, পরিবহণের গাড়ী, নৈতিক, আর্থিক সর্বোপরি সার্বিক সাহায্য প্রদান করে নৌ-যুদ্ধকে সফল করে তুলতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন।

কাকলীতে অবস্থান কালেই ১৩ আগষ্ট রেডিওতে বেজে উঠে পঙ্কোজ মল্লিকের কণ্ঠে "আমি তোমায় যত শুনিয়ে ছিলাম গান।" এই প্রত্যাশিত গান শোনার পর এ,ডব্লিউ চৌধুরী, কমাণ্ডো খুরশিদের সাহায্যে সকলকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন, যে করেই হোক ১৪ আগষ্ট শহর অতিক্রম করে কর্ণফুলি পাড়ি দিতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের পিক আপ এবং প্রকৌশলী আজিজুর রহমানের সহায়তায় হাসপাতালের একটি এ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে রাখা হলো কমাণ্ডোদের মাইন ও যুদ্ধাস্ত্র বহনের জন্য। ওই দিন সকালে সকল কমাণ্ডো শ্রমিকের বেশ নিয়ে গাড়ীতে চড়ে বসলেন। সকলে ছেড়া গেঞ্জি কিংবা সার্ট পরা' কাধে ঝুলানো গামছা। দেখলে মনে হবে শ্রমিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাজের জন্য। গাড়ী দুটি এভাবেই শহর পাড়ি দিয়ে কর্ণফুলীর তীরে মাঝিঘাটের খেয়াঘাটে গিয়ে পৌঁছে। এখানে ও নিরাপত্তা এড়িয়ে মাইন এবং যুদ্ধাস্ত্র নেয়ার জন্য ঝুড়িতে তরিতরকারী সাজিয়ে নদীর অপর তীরে চরলক্ষ্যার এক খামার বাড়ীতে পৌঁছান হয়। কমাণ্ডোরা ও পৃথক পৃথক ভাবে চরলক্ষ্যার খামার বাড়ীর আশ্রয়ে সঠিক সময়ে পৌছে যান, ২০ জন কমাণ্ডো ছাড়া। দ্বিতীয় গানটি ১৪ আগষ্ট বাজানোর পূর্ব সিদ্ধান্ত থাকলেও তা বাজানো হয়নি। ১৫ আগষ্ট সকালে আকাশবাণী থেকে দ্বিতীয় গান, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ী" বাজিয়ে অভিযানের নির্দেশ সংকেত জানানো হলে চরলক্ষ্যার খামার বাড়ীতে কমাণ্ডোরা অতীব উৎকণ্ঠায় রাতের অপেক্ষায় থাকেন। আজ রাতই হয়তো হবে অনেকের জীবনে শেষ রাত। আগামী দিনের সকাল হয়তো কারও কারও জীবনে আর ফিরে আসবেনা। কমাণ্ডোদের মাঝে ধিরে ধিরে স্নায়ুচাপ

বাড়তে থাকে। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর গোপন অভিযান পরিচালনার সময় এমন অনেক সাংকেতিক সঙ্গীত ব্যবহার করতো। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৯৪৬ সালের ৬ জুন বিবিসি থেকে প্রচারিত একটি গান বাজিয়ে ফ্রান্সের নর্মাণ্ডী দ্বীপে মিত্রবাহিনী তাদের সৈন্য অবতরণ করায়।

সকল প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতির সমাপ্তি ঘটিয়ে এক সময় ১৫ তারিখের সূর্য বিদায় নেয়। অন্ধকার নেমে আসে চরলক্ষ্যার খামার বাড়ীতে। কমাণ্ডোবৃন্দ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বন্দরে শত্রু পক্ষের অত্যধিক সতর্কতা অবস্থা ব্যাখ্যা করায় শেষ মুহূর্তে তিনজন কমাণ্ডো অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে অংশ গ্রহণকারী কামাণ্ডো সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭ জনে। প্রতি গ্রুপে ৩ জন করে মোট ১২টি গ্রুপে কমাণ্ডোদের ভাগ করা হয়। বর্ষণ মুখর রাত। গাঢ় অন্ধকারে নিজের হাত ও দেখা যায় না। কমাণ্ডোরা সন্তর্পনে এসে পৌছান কর্ণফুলীর তীরে বন্দরের অপর পাড়ে। নির্দিষ্ট ৩ জনের গ্রুপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পায়ে ফিনস পরে গামছা দিয়ে মাইন বুকে বেধেঁ নেন সকলে, কমরে একটি ড্যাগার। এ. ডব্লিউ চৌধুরী, ডাঃ শাহ আলম, মাযাহারউল্লা, ফারুক-ই-আযমসহ ৩ জন কমাণ্ডো তাদের অশ্রু সজল চোখে বিদায় জানিয়ে নদী তীরে অপেক্ষায় থাকেন। নদীতে তীব্র সার্চ লাইটের ঝলমলে আলো। এর সাথে পাক সেনাদের গানবোটগুলি সার্বক্ষণিক টহল দিয়ে চলেছে। চারদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। বন্দর নগরী ঘুমে অচেতন। কর্ণফুলি কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে। এখন জোয়ার ভাটার সন্ধিক্ষণ। তাই স্রোতের তীব্রতা কম।

রাত ১ টায় সকলে কর্ণফুলীর গভীর জলরাশির মাঝে ডুবে ৩ জনের এক একটি দল, হাতে হাত ধরে নির্ধারিত টার্গেটের দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে যান। ৩ জনের একটি গ্রুপ, ১টি টার্গেটের ৩টি স্থানে মাইন লাগিয়ে রাবারক্যাপ খুলে নিয়ে পুনরায় সাঁতরিয়ে নির্ধারিত আশ্রয়ে ফিরতে থাকেন। কমাণ্ডোরা নদীতে থাকতেই মাইনে বিস্ফোরণ শুরু হয়। শত্রু বাহিনী ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলি আক্রান্ত বুঝতে পেরে প্রচণ্ড শব্দে সাইরেন বাজিয়ে চলে। গানবোট থেকে শাস্ত্রীরা নদীর দুই কিনারে একটানা গুলি চালায়। বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে এসওএস বার্তা পাঠাতে থাকে। সাথে সাথে আক্রান্ত জাহাজ, বার্জ, গানবোট,

পল্টুন আস্তে আস্তে পানির নীচে তলিয়ে যেতে শুরু করে। ১৫ আগষ্ট রাতে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি টার্গেট সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস ও নিমজ্জিত হয়। এগুলির মাঝে ছিল এম,ভি আল আব্বাস, এম,ভি হরমুজ, মৎস বন্দরে নোঙরকৃত বার্জ ওরিয়েন্ট, নেভীর ২টি গানবোর্ট, বন্দরের পল্টুন ও আংশিক ক্ষতি গ্রস্ত হয়। এছাড়া ছোট ছোট কয়েকটি বার্জ সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। চট্টগ্রাম বন্দরের এই ভয়াবহ নৌ-অপারেশনের খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এই নৌ-অভিযান ও জাহাজ ডুবির কথা ফলাও করে প্রচারিত হয়। অপারেশন জ্যাকপটে চট্টগ্রাম অভিযানে যে সব নৌ-কমাণ্ডো অংশ নিয়েছিলেন তাদের মাঝে অন্যতম – ফারুক-ই-আযম, শাহ আলম, আঃ রশীদ, মাযাহার-উল্লাহ, আবু তাহের, আবুল বাশার, আবু মূসা চৌধুরী, আবু বক্কর সিদ্দিক, বদিউল আলম, কালাম, মহিবউল্লাহ, রাজা, এমদাদ, এন আই চৌধুরী, কামাল, মনোজ, সেলিম বাঙালী, খোরশেদ আলম, আনোয়ার, সাজেদুল হক, হাশেম, কাজল, অরুন ভট্টাচার্য্য, বশীর, আমীর হোসেন, আব্দুল হক, মোঃ হোসেন, আলম, সিরাজদৌলা, আনোয়ার, রহিম, মন্নু, জিলানী চৌঃ, নুরুল হক, নুরুল গণি, ফজলুল হক, বিধান চন্দ্র, শাহাব উদ্দিন, আবুল হাশেম, মাহবুব আলম, মোফাজ্জেল হোসেন, মতিন, আঃ গফুর খান, দেলোয়ার হোসেন, সত্যেন, ইলিয়াস খন্দকার, ফারুক আহমদ, মাওলা, ছালেহ আহম্মদ, মাহবুব আহমদ, গিয়াসউদ্দিন, ওয়াহিদ, অলিউল্লাহ, আলি আহমদ, কাজী এমদাদুল হক প্রমুখ। চট্টগ্রামে কমাণ্ডোদের যারা পরিচালনা (গাইড) করেছেন তাঁরা হলেন – মৌলভী সৈয়দ, আবু সাঈদ সরদার, জালল আহম্মদ, লোকমান গণি, ইউনুস, কবির সওদাগর সহ অনেকে।

এর পরের ঘটনা বিভৎস। ভোর হবার সাথে সাথে বন্দরের বিপরীত পাড়ে আনোয়ারা ও পটিয়া থানার উপর দিয়ে শত্রুবাহিনীর হেলিকপ্টার চক্কর দিতে থাকে। উপর থেকে আক্রমণকারীদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা হয় ব্যর্থ। শত্রুসৈন্য এই এলাকায় পৌঁছানোর পূর্বেই কমাণ্ডো বাহিনী সন্তর্পনে পুনরায় কর্ণফুলী পাড়ি দিয়ে শহরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দুপুর নাগাদ দখলদার সৈন্যরা স্থানীয় দালালদের সাথে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম কম্বিং অপারেশন চালাতে শুরু করে কিন্তু একজনও মুক্তি বাহিনীর খোঁজ না পেয়ে তারা হিংস্র হয়ে উঠে। পরাজয়ের শোধ নেবার

জন্য কয়েকটি গ্রাম সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। হত্যা করে অসংখ্য নিরীহ গ্রামবাসীকে। তুলে নিয়ে যায় গ্রাম থেকে যুবতী ও মহিলাদের, যারা আর ফিরে আসেনি। পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কাছে তখনও এই অভিযান কিভাবে ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়নি। তারা মনে করলো ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ফ্রগম্যানরা গোপনে এসে এই ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়েছে। তবে দেরীতে হলেও পাকিস্তান বাহিনী সত্য উদঘাটন করে। কিন্তু ততদিন ডুবন্ত জাহাজে পলি জমে বন্দরের প্রবশ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশী জাহাজ বন্দরে প্রবশ করত অসম্মতি জ্ঞাপন করছে। কমাণ্ডো অভিযানের সুফল ফলতে শুরু হয়। 'Bangladesh' নামক পত্রিকা নৌ কমাণ্ডোদের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশ করে, "On August 16th the brave commandos carried out a daering operation inside the chittagong port and blew up the ships "Al-Abbas" and "Harmose" with the capacities of 15,000 tons and 12,500 tons respectively. The ship "Al-Abbas" was launched by Ayub Khan in 1968 and a Barge loaded with jute Products was sank with five other Flats, Tugs, Gun boats by the guerillas the same day." পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের নিকট এই জাহাজ ডোবানো বন্ধের জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করেন। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অন্যান্য দেশের প্রতি অনুরোধ জানান "তারা যেনো কোন জাহাজ বাংলাদেশের জলসীমায় না পাঠায় তাহলে তা আমাদের সৈন্যরা ধ্বংস করার শক্তি অর্জন করেছে।" কর্ণেল ওসমানীর এই হুশিয়ারী মুলক বক্তব্য যথেষ্ট ফলদায়ক হয়েছিল। সেপ্টেম্বর থেকে বিদেশী জাহাজ পণ্য নিয়ে বাংলাদেশের বন্দরে আসতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। মুক্তিযুদ্ধ ক্রমান্বয়ে বিশ্ব দরবারে হয়ে উঠে গুরুত্ববহ।

নৌ-যুদ্ধের কৌশলগত দিক ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্থল অথবা নৌ-বাহিনীর নিয়মিত যুদ্ধের সাথে "সুইসাইড স্কোয়াড" এর সদস্যদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। নিয়মিত যুদ্ধ পরিচালিত হয় একজন পরিচালকের অধীনে কঠোর নির্দেশে। দলের সৈন্যের সংখ্যার উপর অধিনায়কের পদের ও পরিবর্তন

আনা হয়। কিন্তু কমাণ্ডো অভিযান এর সফলতা নির্ভর করে অংশগ্রহণকারী কমাণ্ডোর নৈপুন্য, সাহসিকতা এবং প্রজ্ঞার উপর। এখানে পরিচালক কিংবা দলনেতার ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

এপ্রসংঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধে ক্রাক প্লাটুন সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম, ঢাকা শেরাটন হোটেলে টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপুল ক্ষতি সাধন করেন। যাত্রাবাড়ী ব্রীজ এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেন। ক্র্যাক প্লাটুনের পরিচালক মেজর হায়দার কিন্তু কখনও এই গেরিলাযুদ্ধে অংশ নেন নাই। দলের সদস্যরাই সাহসিকতার সাথে নিজস্ব পরিকল্পনায় সফলভাবে এমন অনেকগুলি অপারেশন সংঘটিত করেছিলেন। মোজাম্মেল হক বীর প্রতীক, মোনায়েম খাঁনকে এককভাবে তার বাসভবনে গুলি করে হত্যা করেন। এই সকল অপারেশনে কোন নেতা ছিলেন না। একজন নৌ-কামাণ্ডো মাইন বুকে বেঁধে পানিতে সাঁতার শুরুর পর সে নিজেই নিজেকে কমাণ্ড করতে থাকেন। এইক্ষেত্রে পানির উপরে অপেক্ষমান দলনেতার ভূমিকা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আত্মঘাতি অভিযানে নিজের নেতৃত্বেই নির্দিষ্ট যুদ্ধের সাফল্য অর্জন করতে হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে খেমকারন সেকটরে যখন ভারতীয় ট্যাংক বহর পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ঢুকে পড়ে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সদস্য বুকে মাইন নিয়ে ভারতীয় ট্যাংকের সামনে শুয়ে-ভারতীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দেন। সে সময় কোন নেতা তাদের নির্দেশ দেননি। বেঙ্গল রেজিমেন্টের আত্মঘাতি সদস্যবৃন্দ নিজস্ব উদ্যোগেই দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডো গঠিত হয় অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সুশৃংখল ভাবে কিন্তু নৌ-কমাণ্ডো বাহিনীর তালিকায় কিংবা প্রবাসী সরকারের গেজেটেও দলনেতা বলে পৃথকভাবে উল্লেখ নেই। তবে সত্য যে, নিয়ম শৃংখলা রক্ষা ও সমন্বয়ের জন্য কাউকে না কাউকে মৌখিকভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। দলনেতা কিংবা উপ দলনেতা সুইসাইড স্কোয়াডদের জন্য গুরুত্ববহ নয়। বরঞ্চ এই সুযোগ সৃষ্টি করে কেহ-কেহ যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর নেতার পরিচয়ে তাঁরা বীরত্বপূর্ণ খেতাব গ্রহণে অধিক সুযোগ নিয়েছেন। যেমন সাবমেরীনার আব্দুল ওয়োহেদ চৌধুরী বীরউত্তম এবং বীর

বিক্রম দুটি খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু তিনি কেবল ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম অভিযানে চরলক্ষ্যা পৌছলেও নিজে জাহাজে মাইন লাগান নাই। অনুরূপভাবে মাযহারউল্লা, শাহআলম, ফারুক-ই-আযম এবং আবেদুর রহমান কখনও পানিতে না নেমে বীরউত্তম, বীর প্রতীক, বীর বিক্রম খেতাব পেয়েছেন। পাশাপাশি সাবমেরিনার বদিউল আলম এবং আহসান উল্লাহ অসংখ্য যুদ্ধে জাহাজে মাইন স্থাপন করে জাহাজ ধ্বংস করেছেন। অনেক নৌ-কমাণ্ডো দুঃসাহসিকতার সাথে বার বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও তাঁদের বীরত্বের খেতাব দেয়া হয়নি। তাই প্রকৃত যোদ্ধাদের কাছে এই পদক গুরুত্ববহ নয়। এই অসামঞ্জস্য অনেক যোদ্ধার ক্ষোভের কারণ হয়েছে।

এই প্রতিক্রিয়া কেবল নৌ-কমাণ্ডোদের মাঝে তাই নয়। স্থলবাহিনীর যোদ্ধাদের অভ্যন্তরেও এই বৈষম্য এবং বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

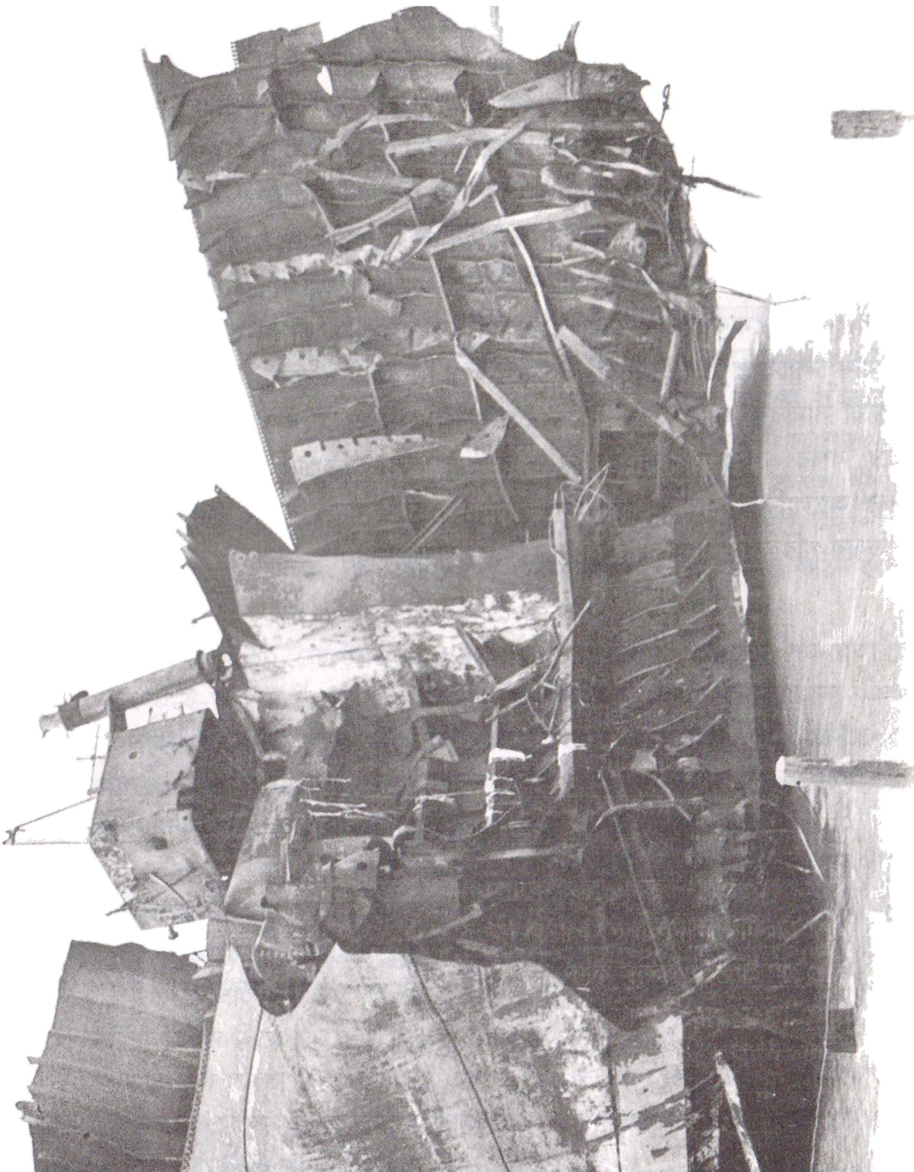
আর একটি বিষয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনা বাহিনী এবং বিডিআর সদস্য হিলট্রাক্টস এ, শান্তি বাহিনীর হাতে নিহত কিংবা বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলে তাঁদের অনেককে একই বীরত্ব সূচক খেতাব দেয়া হয়েছে এবং আজও সেই নিয়ম বহাল আছে। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক সামরিক নির্দেশে এনিয়ম প্রবর্তন করেন। যে নিয়ম বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর জন্য সম্মানজনক সুনিশ্চিত কিন্তু এর পিছনে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের খাটো করা হয়েছে। স্বাধীনতাউত্তর খেতাব প্রাপ্তদের তালিকা পৃথক হওয়া উচিত।

নৌ-কমাণ্ডোরা ১৫ আগষ্ট অভিযানের পর আরো কয়েকবার চট্টগ্রাম বন্দরে এবং বহিঃনোঙরে ও আক্রমন চালিয়ে পাকিস্তানী ও বিদেশী জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছেন।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযানের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফারুক-ই-আযম এবং তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন আবু মুসা চৌধুরী, খোরশেদ আলম, আবু তাহের, আবুবক্কর সিদ্দিক প্রমুখ স্থানীয় নৌ-কমাণ্ডো। প্রথম অভিযান শেষে অনেক কমাণ্ডো ভারতের মূল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করলেও স্থানীয় কমাণ্ডোদের অনেকে শহরে আত্মগোপন করে থাকেন, পরবর্তী আক্রমনের অপেক্ষায়। অনেক প্রতিবন্ধকতা এমনকি মৃত্যুভয়ও মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের যুদ্ধাভিযান থেকে পিছু হটাতে পারেনি। একের পর এক সফল আঘাত



'৭১এ চট্টগ্রাম বন্দরে নৌ-কমাণ্ডো কতৃক ধ্বংস প্রাপ্ত জাহাজ এর ছবি। ছবিঃ সাংবাদিক খন্দকার কামরুল হুদা।



চিটাগাং পোর্টে নৌ-কমান্ডোদের একটি এ্যাকশান

হেনে কমাণ্ডোরা ইতিহাসে বীরত্বের নজির স্থাপন করেছেন। পাকিস্তানীরা কখনোই জলভাগে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা (কমাণ্ডো) হামলার আশংকা করেনি। যে কারণে তারা জলপথে কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি, এনিয়ে তারা উদ্বিগ্ন ও ছিলনা কিন্তু একই রাতে বাংলাদেশের চারটি প্রধান সমুদ্রও নদী বন্দরে অনেকগুলি জাহাজ নিমজ্জিত হবার পর স্বভাবতই পাকিস্তানীরা নতুন ভাবে ভাবতে শুরু করে। যুদ্ধ পরিকল্পনা তারা বদল করতে বাধ্য হয়। নদী পথে জাহাজের নিরাপত্তার জন্য শত্রুবাহিনী সাংঘাতিকভাবে আতংকিত হয়ে উঠে। সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলার জন্য তারা অধিক টহলফাঁড়ি স্থাপন করে, নদীতে নৌযান চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। চট্টগ্রাম বন্দরের বিপরীত তীরে অস্থায়ী সামরিক ঘাটি স্থাপন করে। রাত্রি কালে জাহাজ থেকে মাল খালাস বন্ধ করে, বন্দর এলাকায় সান্ধ্য আইন জারি করে। সার্চ লাইটের আলোতে সমগ্র বন্দর আলোকিত করে রাখে। এমন নিচ্ছিদ্র প্রহরার মাঝে বন্দরে কমাণ্ডোদের অভিযান পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে কিন্তু বন্ধ থাকেনি।

দুঃসাহসিক বাহ্নিনোঙর অভিযান

১৫ আগষ্ট '৭১, বাংলাদেশের সকল নদী ও সমুদ্র বন্দরে লোমহর্ষক ও সাফল্যমণ্ডিত মাইন হামলার পর পাকহানাদাররাও সঙ্গত কারণেই তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি নতুন করে ঢেলে সাজায়। বিশেষ করে নদী ও সমুদ্র বন্দর গুলিতে তখন থেকে বিদেশী জাহাজ সমূহ বন্দরে অবস্থান না করে গভীর জলসীমায় রাত্রিযাপন করতো। নিরাপত্তার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ সেইমত নির্দেশ দিয়েছিল। নদীপথে শত্রুদের টহল তৎপরতা ও জোরদার করা হয়। রাত্রিকালীন সময়ে জাহাজ থেমে মাল খালাস বন্ধ করতে বাধ্য হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রহরা ব্যবস্থা সবচেয়ে জোরদার করা হয়। তখন অধিকাংশ বিদেশী জাহাজ এবং পাকিস্তানী জাহাজগুলি এই বন্দরে মালামাল ও যুদ্ধাস্ত্র নামাতো। প্রতিদিনই সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বন্দর এলাকাগুলিতে সান্ধ্য আইন জারী থাকতো। বন্দরের উভয় তীরে নিরাপত্তা ঘাটি স্থাপন করে। ফলে নৌ-কমাণ্ডোদের জন্য আক্রমণ রচনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

এরমাঝে ১২ সেপ্টেম্বর'৭১ চট্টগ্রাম বন্দরে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমন্বয়কারী ফারুক-ই-আযম, বন্দরের বহ্নিনোঙরে আক্রমণ পরিচালনার জন্য এক দুঃসাহসিক অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সেসময় পাকিস্তানীদের গানবোটগুলি কর্ণফুলির জলসীমায় টহল দিত। কারণ তারা কখনও চিন্তায়ও আনেনি যে, কমাণ্ডোরা সমূদ্রের অভ্যন্তরে যেয়ে জাহাজ ধ্বংস করবে।

ফারুক-ই-আযম, সহযোদ্ধা আবু মূসা চৌধুরী, আবু তাহের (প্রবাসী), খোরশেদ আলম, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ কমাণ্ডোর সাথে পরামর্শ করেই এই দূর্যয় অভিযানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। সিদ্ধান্ত নিলেন নৌ-কমাণ্ডোরা সমুদ্রের তীর বেয়ে বহ্নিনোঙর পর্যন্ত নৌকায় অতিক্রম করবেন। জাহাজ বরাবর যেয়ে তাঁরা মাইন নিয়ে নেমে পড়বেন সাগরের নোনা জলে। এগারোজন চৌকস কমাণ্ডো, দলনেতা এবং কভারিং এর জন্য শহরের দু'জন মুক্তিযোদ্ধা-কমাণ্ডার লোকমান হোসেন ও রহমানকে নিয়ে সম্পূর্ণ দল সাজানো হলো। সাথে থাকলো আরও কয়েকজন স্থানীয় গেরিলা যোদ্ধা।

কিন্তু অনভিজ্ঞ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে এ অভিযানের পিছনে একটা বড় ভুল থেকে যায়। এই তথ্য বিভ্রাট উদঘাটন অতি অভিজ্ঞ নাবিক ছাড়া অন্যের

পক্ষে সম্ভব ছিলনা। অনুসন্ধানী দলের (রেকী পার্টি) মতামত ছিল জাহাজগুলি তীর থেকে দেড় কিংবা দুই মাইল দূরে অবস্থান করছে। খালি চোখে সমূদ্র পৃষ্ঠে এমনটি ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতভাবে জাহাজগুলি তীর হতে দশ থেকে বারো মাইল দূরে নোঙর ফেলে পাশাপাশি অবস্থানে থাকতো। অথচ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধ জয়ের নেশায় টগবগে কমাণ্ডোরা এক মরণ ফাঁদে পা বাড়ান।

কর্ণফুলির মোহনার পূর্ব তীরে জলদিয়া বাঁতিঘরের পাশে একটি স্থান হতে এগারোজন কমাণ্ডো পরস্পরের হাত ধরে তিন জনের পৃথক্-পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে সাগরের অথৈ জলের নীচ দিয়ে জাহাজের প্রতি-এগোতে থাকেন। ফারুক-ই-আযম এর ভাষ্য থেকে জানা যায়, যাত্রার প্রারম্ভে কমাণ্ডোদের মাঝে কেহ-কেহ তাঁদের তওবা পড়িয়ে, কলেমা শুনিয়ে দিতে বলেন। কোন অনুভূতিতে এই আত্মপ্রত্যয়ি যুবকদের অনুরোধ ছিল তা বিশ্লেষণ দরকার হয়না। বর্তমান প্রজন্ম জানেনা যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ভিনদেশীরা আমাদের স্বাধীনতা উপহার দেয়নি।

সেদিন আত্মোৎসর্গীকৃত কমাণ্ডোরা একনাগাড়ে দেড়ঘন্টা সাঁতরানোর পর যখন জাহাজের নিকটে পৌঁছতে পারলেন না তখন তাঁদের মনে সংশয়ের উদ্রেক ঘটে। হয়তো কোথাও ভুল হয়েছে। ক্ষণ সময়ের ব্যবধানে তাদের ভুল স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যখন সাগরের বিশাল-বিশাল ঢেউ তাঁদের তলিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমুদ্রে যখন জোয়ার শুরু হয়, সেই সময়ে এমন প্রবল ঢেউ এর মাধ্যমে পানি তীরের দিকে ছুটতে থাকে। এবারে কমাণ্ডোদের অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হলো। এখন জীবন রক্ষার পালা কিন্তু বিশাল এক একটি ঢেউয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একটার পর একটা উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে কমাণ্ডোদের উপর। জলদিয়া বাতিঘরকে নির্দিষ্ট করে তাদের ফিরে আসার কথা থাকলেও বিশাল ঢেউ ও স্রোতের কাছে তাঁরা হার মানতে বাধ্য হন। উপরন্তু কমাণ্ডোরা নেভাল একাডেমির বাতিঘরকে জলদিয়ার বাতিঘর মনে করে তাঁরা সেদিকেই সাঁতরাতে থাকেন।

ইতিমধ্যে কয়েকজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরদিন ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে চারজনের অসাড় দেহ পতেঙ্গার নেভাল একাডেমীর পাশ্ববর্তী সমূদ্র তীরে পড়ে থাকতে দেখে পাক সেনারা তাঁদের কুড়িয়ে নিয়ে আসে। তখনও তাদের পায়ে ফিনস ও বুকে মাইন। বাকী ছয়জন অদূরে ভোলামিয়া সারেং এর কাঠঘরে

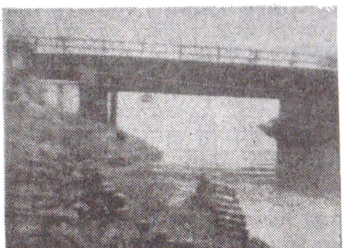
আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কমাণ্ডো তাহের অতীব কষ্টে জ্ঞান হারিয়ে গোঙ্গাতে থাকেন। মূসা চৌধুরী কোমরের গামছা দিয়ে তাহের এর মুখ বেঁধে ফেলেন যাতে শব্দ করতে না পারে। কমাণ্ডোরা এখান থেকে উজ্জ্বল আলোতে দেখতে পান যে পাকিস্তানী সৈনিকরা সমুদ্র ও মোহনার দিকে মেশিনগান পেতে আছে। উভয়ের দূরত্ব মাত্র কয়েক গজ। তাঁরা কাদাজলের মধ্যে কালভার্টের নীচ দিয়ে লুকিয়ে অদূরে ভোলা মিয়া সারেং এর বাড়ীতে পৌঁছেন। এখানে কেবল তাহের ও মূসা। বন্দী কমাণ্ডো নূরুল হকের উপর নির্যাতনের চিৎকার তারা শুনতে পান। ভোলা মিয়া সারেংকে জানায় তাঁরা মেলায় যাচ্ছিল সাম্পান ডুবিতে ভাসতে ভাসতে এখানে চলে এসেছে। (এইসময় মহেশ খালিতে মেলা বসে) তাঁদের কয়েকজন বন্ধুকে ধরে শত্রুরা নির্যাতন করছে। সুতরাং মূসা ও তাহের, সারেংকে পুত্র জ্ঞান করে তাঁদের জীবন রক্ষার আবেদন করেন। এই সারেং তাঁদের গোসল করিয়ে ঘর থেকে দুটি লুঙ্গি এবং ছেলের দুটি সার্ট পরিয়ে নাস্তা করান। এরপর তাহের ও মূসা তাঁদের শহর পর্যন্ত পৌছে দেয়ার অনুরোধ জানান। পতেঙ্গা থেকে শহরে যেতে কয়েকটি চেকপোষ্ট। রাজাকারদের প্রশ্নের উত্তরে সারেং উভয়কে শ্যালক পুত্র বলে পরিচয় জানিয়ে একসাথে হাটতে থাকেন। একসময় তাঁরা শহরে পৌছে যান। বাকী চারজন কমাণ্ডোও পৃথক ভাবে স্থানীয় বাসিন্দার সহযোগীতায় শহরে চলে আসেন।

বন্দী চারজন কমাণ্ডো আমির হোসেন, নূরুল হক, মোহাম্মদ হোসেন ফরিদ, এবং মাওলা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ফরিদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে একাডেমীর সম্মুখে পাকা রাস্তার ম্যান হোলের ভিতর অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে আচমকা পিছন দিকে চাপদিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলে। ফরিদের সেই দিনের গগণ বিদারী চিৎকার আজও একাডেমীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাতাস ভারী করে রেখেছে। এই অভিযানে আটকে পড়া অপর তিনজন কমাণ্ডোকে নির্মম অত্যাচারের পর আরও তথ্য জানার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় ঢাকা সেনাসিবাসে এবং এর পিছনে অবাঙালি কর্ণেল বেলায়েত এর হাত ছিল। এদের মাঝে আমির হোসেন জানিয়েছেন ঢাকা সেনানিবাসে তাদের বৈদ্যুতিক সর্টসহ বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতন চালায়। পাক সেনাদের ধারণা ছিল এরা ভরতীয় নৌ-বাহিনীর ফ্রগম্যান কিন্তু এই কথাটি স্বীকার না করায় তাঁদের বেশি অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

এরপর তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা দিয়ে সেলে আটকে রাখে। বিচারে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য ছিল। কিন্তু রায় ঘোষণার পূর্বে দেশ শত্রুমুক্ত

হওয়ায়। মাওলা, নূরুল হক, এবং আমির হোসেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। আমির হোসেন বর্তমানে কুয়েত নৌ-বাহিনীতে কর্মরত। স্বাধীনতা উত্তর মাওলা এক বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন। নুরুল হক নিজগ্রামে বসবাস করেন।

চট্টগ্রাম বহ্নিনোঙর অভিযানে অংশ গ্রহণকারী অপর কমাণ্ডোবৃন্দ হলেন – আব্দুর রশিদ, আবু তাহের, আবু বক্কর সিদ্দিক, খুরশিদ আলম, আবু মূসা চৌধুরী, মনোজ দত্ত, সাইদুর রহমান, আবুল হাশেম, এমদাদ হোসেন মতিন ও জয়নাল আবেদীন। অনেক বাঙালি দেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করলেও পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর জুনিয়র অফিসার মোঃ আনোয়ার নৌ-কমাণ্ডোদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। চারজন কমাণ্ডো ধরা পড়ার সাথে সাথে তিনি নাসিরাবাদে কাকলীতে এসে যথাশ্রীঘ্র কমাণ্ডোদের স্থান ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। বাড়ীর মালিক এনায়েত মাওলা–পরিবার সহ এবং এখানে আত্মগোপনকারী সকল কমাণ্ডো মুহূর্তে স্থান বদল করে রক্ষা পান। কিন্তু রক্ষা পাননি অবাঙালি পাকিস্তানী নৌ-অফিসার মোঃ আনোয়ার। পাকিস্তানী গোয়েন্দার কাছে তাঁর কর্মকাণ্ড প্রমাণিত হবার পর তাঁকে মেরে ফেলে একই সাথে কর্ণেল বেলায়েতকেও মেরে ফেলা হয়।



গুপ্তাখালের পুল, যেখানে নৌ কমান্ডোরা বাধাপ্রাপ্ত হন

এম, ভি, এ্যাভলুস আক্রমণ

মুক্তিযুদ্ধের মোট ব্যাপ্তিকাল নয় মাসের মধ্যে নৌ-কমাণ্ডো অপারেশন চলেছে চারমাস পনেরো দিন। আগষ্টের শুরু থেকে বিজয় লাভ পর্যন্ত। কমাণ্ডো গ্রুপের প্রশিক্ষণ ছিল বেশ ঝুকিপূর্ণ, সম্ভবত তাই এই দলের প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘ সময় ধরে চলে। মে মাসের শুরু থেকে জুলাই এর শেষ অবধি। সামগ্রিক নৌ-অভিযানগুলির ধারাক্রম এজন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভাজন করা হয়। কমাণ্ডো দলের প্রথম অপারেশন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করে সারাদেশের নদী ও সমুদ্র বন্দর সমূহে একসাথে একই সময়ে পরিচালিত হয়। এরপর যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে কমাণ্ডোরা অভিযান চালিয়েছেন তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী। ২রা অক্টোবর '৭১ এমনই একটি দুঃসাহসিক ও সফল অভিযান পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম বন্দরে। অভিযানে অংশ নেন মাত্র দু'জন কমাণ্ডো আবু মূসা চৌধুরী ও মনোজ দত্ত। সমন্বয়ক ছিলেন কমাণ্ডো ফারুক ই আজম।

চট্টগ্রাম ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর তৎকালীন টেকনিক্যাল ম্যানেজার প্রকৌশলী আজিজুর রহমান ছিলেন নৌ-কমাণ্ডোদের অন্যতম সহযোগী। তিনি ২রা অক্টোবর খবর নিয়ে আসেন যে, বন্দরে দু'টি জাহাজ আটক অবস্থায় আছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের পতাকা নামিয়ে ফেলাতে কর্তৃপক্ষ জাহাজ দু'টিকে আটক করেছে। ফারুক-ই-আজমকে এই খবর পৌছানোর পর জাহাজ আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে প্রকৌশলী আজিজুর রহমান, তাঁর স্ত্রী ও ফারুক-ই-আযম তিনজনে একটি গাড়ীতে করে বন্দর এলাকা ঘুরে জাহাজের অবস্থান, নিরাপত্তা রক্ষীদের অবস্থান, যাত্রার জন্য সুবিধা জনক রাস্তা, সকল কিছু ভালভাবে প্রত্যক্ষ করে ফিরে এলেন। জাহাজের গা ঘেঁষেই বন্দরের রাস্তা। গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যান ফারুক-ই-আযম নিজে। গোপনতা রক্ষার জন্য কোন চালককে সাথে নেয়া হয়নি।

দ্বিতীয়বার ফারুক-ই-আযম স্থানীয় সংগঠন নূরুল হক ও নূর মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে রেকী করতে গেলেন। তিনজন একটি ট্যাক্সিতে ঘুরলেন বিশেষ -বিশেষ এলাকা। কোন দিক থেকে আক্রমণ করা হবে, আক্রমণের পথে কোথায় কোথায় বাঁধা প্রাপ্ত হতে পারেন। বাঁধাগুলি এড়ানোর সম্ভাব্য উপায় খুঁজে

তিনজন ফিরে এলেন। সারা বন্দরসহ এলাকায় কড়া প্রহরা। প্রতি ব্রীজে পাহারা। যে ব্রীজ পার হয়ে যোদ্ধারা নদীতে যাবেন সেখানেও কড়া প্রহরা। গুপ্তাখাল বেয়ে কমাণ্ডোদের নদীতে নামতে হবে। গুপ্তাখালের উপর ব্রীজ ছাড়া ব্রীজের নীচেও রয়েছে প্রহরী। ফারুক-ই-আযম, কমাণ্ডো আবু মূসা ও মনোজের সাথে কৌশলগত দিক আলোচনার জন্য বৈঠকে বসলেন। কমাণ্ডো দু'জনকে জাহাজের অবস্থানসহ প্রহরীদের অবস্থান, গন্তব্য পথের ম্যাপ এঁকে বিস্তারিত বোঝালেন। এমন প্রতিকূল অবস্থানের কথা জানানোর পরও দু'জন কমাণ্ডোর কোন প্রতিক্রিয়া হলোনা। তাঁরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সকল অবস্থা মাড়িয়েই জাহাজ ধ্বংস করবেন। তাতে যদি জীবন চলে যায় যাবে। কমাণ্ডো দলেতো এই অঙ্গীকার নিয়েই তাঁরা নাম লিখিয়েছেন। সেখানে মৃত্যু ভয়ে অভিযান থেকে বিরত থেকে কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হতে রাজী নন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো গুপ্তাখাল দিয়েই জাহাজ দু'টোকে আক্রমণ করা হবে। মূসা চৌধুরী 'এ্যাভলুস' কে আক্রমণ করবেন আর মনোজ 'মানা' জাহাজে মাইন স্থাপন করবেন। দুটিই গ্রীক পতাকা বাহী জাহাজ। পাকিস্তান বাহিনীর জন্য খাদ্যও সমরাস্ত্র নিয়ে নিরাপদ মনে করে বন্দর সংলগ্ন বয়াতে নোঙর ফেলে খালাসের জন্য অপেক্ষা করছিল।

অপারেশনের পূর্বে দলনেতা ফারুক-ই-আযম কমাণ্ডো দু'জনকে সাথে নিয়ে বিকেলে বন্দর এলাকা শেষ বারের মত ঘুরে দেখলেন। এখান থেকে গেলেন মাদার বাড়ীতে অপর একটি আশ্রয় কেন্দ্রে। রাত নয়টায় তিনজন ট্যাক্সিতে করে রওয়ানা দিলেন, গন্তব্যস্থল পূর্ব কাঠঘরের নুরুদ্দিনের বাড়ী। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন নূরুল হক। মাইনগুলি শহরের কমাণ্ডার লোকমান গনি চৌধুরী ও নূরুল হক একটি অষ্টিন গাড়ীতে মাদার বাড়ী আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। কমাণ্ডার শাহাবউদ্দিন এই মাইন পৌছতে সাহায্য করেছিলেন। শহরের অভ্যন্তরে দখলদার বাহিনীর কড়া নজর এড়িয়ে বেশ বড় আকৃতির এক একটি মাইন বহন যথেষ্ট ঝুকিপূর্ণ ছিল। এগুলো প্রথমে নেয়া হয় নূরুল ইসলাম কনট্রাক্টরের বাড়ীতে। পরে ওখান থেকে নূরুল হকের বাড়ী। চূড়ান্ত পর্যায়ে নেয়া হয় নুরুদ্দিনের বাড়ী। একাজে সহায়তা করেন সেকান্দার, আবুল কালাম, আব্দুল কুদ্দুস।

রাত্রে নুরুদ্দিনের বাড়ী পৌছেই আবু মূসা এবং মনোজ অপারেশনে যাত্রার প্রস্তুতি নেন। ফারুক-ই-আযম মাইনগুলি বেঁধে দেন কমাণ্ডোদের কোমরে গামছা দিয়ে। সুকৌশলে প্রতি যোদ্ধার পেটে দুটি করে মাইন বাঁধা হয়। অন্য একটি

গামছায় একটি পুটলিও একটি ছুরি বেঁধে দিলেন। পলিথিনের পুটুলির মধ্যে একটি লুঙ্গি, জামা ও কিছু টাকা ছিল। সম্পূর্ণ খালি গায়ে, পরনে কেবল জাঙ্গিয়া। সমস্ত শরীর প্রচুর সরিষার তেল মাখা। যাত্রার মুহূর্তে দু'জন একজোড়া করে ফিনস হাতে তুলে নেন।

রাত ১২ টায় ছোট এক খালের পাশে এসে দাঁড়ান যোদ্ধারা। সাথে ফারুক-ই-আযম ও নূরুল হক। পানির কিনারে এসে মূসা ও মনোজ পায়ে ফিনস লাগান। দলনেতার সাথে হাত মেলান। এরপর বিদায় নিয়ে দু'জন পানিতে নামেন। খালি গায়ে গাছের কাটার আচড়ে গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তাতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি লেগে যন্ত্রণায় ফেঁটে যেতে লাগলো। কিন্তু অপারেশনের আবেগ এবং শত্রুকে পরাস্ত করার সংকল্প সকল ব্যথা ভূলিয়ে দেয় কমাণ্ডোদের। এগুতে থাকলেন দুজন। কিছুদূর যেতেই একলোক নদীতে মাছ ধরছিল। সে দেখে ফেলে কমাণ্ডোদের। খালের পার দিয়ে মূসা ও মনোজের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিলেন ফারুক ও নূরুল হক। তাঁরা অতি দ্রুত লোকটিকে ধরে পাশে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখেন। মুখ বন্ধ করে দেন কাপড় দিয়ে যাতে চিৎকার করতে না পারে। এত রাতে লোকটিকে ছেড়ে দিলে কোন ভাবে তথ্য ফাঁস হলে অপারেশন ব্যর্থ হতে পারে তাই তাকে আটকে রাখা। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকেন দু নৌ-কমাণ্ডো। দলনেতার ইশারায় পুনরায় যাত্রা শুরু করেন।

কিছুদূর গিয়ে কালভার্ট। কালভার্টের নীচ দিয়ে খাল অত্যন্ত সরু। কোনমতে একজন করে পার হওয়া যায়। কালভার্টের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক পাহারাদার। দূর থেকে লক্ষ্য করেন নৌ-কমাণ্ডোদ্বয়। অত্যন্ত সন্তর্পনে পার হন তাঁরা। একজন একজন করে।

নদীর পারে এসে জাহাজ দু'টোর অবস্থান পুনরায় দেখেন। ডানে Avlouse, ভার্টিতে। বায়ে Mana, মূসা চৌধুরী দায়িত্ব নিলেন Avlouse, এ মাইন লাগানোর। মনোজ Mana'র।

Avlouse ভার্টিতে। ভাটা শুরু হয়েছে মুসা চৌধুরী কয়েক মিনিটে পৌছে যান জাহাজের কাছে। জাহাজের কাছে নদীর পার ঘেঁষে যেপার, সে পারে। পাহারাদারদের একজন দেখে ফেলে। চিৎকার দেয় সে। সতর্ক হয়ে যায় পাক সেনারা। Avlouse, এর যে দিক রাস্তার দিকে সে দিকে ছুটে যায় তারা।

অনবরত গুলি ছুড়তে থাকে। পাহারাদারের চিৎকার শুনে মূহুর্তেই মূসা ডুব দেন। সোজা জাহাজের অপর দিকে। পাক নৌ-সেনারা তখনও তাঁকে খুজছে রাস্তার পাশ ঘেঁসে। নদীতে বা পাড়ে।

মূসা চৌধুরী গামছা হতে মাইন দুটি খুলে অতি ক্ষীপ্রতার সাথে জাহাজের গায়ে পরিষ্কার করা অংশে লাগিয়ে দেন। এরপর মাইনের প্লাগের মুখের রাবার ক্যাপ খুলে দিয়ে সাঁতরিয়ে দূরে চলে যান। মনোজ Mana জাহাজের দিকে যেতে তীব্র স্রোতের সম্মুখীন হলেন। ৩/৪ মিনিটে মাত্র কয়েক গজ যেতে পারলেন। এরই মাঝে খালের অপর পারে তীব্র গোলাগুলির শব্দ এল। চার্স লাইটে এ্যাভলুসের একদিক দেখা যাচ্ছে। অপরদিক নিরাপদ। একডুবে মনোজ "Avlouse" এর কাছে চলে এলেন। একই পদ্ধতিতে মাইন লাগিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন। কারণ তাঁর সময় আরো কম। ধারণা করলেন মূসার মাইন যদি লাগানো হয়ে থাকে তবে তাঁকে আধা-ঘন্টায় পৌছতে হবে ওপারের আশ্রয়ে। প্রাণপণ দ্রুত সাঁতরাতে লাগলেন মনোজ। ৪টি মাইনে Avlouse সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। এরপর ও একের পর এক অভিযানে অংশ নেন দুঃসাহসি কমাণ্ডোবৃন্দ। অতঃপর পত্রিকায় ফলাও ভাবে প্রকাশিত হয়, "Guerilla activities have completely blocked at approach of the chittagong Port at Present. It is reported that Lt. General Tikka khan Came to chittagong personally next day to assess the damage. Some senior Naval officers in charge of the chittagong Port and all the sentries on duty at the port had been arrested following the success of the guerilla fighters." পানির অভ্যন্তরে মাইনের প্রচণ্ড বিষ্ফোরণে ভাইব্রেশনে মূসা চৌধুরীর মস্তিষ্কে (ব্রেনে) ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেদিন যুদ্ধের উম্মাদনায় উম্মত্ত যুবক টের না পেলেও পরিণত বয়সে এই ক্ষত একসময় কাল ব্যাধিতে পরিণত হয়। মূসা চৌধুরীর বেদনা তাঁর বীরত্বের পুরষ্কার তাঁকে দেয়া হয়নি। এমন বেদনা এবং অভিযোগ অনেক কমাণ্ডোর মাঝেই বিরাজ করছে।

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলিতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং চলাফেরা সম্ভব ছিলনা। সেজন্য নৌ-কমাণ্ডোদের যুদ্ধে অংশ নিতে শহরেই অবস্থান করতে হতো। বন্দরের বিপরীত তীরে গ্রামে কমাণ্ডোদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ছিলনা। যেহেতু সেখানে মুক্তিযোদ্ধার কোন ঘাটি তৈরী সম্ভব হয়নি। পাক বাহিনীর

অত্যাচার এবং বিপদকে তুচ্ছ ভেবে দেশের স্বাধীনতার একাগ্র আকাংখা নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে কমাণ্ডোদের আশ্রয় ও সার্বিক সহযোগীতা করেছিলেন তাঁদের মাঝে অন্যতম এনায়েত মাওলা (তাঁর বাসভবনের নাম 'কাকলী'), পি,ডব্লিউ,ডি-এর প্রকৌশলী আবুল বাশার, অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী মৌলভী সৈয়দ, নুর মহম্মদ, আব্দুল্লাহ আল হারুন, ওয়াপদার আলতাফ হোসেন, কমিশনার জালাল, নূর আহম্মদ, জানে আলম (তিনি গাড়ীকে বরের গাড়ী সাজিয়ে তাতে মাইন নিয়ে সমিতির হাট থেকে শহরে নিয়ে আসেন),একাজে সাহায্য করেন এনায়েত মাওলা এবং তাঁর স্ত্রী, আলতাফ হোসেনের স্ত্রী, আবু তাহের, ডঃ আজিজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী, আমির হোসেন, এডঃ শাহাবুদ্দিন, নূরুল হুদা, বদি, জাহাঙ্গীর, জহিরুল ইমান চৌধুরী, মুহাম্মদ মূছা, আবু সাইদ সরদার, মোঃ হারিস, আব্দুর রহমান, মাসুক, ডাঃ আইয়ুব আলী, আবেদীন, কালামিয়া, ইউনূস, আবুল কমাণ্ডার, মোল্লা, শামসু প্রমুখ।

নদীর অপরপারে আশ্রয় ও সহযোগীতা করেছিলেন চরলক্ষ্যার মোঃ ইউনূস। তিনি তার খামার বাড়ীতে কমাণ্ডোদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কালামিয়া সওদাগরের বাড়ী, পটিয়ার চরফরিদ এর ইব্রাহিম সওদাগরের বাড়ী। পথ প্রদর্শক ও বিভিন্ন ধরণের সহযোগীতা করতেন ক্যাপ্টেন করিম ও তার দলের কামাল চৌধুরী, আজিজ, এম,এন,ইসলাম, কামাল, আবু তাহের, ইউনুস, গোলাপ। নূর আহমদের ছেলে ইদ্রিসকে পাক বাহিনী, কমাণ্ডোদের সহযোগী সন্দেহে নির্মমভাবে হত্যা করে।

শহরের বাইরে দক্ষিণাঞ্চলে সীতাকুণ্ডু থানার ফৌজদার হাটের নুরুল আলম, বশির মাষ্টার, বজলুর রহমান, জানেআলম কমাণ্ডোদের সহযোগী হিসেবে সাহায্য করতেন। শুভপুর থেকে সাম্পানে মাইনগুলি বয়ে আনতেন নূর আহম্মদ। ফয়েজ আহম্মদ, কাশেম বলির বাড়ীতে প্রথমে এগুলি লুকিয়ে রাখতেন। সেখান থেকে দাউদ ও লোকমান গাড়ীর পিছনে লুকিয়ে শহরে চকবাজারে কবির সওদাগরের বাড়ীতে (বর্তমানে দুবাই থাকেন) পৌঁছে দিতেন।

শহরে আশ্রয় এবং যোগাযোগের জন্য বিশেষ অবদান রাখেন কমাণ্ডো খোরশেদ আলম, আবু তাহের, আবু বক্কর সিদ্দিক, ফারুক-ই-আযম, ডাঃ শাহ আলম, আবু মূসা চৌধুরী, এমদাদ হোসেন মতিন, প্রমুখ স্থানীয় কমাণ্ডোবৃন্দ।

কার্গো জাহাজ ধ্বংস

১২ সেপ্টেম্বর বহ্নিনোঙ্গর অপারেশনে কয়েকজন কমাণ্ডো ধরা পড়ার পর চট্টগ্রামে নৌ-অভিযান পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ এখানে জাহাজগুলি অবস্থান করতো সীমিত জলসীমার মাঝে। কিন্তু দেশের অন্যান্য এলাকায় জাহাজ অথবা জলযানগুলি বিস্তীর্ণ জলসীমায় চলাফেরা অথবা অবস্থান করতো। নৌ-কমাণ্ডোদের বিচরণও সেখানে সহজ ছিল প্রবেশের রাস্তা ছিল একাধিক। চট্টগ্রাম এর ব্যতিক্রম। এরমাঝে ৩রা অক্টোবর রাত দশটায় সল্টগোলা খাল দিয়ে একটা দুঃসাহসিক অভিযান সফল করেন কমাণ্ডোরা। অভিযানে অংশ নেন মাত্র দুজন কমাণ্ডো সাইদুর রহমান মন্নু ও আবু তাহের। রাত ১০ টায় ঈশান মিস্ত্রীর হাটের পাশে কালু সওদাগরের বাড়ী হতে যোদ্ধারা প্রস্তুতি নিয়ে খালে নামেন। তখন খালে জোয়ারের পানি ঢুকতে শুরু করেছে। এখানে একজন জেলে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। স্থানীয় কমাণ্ডো ও এই অভিযানের পরিকল্পনাকারী আবু তাহের জেলেকে বুঝিয়ে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। অপর কমাণ্ডো মন্নু মাদারীপুরের অধিবাসী ('যুদ্ধোত্তর সময়ে সে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এবং মন্ত্রী জহুর আহ্‌মদ চৌধুরীর কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন')। দুজন কমাণ্ডো খালের পাড়ে ঝোপের আড়াল দিয়ে খালের মুখে যেয়ে পৌঁছেন। খালের মুখেই অবস্থান করছিল একটি কার্গো জাহাজ আর একটি পল্টুন। দু'জন কমাণ্ডো দু'টি টার্গেটে নির্বিঘ্নে পৌছে চারটি মাইন লাগিয়ে সরে পড়েন। পরিকল্পনা অনুযায়ী মাইন স্থাপন করে তাদের খালের অপর পাড়ে চলে যাওয়ার কথা থাকলেও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে তাহের পুনরায় গুপ্তা খালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকেন। পাক বাহিনী তাকে দেখতে পেয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ধাওয়া করে। কিন্তু তাহের একডুবে তড়িৎ বেগে বহুদূরে পৌঁছে নাক ভাসিয়ে সাঁতরে নদীর অপর তীরে চলে যান। কিন্তু পাক বাহিনী আর এক জেলেকে যোদ্ধা মনেকরে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। সহযোগী যোদ্ধারা অসংখ্য গুলির শব্দে কমাণ্ডোদের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটেছে মনে করলো। কিন্তু অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁরা উভয়ে শহরের গোপন ঘাটিতে ফিরে আসেন। চারটি মাইনের বিস্ফোরণে দুটি টার্গেট গভীর

পানির নীচে তলিয়ে যায়। এ অভিযানে সহযোগীতা করেন এনায়েত মাওলা ও মিসেস মাওলা, ডাঃ আজিজুর রহমান, বাবুল, বাকি, হাকিম, কমাণ্ডার লোকমান, রহমান ও শাহাবুদ্দিন। নভেম্বর মাসে "বাংলাদেশ" পত্রিকা লেখে, নেভাল কমাণ্ডোর প্রচন্ড আঘাত অপ্রতিহত রয়েছে। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে জল জাহাজগুলো ধ্বংস হওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দর রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করে। পাক বাহিনীর সতর্কতা সত্ত্বেও গেরিলারা সাফল্যের সাথে গ্রীক জাহাজ "বার্মা জাদে" ডুবিয়ে দিয়েছে। ঢাকা থেকে এ,পি,পি'র রিপোর্টে প্রকাশ, চট্টগ্রাম বন্দরে উপর্যুপরি বিষ্ফোরণে নভেম্বরের ৩ তারিখে পাকিস্তানী তৈলবাহী জাহাজ "মাহতাব জাভেদ" ধ্বংস হয় ও ডুবে যায়।"

এম,ভি নাসিম ধ্বংস

৮ অক্টোবর এম,ভি নাসিম নামের আরও একটি পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়ে দেন। অভিযানে অংশ নেন কমাণ্ডো সেলিম ও মনু। এখানে পাকিস্তান বাহিনীর ২ জন নিরিহ্ নাগরিক মারা যায়। An A.P. report from Dacca says that, " .... some berths of the chittagong port are now completely out of the commission. These Naval actions have Produced a far reaching effect in so far as these to the inhancement of insurance rates in the London Insurence market for charges sailing to and from Bangladesh." এরপর চট্টগ্রাম বন্দরে আর কোন অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম বন্দরে অভিযানে রত ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন দুঃসাহসী কমাণ্ডোকে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর অভিযানে অংশ নিতে পাঠানো হয়। যাদের মাঝে ছিলেন আবু মুসা চৌধুরী, মনোজ দত্ত, আবুল ও আবু তাহের অন্যতম। মিত্র বাহিনীর জেনারেল জ্যাকব ও ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং ঢাকা অবরুদ্ধ করার জন্য শীতলক্ষা ও ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে কাচপুর ফেরীঘাট' অচল করার জন্য তাদের নির্দেশ দেন। কমাণ্ডো মনোজ এবং মূসা এই তথ্য জানান।

সন্দ্বীপ নৌ-অভিযান

নৌ-কমাণ্ডোদের একটি দল সন্দ্বীপে একটি পাকিস্তানী নৌ-যান মাইন লাগিয়ে ডুবিয়ে দেন। এ দলটির নেতৃত্ব দেন কমাণ্ডো অনীল বরণ রায়। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে সন্দ্বীপে নৌ-কমাণ্ডো অভিযান শুরু হয়। এখানে নৌ-কমাণ্ডোরা জাহাজের সকল বয়া এক্সপ্লোসিভ দিয়ে কেটে ভাসিয়ে দেন। বর্ণনায় এই কাজ ক্ষুদ্র মনে হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে অভিযান ছিল পূর্বের ন্যায় ভয়াবহ এবং দুঃসাহসিক। কারণ তখন পুরা দেশ দখলদার বাহিনীর কবলে এবং সমুদ্রের মাঝে সাঁতরিয়ে গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত বয়াতে বিষ্ফোরণ ঘটাতে হয়েছে।

চট্টগ্রামে নৌ-কমাণ্ডো অভিযান সফল করতে সহযোগীতা করেছেন বহু স্বাধীনতাকামী নাগরিক যাদের সহযোগীতা না পেলে নৌ-অভিযান পরিচালনা সম্ভব ছিল না। মুক্তিমুদ্ধের ইতিহাসে তাঁদের অবদানের কথা সমান গৌরবজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার বুক অব ইনফরমেশন ১৯৭৩

৭১'এ যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ২১টি বড় জাহাজের নামের উল্লেখ আছে। সেগুলো হল ঃ (১) আনিস বক্স, (২) কর্ণফুলি, (৩) আল আব্বাস, (৪) মেরিন একাডেমী বোট, (৫) যশোর, (৬) নেভাল ক্রফ্টি, (৭) রাঙ্গামাটি, (৮) সোনার তরী, (৯) রশিদ, (১০) ইসো আর্ক, (১১) মাহতাব জাভেদ, (১২) দুলাল, (১৩) এভলুস, (১৪) নেভাল ক্রফ্টি-২, (১৫) সুরমা, (১৬) সোলায়মান, (১৭) ফ্লোটিলা ওয়ার্কশপ বেজ, (১৮) জলদেকা, (১৯) বেটি বার্জ-১০, (২০) বার্জ + ৯, (২১) বার্জ।

চট্টগ্রাম নৌ-অভিযানে বিদেশীদের ভূমিকা

যুদ্ধে বিজয় অর্জন এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য শত্রু পক্ষের অবস্থান, শক্তি, যুদ্ধাস্ত্রের বিবরণ, গতি-বিধি বিবিধ বিষযে জ্ঞাত হওয়া অপরিহার্য। আর এজন্যই সশস্ত্র বাহিনীতে গোয়েন্দা বৃত্তির প্রচলন শুরু থেকে।

একাজে বিরুদ্ধ পক্ষের ভিতর থেকে লোক বেছে নেয়া হয় অথবা নিজেদের বিশ্বস্ত ও সাহসী ব্যক্তিকে শত্রু পক্ষের যোদ্ধাদের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আদর্শের বৈপরিত্তের কারণে কখনও কখনও আত্মপক্ষের অবস্থান বিপক্ষ দলের কাছেও জানিয়ে দেয়। বৃহৎ অর্থের বিনিময়ে তথ্য খরিদ পৃথিবী ব্যাপি প্রচলিত। তদ্রুপ ভাবে এই ঝুকিপূর্ণ কাজে শাস্তি কৃতকর্মের উপর নির্ভর করে। চাকুরী চ্যুতি, জেল-জুলুম থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। পৃথিবী ব্যাপি এই গোয়েন্দা বৃত্তির উদাহরণ ভুরি-ভুরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে সেবিকা হিসেবে ইসরাইলী সুন্দরী মহিলারা এই দায়িত্ব পালনে সবচেয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উভয় পক্ষে এই কাজে লোক নিয়োজিত করা হয়। অনেক বাঙালি স্থান পরিবর্তন না করে ও মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ও অনুপ্রবেশকারী ছিল। বাঙালি হওয়ার সুবাদে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করলেও পরবর্তী কোন এক সময়ে তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। যুদ্ধ সময়ে ধরা পড়ে অনেকে কারান্তরীত হয়েছিল। ঐক্যে ফাটল ধরতে পারে এই কারণ জানার পরও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি এমনকি যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত করতে তারা কার্পন্য করেনি। নৌ-কমাণ্ডোদের মাঝে একটি গ্রুপ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চিন্তা করতো। যাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্বদের যোগাযোগছিল বলে জানা যায়। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে ভুমিকা না রাখলেও বীরত্ব সূচক খেতাব তারা পেয়েছেন। গ্রুপটির ভূমিকা ব্যাপক না হওয়ায় তা প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রুপে অর্ন্তভূক্তির জন্য কমাণ্ডো বিধান চন্দ্র বিশ্বাসকে প্রস্তাব করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বীয়স্বার্থ এবং নেতৃত্বের মোহে বিশ্বাস ঘাতকদের অভ্যুদয় হয়েছিল। কিন্তু এর ব্যতিক্রম নজির স্থাপন করে একজন অবাঙালি নৌ কর্মকর্তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি অবাঙালি কর্ণেল বেলায়েত। '৭১ সালে চট্টগ্রাম নৌ-বাহিনীতে কর্মরত থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি প্রথম থেকেই বাঙালিদের দাবি ও সংগ্রামের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। গোপনে মুক্তিযোদ্ধা ও বেসামরিক বাঙালিদের সাহায্য করতেন। চট্টগ্রামের অধিবাসিদের

গণহত্যার হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। আগস্টে নৌ-অভিযান পরিচালনায় তাঁর দেয়া গোপন তথ্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তিনি নৌ-বাহিনীতে কর্মরত কয়েকজন বাঙালির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তথ্য পাচার করতেন। তাদের মাঝে, 'পি,এন,এস বখতেয়ার' এ কর্মরত ভাণ্ডার রক্ষক মিরশ্বরাই এর আব্দুর রহমান। ডিপার্টমেন্টের মালামাল খরিদ করতে শহরে যেয়ে তিনি নৌ-বাহিনীর অবস্থান ও পরিকল্পনার কথা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌছে দিতেন। তাদের সতর্কীকরণের ফলে 'কাকলী'তে অবস্থানকারী নৌ-কমাণ্ডোরা নিশ্চিত ধরা পড়ার হাত হতে রক্ষা পান। আসকর দিঘীর পাড়ে ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ও তার সাথীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। আরও সহযোগিতা করেছিলেন নৌ-ভাণ্ডারের সুপারইনটেনডেন্ট হুমায়ূন কবির (বাঙালি), মোশারফ হোসেন (বাঙালি), বন্দর থানার আব্দুল কাদের (বাঙালি) এদের সহযোগিতায় ১২ সেপ্টেম্বর ধরা পড়েও তিনজন কমাণ্ডো জীবনে রক্ষা পান। কৌশলে তাদের জেলে পাঠানো সম্ভব হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে আব্দুর রহমান জানান, মাইন সহ তিনজন কমাণ্ডো ধরা পড়ার পর স্বাভাবিকভাবে তাদের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য আমরা এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনজন রাজাকারকে নৌ-কমাণ্ডো বানিয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশের কাগজ তৈরী করে কমাণ্ডিং অফিসারের সামনে দাখিল করি। ফাইল তার সামনে রেখে বাঙালি অফিসারটি কমাণ্ডিং অফিসারের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। এর ফাঁকে তাঁর সামনে আরও অনেক ফাইল হাজির করা হয় তার স্বাক্ষরের জন্য। এই গল্পের মাঝেই তিনি নৌ-কমাণ্ডোদের জেলে পাঠানোর কাগজ এবং তিনজন রাজাকারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ ও স্বাক্ষর করে নেন।"এভাবে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন তিনজন কমাণ্ডোকে কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি পাকিস্তানী গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়েন। এবং কর্ণেল বেলায়েতকে যশোর সেনাসিবাসে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী সাব্যস্ত করে গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও কার্যকর করা হয়। এই অবাঙালি মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল বেলায়েতকে শহীদের মর্যাদা প্রদান করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার দাবি চট্টগ্রামবাসী এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধা

ও সংগঠকের। কর্ণেল বেলায়েতের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের কথা আজও অনেকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

মেজর রফিকুল ইসলাম, বীরোত্তম, অপর একজন অবাঙালি কর্মকর্তার কথা জানান, যিনি এখনও পাকিস্তানে চাকুরীরত (নিরাপত্তার জন্য তার নাম প্রকাশ করেননি)। তার স্ত্রী ছিলেন বাঙালি এবং স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তিনি বলেন, তার স্ত্রী এবং পরিবারের নিরাপত্তা দেয়া হবে এই সত্ত্বে তিনি চট্টগ্রামের সেনা ও নৌ-বাহিনীর পরিকল্পনার কথা স্ত্রীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। মেজর রফিকের কথায় বোঝা যায় উক্ত অবাঙালি সেনা অফিসার বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন না করলেও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য তিনি এই গুপ্তবৃত্তি করতেন। কর্ণেল বেলায়েত ও নাম নাজানা সেই কর্মকর্তার সহযোগীতার মাঝে আদর্শগত পার্থক্য আছে, যদিও উভয়ের দেয়া তথ্য মক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।



প্রকৌশলী আজিজুর রহমান

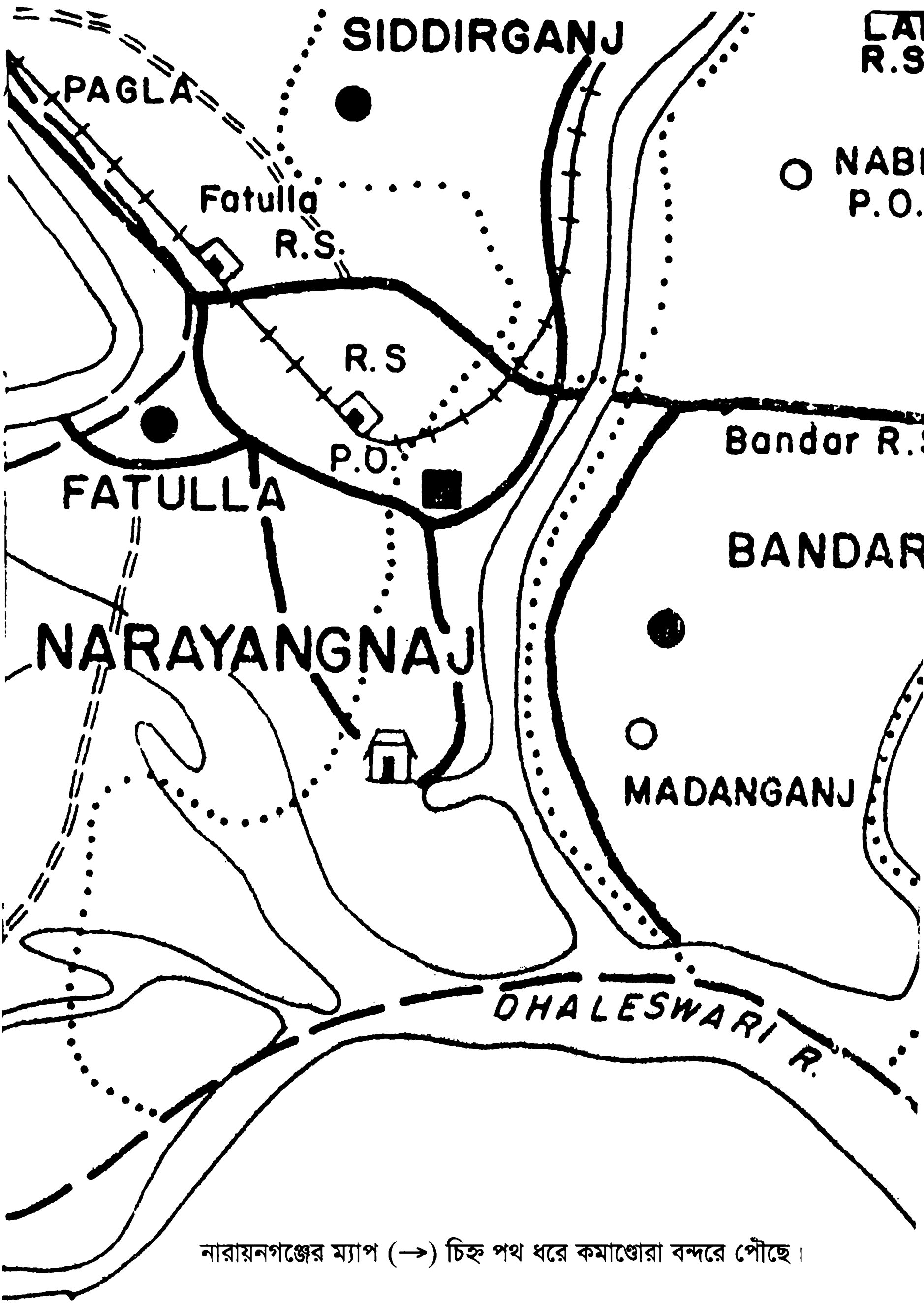


জানে আলম

প্রকৌশলী আজিজুর রহমান, মোঃ জানে আলম উভয়ে চট্টগ্রাম নৌ-কমাণ্ডো অভিযানে সহযোগী যোদ্ধা ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর আক্রমণ

আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে সাবমেরিনার আবেদুর রহমান এর নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল আগরতলা হয়ে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা নদী বন্দরে অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়। ময়নামতি সেনানিবাস এর সন্নিকট দিয়ে প্রধান সড়ক অতিক্রম করে, শত্রুরমাঝখান দিয়েই বিপদকে উপেক্ষা করে এই কমাণ্ডো দল নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে। সঙ্গে থাকে অন্যান্য দল এর মতো মাইন, ফিন্‌স, ড্যাগার, ষ্টেনগান, গ্রেনেড শুকনা খাবার রেডিও পথ প্রদর্শকের জন্য গাইড। ১১ই আগষ্ট এই দল নারায়ণগঞ্জের কাছাকাছি বন্দর থানায় এক আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য দলনেতার নির্দেশের অপেক্ষায় সকল কমাণ্ডো উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তারা দিনের বেলা গোপনে (রেকী করে) নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকা ঘুরে ৪টি নৌ-যানকে টার্গেটি হিসাবে নির্ধারণ করেন। ১৫ই আগষ্ট কলকাতা বেতার থেকে একইভাবে সাংকেতিক গানের মাধ্যমে নির্দেশ পাবার সাথে সাথে দলনেতার নির্দেশে প্রতিগ্রুপে ৩জন কমাণ্ডো ভাগ হয়ে ৪টা গ্রুপে তৈরী হন। দলনেতা আবেদুর রহমান নির্ধারণ করে দেন কোন গ্রুপ কোন টার্গেটে মাইন লাগাবে। মধ্যরাতের পর নারায়ণগঞ্জের পূর্বপারে সোনাকান্দা গ্রামের মাঝদিয়ে দলটি নদীর পাড়ে এসে পৌছায়, যেখান থেকে মাত্র ৩০০ গজ দক্ষিণে মিলিটারী চেকপোষ্টে আর ২৫০ গজ উত্তরে একটা মিলের ভিতরেও মিলিটারীদের অস্থায়ী ঘাটি। এরই মাঝদিয়ে তাদের নদীতে নামতে হবে পাকা রাস্তা অতিক্রম করে। রাস্তার পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ দোকান, আর এখানে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে রাজাকারদের একজন। নৌ-কমাণ্ডো দলটির অবস্থানের ঠিক উল্টা দিকে দাঁড়িয়ে সে সরবে চিৎকার করে তার সহযোগীদের কাছে নিজের অবস্থানের কথা ব্যক্ত করছে। অনেকক্ষণ যাবত রাজাকারটি এই স্থান ত্যাগ না করায় দলনেতা আবেদুর রহমান রাজাকারটিকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রলিং করে রাস্তা পার হয়ে তার নিকটবর্তী অবস্থানে পৌছে যান। এই সময় রাজাকারটি সিগারেট জ্বালানোর জন্য রাইফেলটি নিজের কোলের মধ্যে রেখে ম্যাচ বাকস্ থেকে কাঠি বেরকরে আগুনজ্বালে। এই সুযোগে আবেদুর রহমান দু'লাফে রাজাকারটির



নারায়নগঞ্জের ম্যাপ (→) চিহ্ন পথ ধরে কমাণ্ডোরা বন্দরে পৌছে।

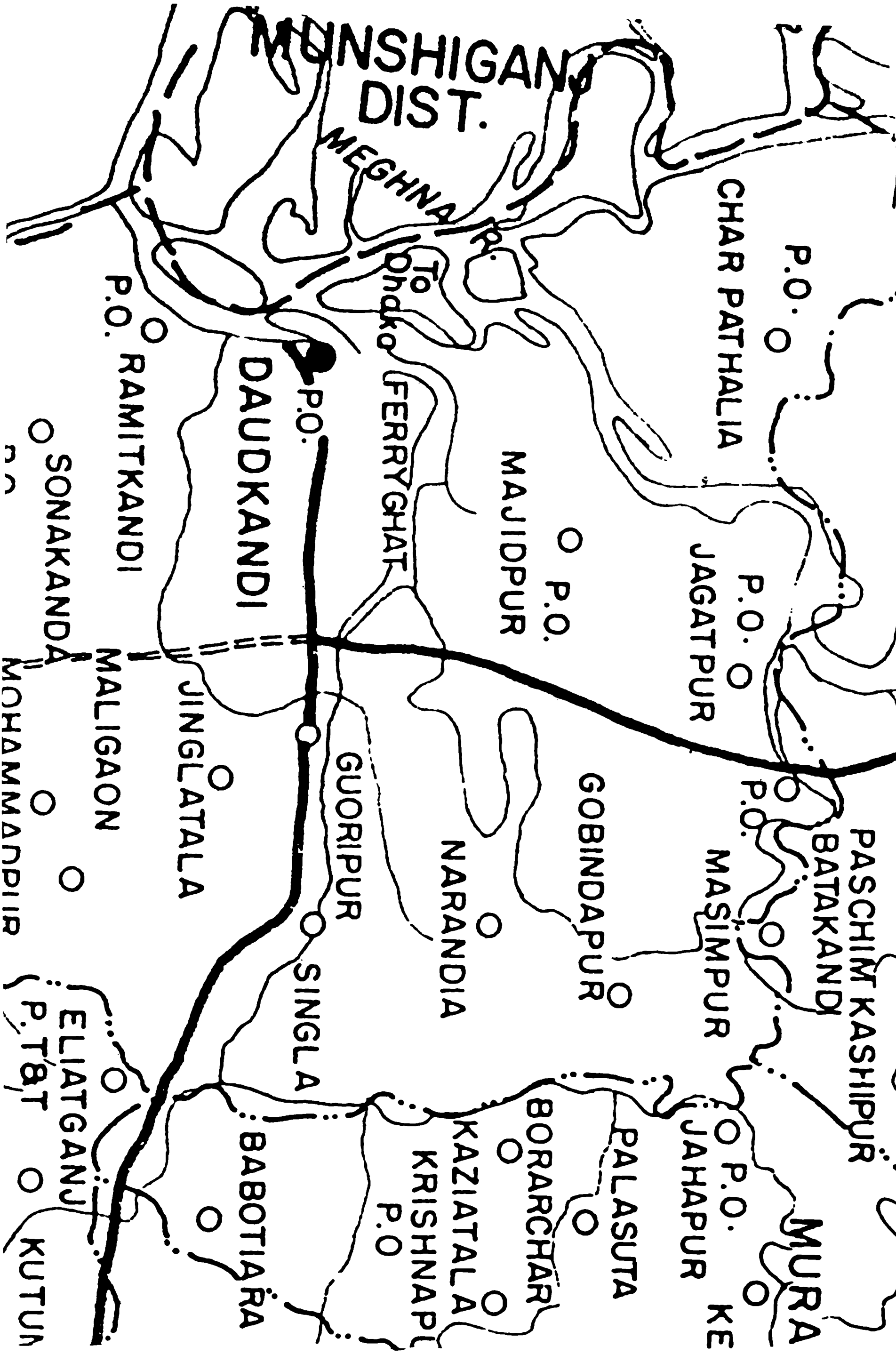
সামনে পৌছে ছুরি হাতে রাজাকার থেকে রাইফেলটি কেড়ে নেন, তখন অন্য দুজন কমাণ্ডো ষ্টেনগানসহ রাজাকারের নিকট পৌছে যান। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কেঁদে ফেলে এবং তাকে প্রাণে না মারার জন্য মিনতি জানায়। কমাণ্ডো গ্রুপ তার রাইফেলের সকল গুলি নদীতে ফেলে দিয়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে আগের মতো চিৎকার করতে নির্দেশ দেয়। সেও প্রাণের ভয়ে তাই করতে থাকে। ইত্যবসরে কমাণ্ডো দল পানিতে নেমে মাইনসহ সাঁতরে নির্দিষ্ট টার্গেটে এগুতে থাকেন। তখন রাত ১২-৩০ মিঃ। টার্গেটে পৌছে কোমর থেকে ছুরি খুলে জাহাজের গায়ে শেওলা পরিস্কার করে দ্বিতীয় ডুবে মাইন লাগায়ে সুইচের মুখের রাবার ক্যাপটি খুলে নিয়ে সকল কমাণ্ডো সাঁতরে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। এখানে কমাণ্ডোরা পানিতে থাকতেই মাইন ফাঁটা শুরু হয়। ৪টি নৌ-যানই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে পানিতে ডুবে যায়। কমাণ্ডোদল আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেন অভিযানের সফলতায়। পরের দিন কমাণ্ডোরা পুনরায় ভারত ফিরে যান। এ কমাণ্ডো অপারেশনে অংশ নেন আব্দুর রহিম, হেদায়েতউল্লা, আনোয়ার, বশির আহমদ সহ ১১ জন কমাণ্ডো। অন্যদের নাম উদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে তথ্য সংগ্রহে জানা গেছে অভিযানের পরের দিন মদনগঞ্জ যে বাড়ীতে কমাণ্ডোদল আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের ১২ বৎসরের ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে, কমাণ্ডোদের সন্ধান জানতে। কমাণ্ডোরা তখনও অদূরে বিলের মধ্যে উঁচু কঁচুরি পানার মাঝে লুকিয়েছিলেন। ভাইকে হত্যার পরও সেই বাড়ীর কলেজ পড়ুয়া মেয়ে কমাণ্ডোদের অবস্থান শত্রুদের জানাননি, ফলে তাকে জীবনের সর্বস্ব হারাতে হয়েছে। তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে ভারাক্রান্ত গলায় বলেছিলেন আমার এক ভাইকে হারিয়ে দশটি ভাইয়ের জীবনতো রক্ষা পেলো।

(তথ্য সরবরাহ; আবেদুর রহমান বীর বিক্রম, কমাণ্ডো মোঃ আঃ রহিম)

দাউদ কান্দি ফেরিঘাট আক্রমণ

৯জনের একটি দলকে দাউদকান্দি ফেরীঘাটে পাঠানো হয় কমাণ্ডো শাহজাহান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে (এখন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক)। এখানে ফেরীযান ডোবানোর জন্য আগষ্ট মাসের ১১/১২ তারিখ নৌ-কমাণ্ডো গ্রুপটি ভরতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ঐদিন সন্ধ্যার পর কুমিল্লার কংশনগর থেকে পূর্বদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রাক তাদেরকে নামিয়ে দেয়। ওখান থেকে কিছু পথ হেঁটে, কিছু পথ নৌকায় চেপে একসময় দাউদকান্দির বন্ধরামপুর গ্রামে পৌঁছেন। বন্ধরামপুরের পীর সাহেব আল্লামা শাহ কামাল সাহেব তাদেরকে তাঁর বাড়ীর অন্দর মহলে থাকতে দেন এবং ওটাই ছিল কমাণ্ডোদের অস্থায়ী ঘাঁটি। কমাণ্ডোদের সাথে ছিল ১টা ষ্টেনগান ও ১টা ট্রানজিসটার। তাছাড়া, প্রত্যেকের জন্য ১টি করে লিমপেট মাইন ও ১জোড়া ফিন্‌স ও ১টি করে নাইফ। রেডিও থেকে গানের মাধ্যমে সিগন্যাল পেয়ে তাঁরা ১৫ আগষ্ট '৭১ তারিখ সন্ধ্যার পর অপারেশনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তার আগের দিন শাহজাহান সিদ্দিকী অপারেশনস্থল রেকী করেন। তাঁর সাথে ছিল কমাণ্ডো গ্রুপের ডেপুটি লিডার মতিউর রহমান। একটি ছইওয়ালা নৌকায় করে দাউদকান্দি ফেরিঘাটের উত্তর দিকে নদীতে নৌকা চালূ অবস্থায় রেখে গামছা পরে নদীতে নেমে নদীর স্রোতের বেগ এবং গতি পরখ করেন। তাদেরকে দেখে হয়তো পাক সেনারা মনে করেছিল তারা এমনিতেই নদীতে গোসল করার জন্য নেমেছে। তাই তারা কোন প্রকার সন্দেহ করেনি। এভাবে ফেরিঘাট এবং ফেরির অবস্থান ও আকার সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করেন। যেহেতু দাউদকান্দি ফেরিঘাট থেকে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত পুর্ব-পশ্চিমে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সেহেতু দলনেতা সিদ্ধান্ত নেন যে, অপারেশনের পর তাদেরকে (নৌ-কমাণ্ডো) সদর দপ্তর থেকে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কমাণ্ডোদের নিয়ে স্রোতের অনুকুলে সাঁতার কেটে ভাটির দিকে যেয়ে আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে উত্তর দিকে রক্ষিত নৌকায় ফিরে আসতে হবে।

রেডিওর গানের মাধ্যমে সিগন্যাল পাওয়ার পর, ১৫ আগষ্ট '৭১ দিবাগত রাতে অভিযান চালাতে হবে। সিগন্যাল পাওয়ার সাথে সাথে এই দল



দাউদকান্দী এলাকার ম্যাপ (→) কমাণ্ডোদের যাত্রাপথ

অপারেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু নয়জন কমাণ্ডোর মধ্যে পাবনা জেলার বাসিন্দা হাসান নূর (বর্তমানে সোনালী ব্যাংক, পাবনার কর্মকর্তা) আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন বলে দাউদকান্দি এলাকায় তাকে নিয়ে চলাফেরা বিপদজ্জনক বিধায় তাকে অপারেশন থেকে বিরত রাখা হয়।

এ অপারেশনে গাইড হিসেবে ২নং সেক্টরের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দার, আবুল কাশেম এবং আব্দুল মান্নান নামে দুইজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়োজিত করেছিলেন। অপারেশনের জন্য ধার্যকৃত দিন অর্থাৎ ১৫ আগষ্ট '৭১ তারিখ রাতের বেলা প্রচুর ঝড় বৃষ্টির মধ্যে খোলা নৌকায় করে যাবার সময় পথিমধ্যে গাইড আবুল কাশেম অসুস্থ্য হয়ে পড়ে এবং দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। অসুস্থতার অজুহাতে সে নৌকা থেকে অন্যত্র চলে যেতে চায়। এতে এক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারণ, আবুল কাশেমকে পথিমধ্যে কোথাও রেখে অপারেশনে গেলে পুরো অপারেশনটিই বানচাল হওয়াসহ সবাই শত্রুদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা দেখা দিতে পারতো। তখন দলনেতার সামনে মাত্র দুইটি বিকল্প ছিল। এক, সকল কমাণ্ডোদের নিরাপত্তা বিধান করাসহ অপারেশনের স্বার্থে গাইড আবুল কাশেমকে হত্যা করে অপারেশনে যাওয়া। অপরটি, অপারেশন ঐদিনকার মত স্থগিত রাখা। কারণ গাইড আবুল কাশেমকে জীবিত অবস্থায় মাঝপথে রেখে অপারেশন করা খুবই ঝুকিপূর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় অন্যান্য সাথী কমাণ্ডোদের সাথে আলোচনাক্রমে তারা ১৫ আগষ্ট '৭১ তারিখের স্থগিত রেখে ১৬ আগষ্ট তারিখ অপারেশন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৬ আগষ্ট '৭১ সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া শেষ করে সমস্ত শরীরে প্রচুর সরিষার তেল মেখে সুইমিং কাষ্টিউম পরে একটি ছইওয়ালা নৌকাযোগে আমন ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কমাণ্ডোদল বন্ধরামপুর থেকে প্রায় পাঁচমাইল দূরবর্তী দাউদকান্দির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সাথে আরও একটি ছোট কোষা নৌকা নিয়ে যায়। দুইটি নৌকাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঝি ছিল। তারা জানতো, দলটি মুক্তিযোদ্ধা। নৌকা ও মাঝি সংগ্রহে পীর সাহেব কেবলা তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

রাত অনুমান ১টার দিকে দাউদকান্দি ফেরিঘাট থেকে প্রায় দেড় মাইল উত্তর দিকে নদীর কাছাকাছি আমন ধান ক্ষেতের মধ্যে ছইওয়ালা বড় নৌকাটি বেঁধে রেখে, নিজেদের তত্ত্বধানে তিনজন করে ছয়জন কমাণ্ডো নৌকায় টার্গেটের

কাছাকাছি পাঠানো হয় এবং সর্বশেষ ট্রিপে একজন কমাণ্ডোসহ দলনেতা টার্গেটের কাছাকাছি পৌঁছেন। প্রথমোক্ত ছয় জন কমাণ্ডো ফেরীঘাট থেকে অদূরে নোঙরকৃত দুইটি ফেরীর প্রত্যেকটিতে তিনটি করে লিমপেট মাইন লাগায়। আর দলনেতা ও অপর কমাণ্ডো নূরুল ইসলাম ফেরীঘাটের

পল্টনে দুটি মাইন লাগান। পল্টুনে মাইন লাগানোর সময় কমাণ্ডোরা লক্ষ্য করেন প্রহরারত পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা একটুও টের পায়নি। তাই অতি নিরাপদে উল্লেখিত তিনটি টার্গেটে লিমপেট মাইন ফিট করে পূনরায় স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে তাদের উদ্ধারের জন্য নদীর উত্তর দিকে পূর্ব পাড়ে অপেক্ষমান কোষা নৌকার দিকে যাত্রা করেন। অপারেশনে যাওয়ার সময় যেভাবে তিনজন করে কমাণ্ডোকে নদীতে নামানো হয়েছিল, একইভাবে আবার তিনজন-তিনজন করে কমাণ্ডোকে কোষা নৌকায় করে ছইওয়ালা বড় নৌকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। পুরাদল বড় নৌকায় যখন ফিরে আসেন তখন রাত আনুমানিক ২টা ৪০ মিনিট। নৌকায় আরোহন করে অতিদ্রুত বন্ধরামপুরের উদ্দেশ্যে মাঝিদের সাথে নিজেরাও নৌকা বাইতে শুরু করেন। তখন গাঢ় অন্ধকারের চারিদিক আচ্ছন্ন। রওয়ানা হওয়ার আনুমানিক পাঁচ মিনিট পর অর্থাৎ রাত ২টা ৪৫ মিনিটে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে নয়টি লিমপেট মাইন যখন বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় তখন নিজেদের মহাবিজয়ী মনে হচ্ছিল। সাথে সাথে নিরাপদ দূরত্ব থেকে কমাণ্ডোরা বুঝতে পারলেন যে, পাকবাহিনী দাউদকান্দি ফেরীঘাট থেকে পশ্চিম দিকে নদীতে এবং চরের দিকে একনাগাড়ে বৃষ্টির মতো মেশিন গান, রাইফেল এবং মর্টারের গুলিবর্ষন করছে। পাক বাহিনীর হয়তো ধারণা হয়েছিল কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা পশ্চিমদিক থেকে ফেরী ঘাট আক্রমণ করেছে। কিন্তু বোকারা ধারণাই করতে পারেনি যে, বিজয়ী বীররা ততোক্ষণে উত্তর দিকে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে এবং তারা তাদের অস্ত্রের নিষ্ফল ঝংকার হানছে। মাইন বিস্ফোরণের বিকট শব্দ এবং পাকবাহিনীর অবিরাম গোলাবর্ষণের আওয়াজে দাউদকান্দি ফেরীঘাট এবং তৎসংলগ্ন চারদিকের প্রায় ২৫ বর্গমাইল এলাকা প্রকম্পিত হওয়ায় লোকজন ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং আতংকগ্রস্থ হয়ে

পড়ে। এরপর তারা যখন বন্ধরামপুরের দিকে যায় তখন দেখতে পায় যে ময়নামতি সেনানিবাস থেকে বিপুল সংখ্যক পাক সেনা কয়েকটি লরী ও জীপে দাউদকান্দির দিকে ছুটে যাচ্ছে।

সুবেহ সাদেকের সময় দলটি পীরে কামেল সাহেবের বাড়ীর ঘাটে পৌঁছে। তখন আধো আধো আলো, আধো অন্ধকারে পীর সাহেব তাঁর বাড়ীর উঠানে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন। কমাণ্ডোরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কেন এত অস্থির ? তখন তিনি বললেন, "তোরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলি আর কয়েক ঘন্টা পরই এতো বড় একটা আওয়াজ হলো আমি আশংকা করছিলাম, তোদের কিছু হলো কিনা; তোদের লোকজনের কি অবস্থা? আল্লাহর কাছে হাজার শোকর আল্লাহ্ তোদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছে। এই বলে তিনি কমাণ্ডোদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন তাঁকে কমাণ্ডোরা জানালেন যে, আপনি যে আওয়াজটার কথা বলছেন তা আপনার পুতরাই ঘটিয়ে এসেছে। দলনেতা তাকে আরো বিস্তারিত ভাবে জানালেন। তারপর ১৭ই আগষ্ট তারিখ আনুমানিক সকাল ১১টার দিকে তাঁরা আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কমাণ্ডোদের রীতিতে অপারেশনের পর অস্থায়ী ঘাঁটিতে অধিক সময় অবস্থান না করার নীতিতে অটল থেকে তারা আটজন কমাণ্ডো এবং গাইড আবুল কাশেমকে সাথে নিয়ে নৌকাযোগে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এবং নৌকাযোগে ফেরার পথে ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের গ্রামের বাড়ী হায়দারাবাদে বেলা আনুমানিক ৩টার দিকে পৌছেন। দলটি হায়দারাবাদ থেকে পায়ে হেঁটে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের কংশনগর নামক বাজার অতিক্রম করেন, এই বাজারের পূর্বদিকে বর্তমানে গোমতি নদী পার হয়ে সন্ধ্যার একটু পূর্বে ভারত-বাংলাদেশ সীমানার কাছাকাছি এসে পৌছেন। তখন কমাণ্ডোদল যেমন ক্লান্ত তেমনি ক্ষুধার্ত। ওখানে গ্রামের প্রৌঢ়া মহিলা কমাণ্ডোদেরকে মোটা চালের ভাত এবং গরুর গোশতের তরকারীসহ ভাত খাওয়ান। ১৮ তারিখ রাতের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-চট্টগ্রাম রেললাইন অতিক্রম করে ভোর আনুমানিক চারটার সময় তারা ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি বাঁশের বেড়া দেয়া কাঁচাভিটার স্কুলে পৌঁছেন এবং সবাই অত্যধিক ক্লান্ত হওয়ায় সেখানেই আধ ঘণ্টার মত বিশ্রাম নেন। অতঃপর বাসযোগে বিজয়ীদল নির্ধারিত গন্তব্যস্থান আগরতলা ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে পৌছেন। (তথ্যঃ শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম)

মেঘনা ব্রীজ ধ্বংসের জন্য অভিযান

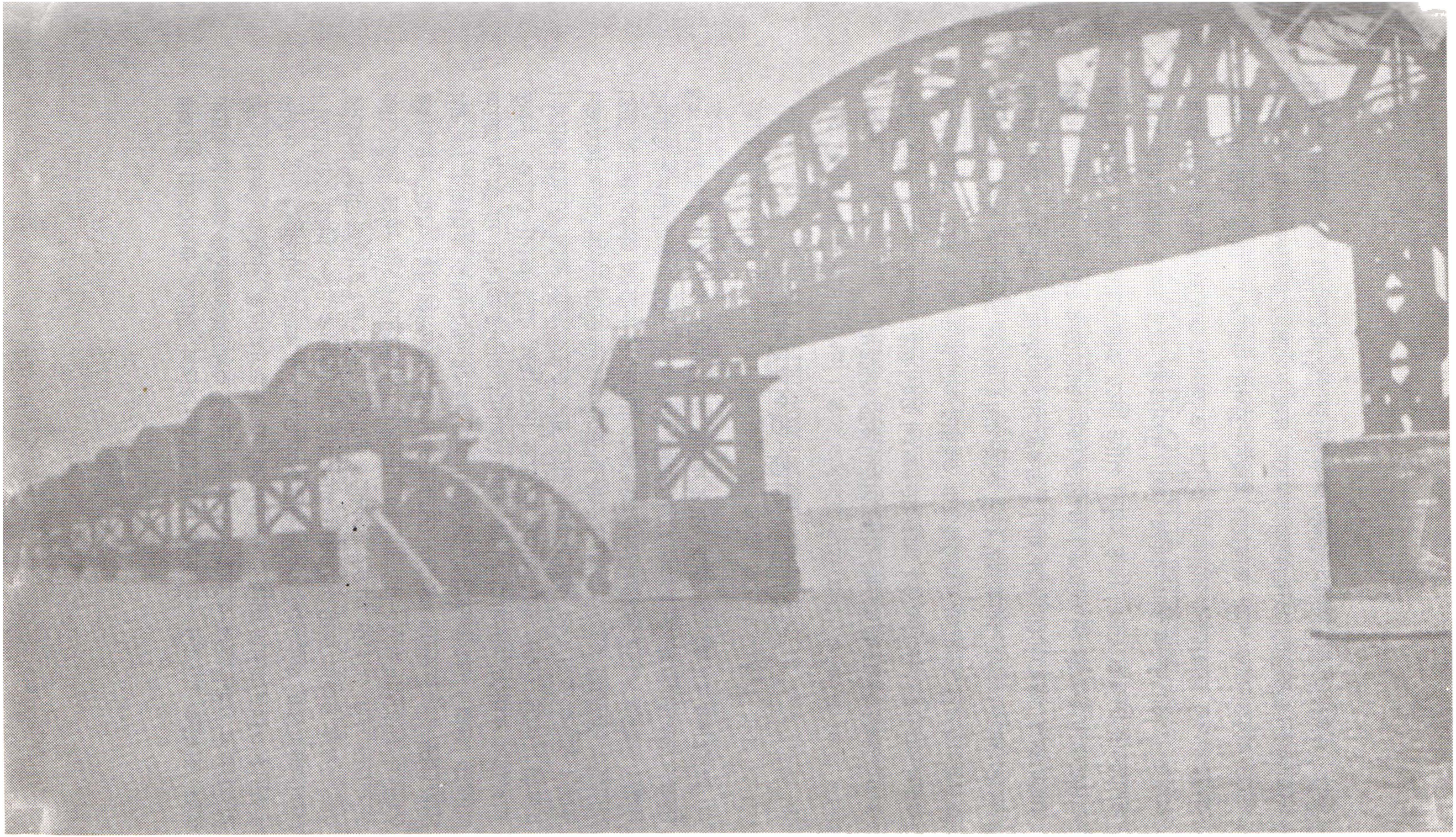
এ,বি ভূইয়ার নেতৃত্বে ৭ জন কমাণ্ডোর একটি দলকে মধ্য অক্টাবরের পাঠানো হয় মেঘনা ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য। এ দলের উপ-নেতা ছিলেন কমাণ্ডো ডঃ আলাউদ্দিন আহ্মেদ। হেজামারা ক্যাম্প হতে দলটি আসে আশুগঞ্জের একটি বাড়ীতে। পথ নির্দেশনায় ছিল মুক্তিযোদ্ধা জহির। এই দলটির নিয়োগ দেয়া হয় মেজর নুরুজ্জামানের নির্দেশে। মেজর নূরুজ্জামান দলনেতাকে জানিয়ে দেন তার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেনো ব্রীজ ধ্বংস করা না হয়। অনেকদিন চলে গেলেও কোন নির্দেশ আসেনি, ফলে দলটি নিজেই কিছু অপারেশন শুরু করেন, তাঁদের অপারেশনের অন্যতম ছিল তালশহর ও আশুগঞ্জের মাঝের রেলওয়ের ব্রীজ, আড়াইসিধা ব্রীজ এবং তিতাস গ্যাস পাইপ উড়ান।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মেঘনা ব্রীজের ব্যাপারে কোন সংবাদ না আসায় দলের সদস্য নিজেরাই এই ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য দলটি যাত্রা শুরু করে। গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে মেঘনা নদী। এ,বি ভূইয়া, মুর্শেদ, শাহবাজ, আলাউদ্দিন, নাইমুল সহ ৬জন কমাণ্ডো রাত ১২টায় বুকে মাইন এবং পায়ে ফিন্‌স পরে নেমে পড়েন মেঘনার বুকে। স্রোতের বিপরীতে ১ ঘনটা সাঁরিয়ে তাঁরা পৌছান ব্রীজের গোড়ায়। তীব্র স্রোতের বিপক্ষে সাঁতরাতে দলের সকলে ছড়িয়ে যান। ফলে বিক্ষিপ্তভাবে মাইন লাগিয়ে ফেরার পথে আলাউদ্দিন আটকে পড়েন জেলেদের পাতা মাছ ধরার জালে। বহু কষ্টে সাথের ড্যাগার দিয়ে জাল কেটে উদ্ধার পেয়ে চলমান এক নৌকার সাহায্যে তিনি ফিরে আসেন আশ্রয় স্থলে। বিজয় অর্জন পর্যন্ত কমাণ্ডো দলটির এখানেই অবস্থান ছিল।

(তথ্যঃ ডঃ আলাইদ্দিন আহমেদ, প্রো-ভিসি জাহাঙ্গির নগর বিশ্ব বিদ্যালয়।)

ফুলছড়িঘাট অভিযান।

নৌ-কমাণ্ডো অভিযানে এই ঘাটে কমাণ্ডো বাহিনীর একটি বড় ধরণের বিপর্যয় ঘটে। অক্টোবরের শেষদিকে (নির্দিষ্ট তারিখ উদ্ধার করা যায়নি। কারণ এই যুদ্ধের দলনেতা সাবমেরিনার আব্দুল রকীব মিয়া বীর বীক্রম, নিজেই শহীদ



'৭১ সালে আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হার্ডিঞ্জ ব্রীজের দৃশ্য।

হন)। একই দলের আরও দুজন কমাণ্ডো আবুল হাশেম ও আঃ সামাদ শহীদ হয়েছিলেন। যমুনার তীর হতে কমাণ্ডো দলটি সাঁতরিয়ে চলেছিলেন বিপরীত পাড়ে অবস্থানরত শত্রু জাহাজে মাইন স্থাপন করতে। কিন্তু দূর্ভাগ্য যখন কমাণ্ডো দল জাহাজের সন্নিকটে পৌছে তৎক্ষনাৎ জাহাজ চলতে শুরু করে। অমিত তেজী যুবক আঃ রকীব মিয়া দুঃসাহসী হয়ে চলন্ত জাহাজেই মাইন লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যমুনা পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত যোদ্ধা সক্ষম হননি চলন্ত জাহাজে মাইন স্থাপন করতে। উপরন্ত তিনি জাহাজের প্রপেলারের সাথে ধাক্কা খেয়ে জাহাজের নীচে চলে যান। একই সাথে অপর দুজন কমাণ্ডোর সলিল সমাধি ঘটে। তাঁর শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। একই অভিযানে অংশগ্রহণকারী ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার কমাণ্ডো ফজলুল হক ভূইয়ার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে, আজও সেই করুন ঘটনার বর্ণনা দিতে। অভিযানে অংশ গ্রহণকারী অপর সদস্য আঃ মালেক ও এই হৃদয় বিদারক ঘটনার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন।

হার্ডিঞ্জ ব্রীজ অপারেশন

অক্টোবর মাসেই এই ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য একটি কমাণ্ডোদল পাঠানো হয় কিন্তু যাত্রাপথেই সম্পূর্ণ দলটি শত্রুসেনার হাতে ধরা পড়ে। কমাণ্ডোদল তাদের সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, পূর্বাহ্নে পানিতে ফেলে দিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও হানাদার বাহিনী তাদের আটক করে পাবনা নিয়ে নির্মম ভাবে নির্যাতন করে। সঠিক তথ্য বের করার জন্য পায়ে রশি বেঁধে উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখে। চামড়া কেটে বলন এবং মরিচ ঢুকিয়ে দিয়েছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু তারপরও কমাণ্ডো সদস্যরা সঠিক কথা বলেনি। তাঁদের জীবনে না মেরে জেলে পাঠিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর তাঁরা মুক্ত হন। এরপরও কমাণ্ডার জি,এম মার্টিসের পরিকল্পনায় জেলে নৌকাতে করে সাবমেরিনার আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে আবারো একটি দল ব্রীজের সন্নিকটে পৌছানোর চেষ্টা করে কিন্তু পাক সেনাদের কড়া পাহারা অতিক্রম করতে দুবারই ব্যর্থ হন। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কয়েকটি গানবোর্ট সার্বক্ষণিক টহল দিয়ে বেড়াতো। ফলে কমাণ্ডোরা নৌ-পথে এই ব্রীজটির ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। এই দলের একমাত্র সদস্য আঃ রহিম (ইউ,এম,সি, জুট মিলের শ্রমিক নেতা) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কমাণ্ডো ফজলুল হক সব ঘটনা স্মরণ রাখতে পারেনি। দু'জনই জানিয়েছেন প্রবল স্রোতে কমাণ্ডোরা ব্রীজের

পীলারের পাশে স্থিতি অবস্থায় থাকতে পারেনি। পাকিস্তানী সেনারাও ব্রীজটি রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় বিমান থেকে বোমা ফেললে ব্রীজের একটি অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

টেকেরহাট ফেরীঘাট আক্রমণ

অক্টোবর মাসের প্রথমদিকে ৩জন কমাণ্ডোর একটি দলকে পাঠানো হয় টেকেরহাট ফেরী উড়িয়ে দেয়ার জন্য। দলে ছিল হাফিজুর রহমান, খবিরুজ্জামান ও আঃ সামাদ। ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধাস্ত্র ও মাইনসহ ৭দিনে তারা পৌছেন মাদারীপুর জেলার রাজৈর এ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাটিতে। এর নেতৃত্বে ছিলেন কমাণ্ডার সরোয়ার মোল্লা। তাকে কমাণ্ডোদের পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বলার পর কমাণ্ডার সরোয়ার ফেরীঘাট আক্রমণের জন্য সকল সহযোগীতার আশ্বাস দিলেন। তার অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধা রুহুলকে দিয়ে ঘাটের ম্যাপ ও (রেকী করে) অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর অক্টোবরের শেষ দিকে ঘাট আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। কমাণ্ডো ৩ জনই অত্র এলাকার এবং ক্যাম্পে কমাণ্ডার এর পরিচিত। তাদের নিরাপত্তার জন্য ২২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে দু'দলে দুইভাগে ভাগ করে ঘাটের একই কিনারে দু'স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ কমাণ্ডোরা যেস্থান থেকে পানিতে নামবেন সেখানে ১১ জন এবং ভাটীতে যেখানে গিয়ে উঠবেন সেস্থানে ১১ জন। রাত ১ টায় তারা সম্পূর্ণদল ফেরীঘাটে পৌছানোর পর আরও গভীর রাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এতে নিরাপত্তার জন্য মনোনীত মুক্তিযোদ্ধারা অস্থির এবং কমাণ্ডোদের প্রতি বিদ্রুপ পূর্ণ কথা বলতে থাকলে কমাণ্ডোরা তৎক্ষনাৎ আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। তারা ৩ জনে, ৩টি টার্গেট নির্দিষ্ট করে মাইন বুকে নিয়ে সাঁতরিয়ে এগুতে থাকেন। কিন্তু র‍্যাকীতে ভূল তথ্য থাকায় খবিরুজ্জামান তার টার্গেট (একটি টহলবোর্ট) খুজতে পানি থেকে মাথা উচু করলে শত্রু সৈন্যরা দেখে ফেলে। সাথে সাথে একঝাঁক গুলি তার মাথা গুড়িয়ে দেয়। অথচ সেই সময়ে নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধারা পালটা গুলি করেনি। কেনোগুলি ছোড়েনি তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি। কমাণ্ডো খবিরুজ্জমান এখানে শহীদ হন। তাকে বীর বিক্রম খেতাবে

ভূষিত করা হয়। কমাণ্ডো হাফিজ ও সামাদ এর লাগানো মাইনে ফেরীঘাটটি সম্পূর্ণ ডুবে যায়। যুদ্ধে জয়লাভ, কম ক্ষয়ক্ষতি, অনেক কিছুই পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে তা টেকের হাটের যুদ্ধ থেকে প্রমাণ মেলে। এই যুদ্ধে একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা হলো যে, কমণ্ডোরা রাজৈর অবস্থানকালে কমাণ্ডার সরওয়ার ঈদের দিন তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বলেন কিন্তু তাঁরা যাননি। হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন বাবা-মার সাথে সাক্ষাৎ হলে কোন মমতায় যদি তাঁরা দায়িত্ব থেকে বিরত থাকেন এজন্য তাঁরা ঈদের দিনেও বাড়ীতে যাননি। শহীদ খবিরুজ্জামানের সহদর খিলগাঁও মডেল কলেজের অধ্যক্ষ হাদিউজ্জামান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমার ভাইয়ের আত্মত্যাগ সার্থক হবে তখনই, যখন দেশ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে পরিচালিত হবে।

বরিশাল এলাকায় অভিযান

১৬ জন নৌ-কমাণ্ডোদের একটি দল কমাণ্ডো সৈয়দ আবুল বাশারের নেতৃত্বে বরিশাল এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় পাঠানো হয়েছিল একটি অভিযান ছাড়া তাঁরা এখানে উল্লেখযোগ্য কোন আক্রমণ পরিচালনা করতে পারেননি। সে অভিযানে খাদ্যভর্তী একটি টাগ ডুবি ঘটে। বরিশালে, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ নৌ-যুদ্ধের গুরুত্ব দেননি, ফলে এসকল কমাণ্ডোদের অনেকে বরিশাল ত্যাগ করে চাঁদপুর অবস্থান কারী নৌ-কমাণ্ডো দলে যোগদেন। একটি অংশ ফরিদপুর চলে যান। সোনারগাঁও থানার কমাণ্ডো ফজলুল করিম স্মৃতি চারণে এই তথ্য এবং দুঃখ পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বরিশাল অপারেশনে অংশ নেন।

গোয়ালন্দ ঘাটে তেলবাহী ট্যাংকার আক্রমণ

গোয়ালন্দ ঘাটের অদূরে ছোট নদীতে একটি তেলবাহী ট্যাংকার অবস্থান করছিল। আক্রমনের আশংকায় খালের মুখ ও আবার শক্ত নেট দিয়ে বন্ধ। আরও একটা ফেরীয়ান গোয়ালন্দ ঘাটে অপেক্ষায়। নভেম্বর মাসের দশ তারিখ,

রাত ১২-৩০ মিনিট চরজন কমাণ্ডো দুটি দলে ভাগ হয়ে দুটি টার্গেটের দিকে যাত্রা শুরু করেন। ঘাটের সার্চ লাইটের তীক্ষ্ম আলো এড়িয়ে একসময় তাঁরা যার যার লক্ষ বস্তুর গায়ে মাইন স্থাপন করে সুইজ খুলে সাঁতরে পালিয়ে যান। কমাণ্ডোদের কভারিং এর জন্য একদল সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধারা অদূরে অপেক্ষায় ছিল। সুইজ খুলে দেয়ার ৪০ মিনিট পর চারটি মাইনই বিস্ফোরিত হয়ে দুটি যানকেই ডুবিয়ে দেয়। তখন নৌ কমাণ্ডোরা সরে পড়েছে। এই দলের নেতৃত্ব দেন লৌহজং থানার কমাণ্ডো ফারুক আহমেদ, বর্তমানে আমেরিকাতে বসবাসরত। (তথ্যঃ কমাণ্ডো ফারুক আহমদ)

ছয়শতি রেলব্রীজ ধ্বংস ও কুলিয়ার চর থানা দখল

মধ্য অক্টোবর ৪জন নৌ-কমাণ্ডোকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় ভৈরব থেকে ময়মনসিংহ রেলপথের মাঝে কুলিয়ার চর থানার ছয়শতি নামক স্থানে রেল ব্রীজটি উড়িয়ে দেয়ার জন্য। এখানে মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রায় ৮০০ শত মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধেসক্রিয় থাকলেও কৌশলগত কারণে তারা এই ব্রীজটি ধ্বংস করতে পারছিল না। কমাণ্ডো বিধান বিশ্বাসের নেতৃত্বে কমাণ্ডো শাহাবউদ্দিন, কমাণ্ডো আব্দুর রহিম ও আলী আহমদকে এখানে পাঠানো হয় মাইন এবং একসপ্লোসিভ সহ। নদীর মাঝে ব্রীজটি দাড়িয়ে ছিল কনক্রিটের বৃহৎকায় পীলারের উপর। যার সাথে চুম্বক যুক্ত মাইন স্থাপন সম্ভব নয়। পীলারের কোথাও গর্ত বা ফাঁক নেই যেখানে একসপ্লোসিভ ঢুকিয়ে বিষ্ফোরন ঘটানো যায়। একমাত্র পথ উপরে ব্রীজের গার্ডারে মাইন বিষ্ফোরন ঘটানো। কিন্তু লিমপেট মাইন পানির অভ্যন্তর ছাড়া বিষ্ফোরন অসম্ভব। এককালের ছাত্রনেতা, জগন্নাথ কলেজের ভি,পি কমাণ্ডো ও দলনেতা বিধান, শাহাবউদ্দিনের সাথে পরামর্শ করে, লিমপেট মাইনের অভ্যন্তরের ডেটনেটরের সাথে সেফটি ফিউজ লাগিয়ে তা বিষ্ফোরণের উপযোগী করে তোলেন। এছাড়া স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রায় ২০০ পাউণ্ড একসপ্লোসিভ সংগ্রহ করলেন তাঁরা। কমাণ্ডো সিরাজ মিয়াকে তার গেরিলা বাহিনীসহ ব্রীজের উপর প্রহরারত রাজাকার ও পাক সেনার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়ে কমাণ্ডোবৃন্দ দূর থেকে

সাঁতরিয়ে ব্রীজের গোড়ায় এসে পৌছেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝে তারা ক্রলিং করে ব্রীজের উপর চলে যান মুক্তিযোদ্ধারা ২০০ পাঃ এক্সপ্লোসিভ ব্রীজের গোড়ায় পৌছে দেন। শত্রুসেনাদের তখন দৃষ্টি যেদিক থেকে গুলি আসছে সেদিকে। কমাণ্ডোরা নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুকি নিয়ে ব্রীজের লোহার গার্ডারে দুইদিকে দুটি মাইন এবং এক্সপ্লোসিভ একসাথে লাগিয়ে সেফটি ফিউজের মাথায় দিয়াশলাই' থেকে আগুন জ্বালিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। মাত্র ২ থেকে ৩ মিনিটের পরেই মাইনের বিষ্ফোরনে ব্রীজ ধ্বসে পড়ে। কমাণ্ডোদের এই দুঃসাহসীকতা এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। শত্রু সৈন্যরা পর্যন্ত কমাণ্ডোদের তৎপরতায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এরপর তাঁরা এবং মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ মিয়া কুলিয়ার চর পুলিশ ষ্টেশন দখন করে নেন। এই অপারেশনের পর কমাণ্ডো সম্বন্ধে শত্রু সৈন্যদের একরকম ভীতি জন্মে। রাজাকার ও পাক সেনারা কমাণ্ডোদের কথা শুনে পূর্বাহ্নেই স্থান ছেড়ে পলে যায়। স্থানীয় জনগণ উৎফুল্ল চিত্তে রেল লাইন উপড়িয়ে ফেলে, তখন নভেম্বরের শেষ সময়। মুক্তিযোদ্ধা জনতা বুঝতে পারে দেশের মুক্তি আসন্ন। নৌ-কমাণ্ডোরা যে সত্যই আত্মোৎসর্গীকৃত ছিলেন বিধান, শাহাবউদ্দিন, আলি আহমদ এবং তাঁর সহযোদ্ধারা এর প্রমাণ রেখেছেন। সিলেট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের ম্যাজিষ্ট্রেট বিধান বিশ্বাস স্মৃতিচারণ করতে এলাকাবাসীর সহযোগীতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

(তথ্যঃ কমাণ্ডো বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, শাহাবউদ্দিন আহ্মেদ)

ফরিদপুরে বাথুন্ডা ব্রীজ ধ্বংস

আব্দুর রশীদ খান, নতুবদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক। বয়স ৫০। ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থাকার বিঘাগদী গ্রামে বাড়ী। বাড়ীটি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও যোগাযোগ কেন্দ্র। জনাব আব্দুর রশীদ খানের জৈষ্ঠ্যপুত্র জনাব আবু সাঈদ খান (বর্তমানে জাসদ রজনীতির সাথে সম্পৃক্ত) ও ফরিদপুরের বিশষ্ট ছাত্রনেতা এবং মুক্তিযোদ্ধা। তখন বর্ষাকাল। নেভাল কমাণ্ডো আবুল কাশেম, মোহাম্মদ আলীসহ ৬ জন কমাণ্ডো তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ সহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে

আলোচনা শুরু হয়। তাঁরা পদ্মা নদীতে অবস্থিত পাকিস্তান বাহিনীর একটি ফেরী উড়িয়ে দিতে এসেছেন। এজন্য কমাণ্ডো দলটির মাইন ও এক্সপ্লোসিভসহ ফরিদপুরে পদ্মার চরে পৌছানো দরকার। ওখান থেকে বিশ মাইল দূরে পদ্মার চর। নৌকা পথে দূরত্ব আরও বেশী। কয়েকটি স্থানে রাজাকারদের পাহারা রয়েছে। কুমার নদী দিয়ে যাতায়াত কালে পাকিস্তান মিলিটারীর মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার আশংকা ও রয়েছে। অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ কাজ। জনাব আব্দুর রশীদ খান বললেন, আমি দায়িত্ব নিলাম। মাইন এবং এক্সপ্লোসিভ নৌকার পাটাতনের নীচে রাখা হলো। নৌকায় শিক্ষক আব্দুর রশীদ খান, আবুল কাশেম, মোহাম্মদ আলী সহ কমাণ্ডো টিমটি রওনা দিলেন। সেইসঙ্গে জনাব খানের ৬০ বছরের বৃদ্ধা চাচী এবং ৮ বছরের কন্যা হাসনা খান রাণী। তাদের সবচেয়ে বিপদজনক স্থান ছিল করিমপুর ব্রীজ অতিক্রম। এখানে রাজাকারদের দিবারাত্রি পাহারা। রাজাকাররা সব নৌকা তল্লাশি করতো। ব্রীজের কাছাকাছি এসে জনাব খান ও কামাণ্ডোদলটি নৌকা থেকে নেমে গেলেন। নৌকায় কেবল তার বৃদ্ধা চাচী ও ছোট মেয়ে রাণী। নৌকা ব্রীজের কাছে এলে রাজাকাররা হাকলো নৌকা ভিড়াও। রাণীকে আগেই শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। ও তাই বললো, আমরা মুন্সি বাড়ী যাবো। "মুন্সিরা তোমার কি হয়?" "আমার নানা বাড়ী।" একথা বলায় এবং নৌকায় কোন পুরুষ লোক না থাকায় ওরা তল্লাশী করলো না। মাইল খানেক পথ পেরিয়ে কমাণ্ডোরা পুনরায় নৌকায় উঠলেন। এখান থেকে ৬/৭ মাইল দুরে ফরিদপুর শহরতলী, কোমরপুর (জনাব খানের শ্বশুর বাড়ী) এলেন। বাড়ীটি নিরাপদ হলেও এখানে আসবার পর এক লোক (যিনি জনাব খানের আত্মীয়) এসে বললেন আপনি ছেলেমেয়েসহ ইসলাম ও পাকিস্তানের বিরোধীতা করছেন। আজও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এখানে এসেছেন? কোথাও কিছু ঘটলে আপনাকে ছাড়বো না। আমি মিলিটারী ক্যাম্পে রিপোর্ট করবো। অবস্থা প্রতিকুল মনে হওয়ায় দ্রুত কমাণ্ডোদেরকে ফরিদপুর সংলগ্ন ঝুকিপূর্ণ কুমার নদী দিয়েই পদ্মার চরে তাঁর ভায়রা, চর মাধবদিয়া গ্রামের শফিউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে পৌছে দেয়া হয়। জনাব আব্দুর রশীদ খানের বাড়ী থেকে এই গ্রুপটি বাথুন্ডায় এসে ফরিদপুর-বরিশাল সড়কে ফরিদপুর থেকে ৬/৭ মাইল পূর্ববর্তী বাথুন্ডা ব্রীজটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে জনাব খানের সঙ্গে কমাণ্ডো দলের দুইজন সড়ক পথে ফরিদপুর হয়ে সরেজমিনে গিয়ে অবস্থা অবলোকন করে আসেন। এরপর তারা পদ্মায় অবস্থানরত একটি বার্জ মাইন দিয়ে ডুবিয়ে দেন। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রানীদের নাম লেখা নাহলে, সে ইতিহাস হবে অসম্পূর্ণ।

(তথ্যঃ আবু সাঈদ খান ও কমাণ্ডো মোহাম্মদ আলি)

সিলেট ভাটি অঞ্চলে নৌ-অভিযান

অক্টোবর মাসে কমাণ্ডো হাবিবুর রহমানকে দলনেতা করে ৮ জন কমাণ্ডোর একটি দল পাঠানো হয় সিলেট ভাটি অঞ্চলে বার্জ, ফেরী, গানবোট, ডোবানোর জন্য। দমদম থেকে বিমানে ভরতের বালাট আনা হয় দলটিকে। শিলং এসে দলটিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছিলেন ৩ জন কমাণ্ডোঃ জয়নাল আবেদীন, মেজবাউদ্দিন চৌধুরী ও আব্দুর রহমান। সুনামগঞ্জে প্রথম অপারেশন ব্যর্থ হয় নদীতে পানির নীচে লতার ন্যায় লম্বা এক প্রকার গাছের জন্য। সাঁতার কাটতে এই লতা ফিন্‌সে জড়িয়ে কমাণ্ডোদের মুত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তারা সুনাজগঞ্জে তাহেরপুর আর্মি জেটি অপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখানে দলটি একটি বার্জ ও স্পীড বোট ডুবিয়ে দেন। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে ধিরাই ঘাটে একটি বার্জ ডুবিয়ে দেন। অক্টোবর মাসে বানিয়াচং এলাকায় একটি গানবোট মাইন লাগিয়ে ধ্বংস করেন। এই দলটির অপর গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল নিকলী থানার বাইলাবাড়ীতে হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে বাইলাবাড়ী ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া। আজমপুরে মেঘনা নদীতে হানাদার বাহিনীর একটি টহলরত গানবোট কমাণ্ডো দল দুঃসাহসীক ভাবে উড়িয়ে দেন। যুদ্ধপূর্ব দলনেতা প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান সিলেটে লেখা-পড়া করতেন, সুতরাং অত্র এলাকা ছিল তার সুপরিচিত।

(তথ্যঃ প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান ও কমাণ্ডো জয়নাল আবেদীন)

সিলেট দ্বিতীয় অভিযান

এরপর কমাণ্ডো মীর মোশতাক আহ্‌মেদ রবি সহ কয়েকজন কমাণ্ডোকে পুনরায় সিলেট এলাকায় পাঠানো হয়। কিন্তু ভাষা গত বৈষম্য এবং ওই এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধ ও রাজাকার বাহিনীর আধিক্যতার কারণে তাঁরা সুবিধা করতে পারেননি। চা বাগান ও পাহাড়ী এলাকায় কিছু বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং চা বাগানের বিদ্যুৎ সরবরাহের জেনারেটর ধ্বংস করেন। এই দলে ছিলেন আবু নেছর

সিদ্দিক, এস,এ মজুমদার, মোহর আলী সহ কয়েক জন। (তথ্যঃ কমাণ্ডো এস,এ, মজুমদার)

নারায়ণগঞ্জ সাইলো ধ্বংসের বিফল চেষ্টা

সাবমেরীনার আবেদুর রহমানের নেতৃত্বে কমাণ্ডো হাবিবুল হক খোকন, মেজর এমদাদ, জসিমউদ্দিন ও মতিউর রহমান, আঃ রহিম নারায়ণগঞ্জে সাইলো খাদ্য গুদাম ধ্বংসের আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অনেকগুলো মাইন একই সাথে বিষ্ফোরণ ঘটিয়েও সাইলোর দেয়াল কাপানো ছাড়া ধ্বংস সম্ভব হয়নি। এরপরও নারায়ণগঞ্জ ঢাকা অভিযানে অংশ গ্রহণকারী দলটি অসংখ্য অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। (তথ্যঃ কমাণ্ডো জসিমউদ্দিন, হাবিবুল হক খোকন, মতিউর রহমান বীর প্রতীক)

নারায়ণগঞ্জ, তারাবো, সিদ্ধিরগঞ্জমেঘনা ঘাট অভিযান

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তায় ২২ জনের একটি কমাণ্ডো দল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, কাঁচপুর, তারাবো, মুন্সিগঞ্জে, সিদ্ধিরগঞ্জ, নবীনগর, মেঘনা নদী বন্দরে নৌ-যানের ওপর আক্রমণ ও নদী বন্দরগুলি অচল করার পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিতীয় বারে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। কুমিল্লা শহর ও ক্যান্টনমেন্ট এর মাঝ দিয়ে সড়ক অতিক্রম করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে দলটি পৌছায় ঢাকার সোনারগাঁয়ে বৈদ্যের বাজারে মূছার চর এলাকায়। এবারেও দলনেতা সাবমেরিনার আবেদুর রহমান। মূসার চরে জেলে পাড়ায়, মাটিতে গর্ত খুড়ে কমাণ্ডোরা মাইন লুকিয়ে রাখে এবং তারা চরে বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকেন এবং এখানে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবেদুর রহমান দশজন কমাণ্ডোর একটি দল নিয়ে মাঝির চরে জাংগালিয়া গ্রামের মতি মিয়ার বাড়ির আশ্রয় কেন্দ্র পালটিয়ে রাতের আধারে যুদ্ধাস্ত্রসহ চলে আসেন কলাগাছিয়ায় জয়নাল আবেদীন নামে এক ধনাঢ্য

ব্যক্তির বাড়ীতে। তিনি জান ও মালের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে, কমাণ্ডো দলকে নিজের বাড়ীতে নির্ভয়ে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত গর্বের কথা জনাব জয়নাল আবেদীন তাঁর শয়ন কক্ষে নিজের খাটে এবং মেঝেতে কমাণ্ডোদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজ পুত্রসহ কমাণ্ডোদের সাথেই ঘুমাতেন। তার বৃহৎ চালকলে, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের ধান-চাল থাকলেও তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য এ ঝুঁকি নিয়েছিলেন। জনাব জয়নাল আবেদীন এখন ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের অধিবাসী।

২৭ শে অক্টোবর কমাণ্ডোরা শীতলক্ষ্যা নদীতে মিনি কিন ও মিনি লেডি' নামের দুটি বিদেশী জাহাজ ডুবিয়ে দেন অসাধারণ সাহসিকতার সাথে। এখানে মেজর কাজী এমদাদুল হক, মতিউর রহমান, আঃ রহিম, হাবিবুল হক, হেদায়েতউল্যা, কালু প্রমুখ এই অভিযানে অংশ নেন।

এরপর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তায়ে পুনরায় আবেদুর রহমানের নেতৃত্বে এই কমাণ্ডো দল ধলেশ্বরী নদীতে 'তুরাগ' নামের একটি রশদ বোঝাই জাহাজ দুঃসাহসিকভাবে ডুবিয়ে দেন, জাহাজটিতে এন্টি এয়ারক্রাফট স্থাপন করা ছিল। এই অভিযানে অংশ নেন, আবুল হোসেন, আনোয়ার, আবু তাহের, মেজর কাজী এমদাদুল হক, রহিম, সহ অন্যান্য কমাণ্ডোবৃন্দ তুরাগ জাহাজ ডোবাতে কমাণ্ডো আবুর হোসেন গুলিবিদ্ধ হন এবং পরবর্তীতে মৃত্যু বরণ করেন। সেই সময়ে ঢাকাকে অবরুদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে জেনারেল জ্যাকব ও ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং চট্টগ্রাম থেকে ৩জন কমাণ্ডোকে ঢাকা অভিযানে পাঠান। আবু মূসা চৌধুরী জানান, মেঘালয়ে ভারতীয় সামরিক ঘাটিতে নিয়ে তাঁদের বোঝানো হয় ঢাকাকে অবরুদ্ধ করতে হলে তাদের শীতলক্ষ্যা এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক অবরুদ্ধ করতে হবে। এই দুটি রাস্তা বন্ধ হলে ঢাকার সরবরাহ বন্ধ হবে এবং শত্রুবাহিনী পরাজিত হলে তাদের পালানোর পথও অবরুদ্ধ হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তায়ে শীতলক্ষ্যায় খাদ্যবাহী জাহাজ 'তুরাগ' এবং একই সপ্তাহে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে, ঢাকার কাঁচপুর ফেরীঘাটে ফেরী ডুবিয়ে দিলে সত্যই ঢাকা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কাঁচপুর ফেরীঘাট অভিযান চালানোর পূর্বে রেকী করার সময়ে কমাণ্ডোরা একজন রাজাকার কমাণ্ডারকে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে দেখেছেন যিনি পরবর্তী সময়ে সরকারের মন্ত্রি পরিষদের সদস্য হয়েছেন। কমাণ্ডো মতিউর রহমান বীর প্রতীক এই তথ্য জানিয়েছেন।

শ্রীবর্দি থানায় বার্জ ধ্বংস

মধ্যঅক্টোবরে কমাণ্ডো কফিলউদ্দিনসহ পাঁচজন কমাণ্ডোর একটি দলকে দমদম থেকে আগরতলা/বিমানে হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে নরসিংদী পাঠানো হয়। এখানে নদী বন্দরে নৌ-যান ডোবানোর জন্য। প্রবল বর্ষার মাঝে আখাউড়া থেকে নৌকা যোগে ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া হয়ে অক্টোবরের শেষদিকে নরসিংদি থেকে ৩ মাইল উত্তরে বালিয়াকান্দি গ্রামের সরদার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন ৫ জন কমাণ্ডো সথে আরও ৪ জন স্থলবাহিনীর গেরিলা। কমাণ্ডোদল বহন করে এনেছে অপারেশনের জন্য মাইন, একসপ্লোসিভ, ফিনস্, ড্যাগার। এসময় কমাণ্ডোরা নিজস্ব পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রনহীনভাবে অভিযান চালাতেন। সরদার বাড়ীর আশ্রয়ে থাকাকালে একই বাড়ীর যুবক কমাণ্ডোদলকে জানালো যে, সে নরসিংদী সংলগ্ন যমুনা নদীতে (আশুগঞ্জের কাছাকাছি) ২টি বার্জে চট ভর্তি করছে। কমাণ্ডোদল সেদিন রাতেই অপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লিমপেট মাইন লাগিয়ে কমাণ্ডোরা একটি বার্জ ডুবিয়ে দেন। প্রায় দশহাজার টন চট সম্পূর্ণ ভষ্মিভূত হয়। অপর জাহাজ পূর্বাহ্নেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। এ অভিযানে আরও যাঁরা অংশ নেন কমাণ্ডো আবুল হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন, আরব আলী, খোরশেদ আলম। পরদিন পাক বাহিনী, রাজাকারদের সহযোগিতায় শ্রীবর্দি গ্রামটি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। ফলে কমাণ্ডো দল স্থান বদল করে সীমান্তে চলে আসে।

(তথ্যঃ কমাণ্ডো মোঃ আরব আলী ও খোরশেদ আলম)

কাঁচপুর ফেরীঘাট আক্রমণ

এই দলের শেষ লক্ষবস্তুগুলি ছিল মেঘনা ঘাটের ফেরীযান ধ্বংস করা। শত্রুবাহিনী তখন চারিদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের মুখে পিছিয়ে আসছে। এই সময়ে মেঘনা ঘাট অচল করা সম্ভব হলে ঢাকার সাথে ময়নামতি ও চট্টগ্রামের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। পরিকল্পনকারীরা সেজন্য এই ঘাটের ফেরীযান গুলো ডুবিয়ে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। নভেম্বরের শেষ সপ্তায়ে

অপারেশন শুরুর আগেই ঘাটের দুই পাশের অধিবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে যে, এই এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা বড় ধরণের আক্রমণ পরিকল্পনা করছে। ফলে মানুষ ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে থাকে। এদিন সকালে ফেরীঘাট রেকী করার জন্য ঘাট এলাকায় পাঠানো হয় কমাণ্ডো আবু তাহের ও মতিউর রহমানকে। তারা ঘাটে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা ও সুক্ষ্ম দৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করছিলেন হঠাৎ সেনাবাহিনীর কনভয় এসে পড়ে। তাঁরা দুজন একটি হোটেলের পিছন দিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে থানা বাসন মাজতে থাকেন। হোটেল মালিকের তাদের আচরণ দেখে সন্দেহ হয় কিন্তু যুবক দ্বয়ের আকুতিতে ক্ষণ সময়ের জন্য নিরাপত্তা দিতে সম্মত হন। প্রায় চার ঘন্টা তাঁরা হোটেলের অভ্যন্তরে আটকে থাকেন। এই সময়ে তাঁরা মতিন চৌধুরীকে পাকবাহিনীর সাথে দেখেছেন নভেম্বরের ২৬ তারিখ রাতে যখন কমাণ্ডোরা অভিযানের উদ্দেশ্যে ঘাট অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছেন পথে দেখেন অসংখ্য মানুষ অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের লোক বিষয়টিকে গুজব ধরে নিয়ে নিজ বাড়ী-ঘর ছেড়ে গেলনা। রাত তখন ১টা ঘাটের পারাপার বন্ধ। সশস্ত্র পাহারা রেখে ফেরীযানগুলো ও বন্ধ। কমাণ্ডোরা অনুকুল সময় ভেবে ঘাট থেকে প্রায় ১ মাইল দূরথেকে স্রোতের অনুকুলে ফেরীঘাটের দিকে সাঁতরাতে থাকেন। প্রহরীরা উজ্জল সার্চ লাইট জ্বেলে চারিদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছে। এরমাঝে পানির নীচদিয়ে সাঁতরিয়ে মুখের উপর কচুরীপানা আড়াল করে এসে কমাণ্ডোরা দুটি ফেরীযানে মাইন লাগিয়ে যথারীতি স্থান ত্যাগ করেন। মাইনের বিষ্ফোরণে দুটি ফেরীযানই পানিরনীচে তলিয়ে যায়। তারপর হানাদারদের অত্যাচার নেমে আসে নদীর দুপারের মানুষের ওপর। যারা বসত বাড়ীর মায়ায় স্থান ত্যাগ করেনি তাদের সকলেই প্রাণ হারায়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেদিন কাঁচপুর ফেরীঘাটের দুই তীরে ২০০জন নিরিহ মানুষকে, হত্যা করে। এই অভিযানে অংশ নেনঃ আঃ রহিম, জসিমউদ্দিন, বশির আহমদ, মতিউর রহমান, আবু মূসা চৌধুরী, আবু তাহের, মনোজ দত্ত। এই ফেরীযান ডোবার ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন শেষ নভেম্বর। কাঁচপুর ফেরীঘাট অচল এবং ঢাকায় প্রবেশ পথে শীতলক্ষ্যা নদীতে তুরাগ জাহাজ ডুবির ফলে শত্রু সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। আকাশ পথ আরও পূর্বেই শত্রু বাহিনী হারিয়েছে। তাই সৈন্যদের সামনে তখন

অনিশ্চিত ভবিষ্যত। ঢাকার চারিদিকে স্থলের গেরীলা এবং সশস্ত্র বাহিনীর চাপ অনেকগুণে বেড়ে গেছে। হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে নিরিহ জনগণের উপর অত্যাচার, লুটতরাজ, হত্যা শুরু করে। যখন তারা নিশ্চিত হলো যে এদেশ স্বাধীন হবে। পাকবাহিনী এবং তদের এদেশীয় দোষর রাজাকার, আলবদর আলসামস এর নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটি যেনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে নাপারে। তাই তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করে যারা বুদ্ধি যুগিয়েছে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সেই বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীলনকসা তৈরী করে। অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার জন্য ব্যাংকে গচ্ছিত সকল অর্থ স্বর্ণ এবং মূল্যবান সম্পদ পুড়িয়ে ফেলে। মিল-কারখানার যন্ত্রাংশ নষ্ট করার নির্দেশ প্রদান করে। গুরুত্বপূর্ণ ভবন, ব্রীজ, টেলিফোন একচেঞ্জ ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পোড়ামাটির ওপরেই দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৯ মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য গোটা রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেয়া হয় মেজর পদমর্যাদার একজন বাঙালী সেনা অফিসারের উপর। এভাবে সব সেক্টরের দায়িত্বে একজন সেক্টর কমান্ডার মনোনীত হলেও দশ নম্বর সেক্টরের কোন সেক্টর কমাণ্ডার নিয়োগ করা হয়নি এবং এর কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিলনা। কার্যত এর আওতায় ছিল বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ এবং আভ্যন্তরীন নদী বন্দর ও গোটা নৌ-পথ যা নিয়ন্ত্রণ করতো প্রকৃতপক্ষে নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী। নৌ-কমাণ্ডোবৃন্দ কোন নির্দিষ্ট কমাণ্ডারের অধীনে পরিচালিত হননি। তাঁরা যখন যে সেকটরে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সেই সেক্টরের অধিনায়ক তাঁদের নিরাপত্তার সর্বাঙ্গিন দায়িত্ব পালন করেছেন। নৌ-কমাণ্ডোদের দ্বারা পরিচালিত অভিযানে সেক্টর কমাণ্ডার অথবা দলনেতার ভূমিকা কার্যত গৌণছিল তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল পরিকল্পনা ছিল একজন কমাণ্ডোকে সর্বাত্মক ত্যাগের বিনিময়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইন বয়ে নিয়ে শত্রু জাহাজ অথবা পানির অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট টার্গেটে বিষ্ফোরণ ঘটানো। পরিকল্পনাবীদদের ধারণা ছিল একজন কমাণ্ডো একটি মাইন বিষ্ফারণ ঘটিয়ে নির্দিষ্ট বস্তু ধ্বংসের সাথে সাথে তার জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। সকল কমাণ্ডোকে এতটা আত্মত্যাগ এবং মনোবলে দীক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়েছিল। আর অভিযানের নির্দেশণা মূল প্রশিক্ষণ ঘাটি থেকেই জানিয়ে দেয়া হতো। এর

মাঝে যিনি যে পর্যায়েই কমাণ্ডোদের সাহচর্যে এসেছেন তিনি কেবল সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছেন। নেতৃত্ব দিয়ে কখনও অপরকে জীবন উৎসর্গে উদ্বুদ্ধ সম্ভব হয়না। ভিতরের আবেদন থেকেই একজন যোদ্ধা এই কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। তাঁর দায়িত্ব সম্পন্নের পর এর সুফল ভোগ করার জন্যও তিনি চিন্তা করেন না। বৃটিশ ভারত থেকে শ্বেতাঙ্গদের তাড়াতে ১৯১১ সালে আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি দিতে কানাইলালদত্ত ও সত্তেন্দ্রনাথ বসু নামে দু'যুবক বিশ্বাস ঘাতক নরেন গোস্বামীকে হত্যা করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর ফ্রান্সের পত্রিকা 'হিউম্যানি' বাঙলার বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিল "ভারতীয় বিপ্লবীরা যে প্রকারে শত্রুপুরীর ভিতর থাকিয়াও রক্ষিবেষ্ঠিত বিশ্বাস ঘাতক স্বজাতি দ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।" কানাইলাল, সতেন্দ্রনাথ তাঁরা স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য এই আত্মঘাতি কাজে এগিয়ে আসেননি, তা জীবন দিয়ে প্রমাণ রেখে গেছেন। ১৯০৮ খৃঃ বোমা নিক্ষেপে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যার চেষ্টা করে প্রফুল্ল চাকীর সাথে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার ও বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৯১৩ সালে আসামের শ্রীহট্ট জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ডর্ন সাহেবের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তাকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে ২৭ শে মার্চ এক সাহসী যুবক একটি ভয়ঙ্কর শক্তিধর বোমা ও দুটি রিভলবার নিয়ে মৌলভীবাজারে ডর্ন সাহেবের বাগানবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু বাগানের মধ্যদিয়ে অন্ধকারে অগ্রসর হওয়ার সময় ঝাকুনীতে হাতের বোমা ফেটে যুবকের দেহের উপরের অংশ টুকরা টুকরা হয়ে যায়। রাইটার্স বিল্ডিং এ বড়লাটকে মারার জন্য বিনয়, বাদল ও দীনেশ তিন যুবক পুলিশ বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এসব যুবকদের আত্মত্যাগের জন্য কেউ বাধ্য করেনি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশভূমি থেকে বিজাতীয়দের বিতাড়নের জন্যই তাঁরা আত্মত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন। সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে জাতির ক্রান্তিকালে দেশের যুব সমাজই এমন দায়িত্ব নিজেদের কাধে তুলে নেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোরা যে অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন, আবহমানকালের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পূর্বসুরীদের অসমাপ্ত কাজ জীবন দিয়ে সফল করে বাঙালির জাতীয় ইতিহাস উজ্জ্বল করেছেন।

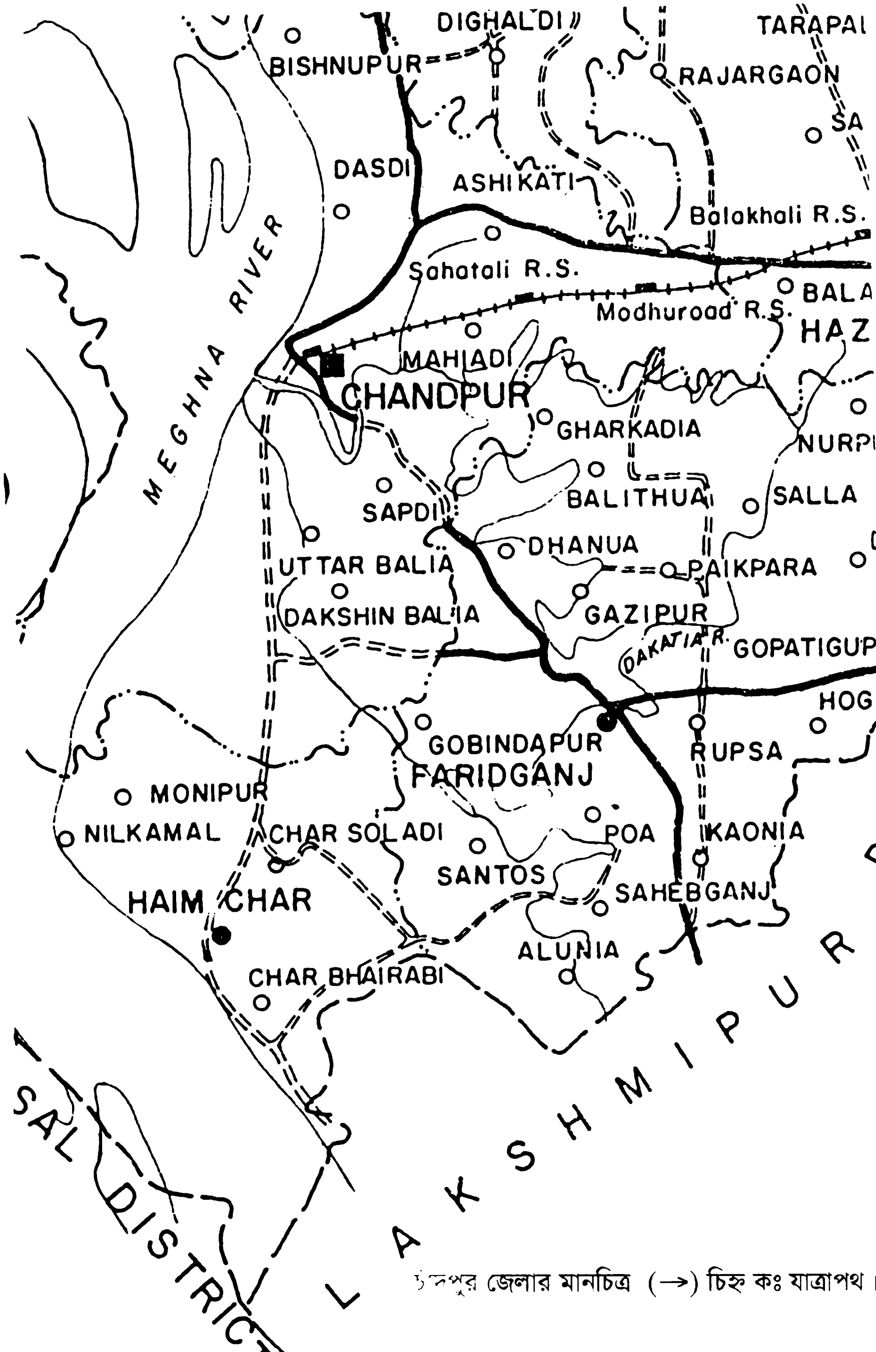
চাঁদপুর অভিযান

বাংলার ভূমি শত্রুমুক্ত করতে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আত্মঘাতি নৌ-কমাণ্ডোদের অপর দল চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার জন্য মধ্য আগষ্টে অপারেশন জ্যাকপটের আওতায় সাবমেরিনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে বাছাইকৃত ২০ জন নৌ-কমাণ্ডোকে বাংলাদেশের অপর গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর চাঁদপুর পাঠানো হয়। এই নদী বন্দর বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হলে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাথে বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় শত্রুবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত করা যাবে। সেই কারণে চাঁদপুর অপারেশন ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আগষ্টের ৩ তারিখ চাঁদপুর বন্দরের উদ্দেশ্যে দলনেতা এবং আরও ২০ জন কমাণ্ডোর একটি দল সামরিক ট্রাকে প্রথমে ব্যারাকপুর এবং সেখান থেকে পরের দিন বিমানযোগে আগরতলা নিয়ে আসে। এখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর অপারেশনের উদ্দেশ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে চাঁদপুরের পথে সীমান্তের উদ্দেশ্যে মোটর যাত্রা শুরু হয়। কমাণ্ডো দলকে সীমান্তে পৌঁছে দিতে আসেন ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং এবং লেঃ সমীর কুমার দাস। ৯ তারিখ সন্ধ্যার পূর্বাহ্নেই দলটি সীমান্তবর্তী এলাকায় পৌছে রাতের আহার সম্পন্ন হলে, লেঃ দাস, ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং এর সাথে সকল কমাণ্ডোকে পরিচয় করিয়ে দেন। অতপর সকল কমাণ্ডোকে দেয়া হয় ১টি মাইন, ১ জোড়া ফিনস্, সুইমিং কষ্টিউম, ১টি ড্যাগার, সার্ট লুঙ্গি, গামছা, হ্যান্ড গ্রেনেড, ষ্টেনগান এবং দলের জন্য একটি রেডিও। অন্য দলের সাথে ভিন্নতা ছিল, এই দলের নিরাপত্তা ও পথ দেখিয়ে চলার জন্য কোন গাইড দেয়া হয়নি। নিজেদের দায়িত্বে চাঁদপুর পর্যন্ত যেতে হয়।

সীমান্তে সাবেগ সিং এবং লেঃ সমীর কুমার দাস অশ্রু সজল চোখে কমাণ্ডো বাহিনীকে বিদায় জানালেন। বিদায় নিয়ে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে তাঁদের পুনঃ যাত্রা। আগরতলা থেকে সোনামুড়ি ও মেলাঘর হয়ে বকসনগর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ



চাঁদপুর জেলার মানচিত্র (→) চিহ্ন কঃ যাত্রাপথ।

ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। গ্রাম বাসীদের সহায়তায় তারা ময়নামতি পর্যন্ত নিরাপদে এসে পৌছেন। ময়নামতি সেনানিবাসের সন্নিকটে সিএণ্ডবি সড়ক অতিক্রম করা তাদের জন্য খুবই ঝুকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। সেনানিবাসের কাছাকাছি স্থান বিধায় ঘন-ঘন সামরিক যানবাহন গুলি তীব্র আলো ছড়িয়ে যাতায়াত করছিল। এর মাঝে কমাণ্ডোরা পাশ্ববর্তী ধান ক্ষেত্রের মধ্যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। এক সময় তাঁরা ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক অতিক্রম করে সামনে পথ চলতে শুরু করেন। তখন সর্বত্র স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচরণ। সারারাত পায়ে হেটে ভোরে অজানা গ্রামের এক ধনীর বাড়ীতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে তার ছেলেকে জিম্মি করে কমাণ্ডোদের আশ্রয় প্রদানে বাধ্য করেন। বাড়ীওয়ালা ছিল মুসলিম লীগের নেতা। সারাদিন আত্মগোপণে থেকে সন্ধ্যায় পুনযাত্রা। সাথে নিলেন মুসলিম লীগ নেতার ছেলেকে। দুটি উদ্দেশে, পথ চেনানো দ্বিতীয়ত; তাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা। পরবর্তী আশ্রয়ে পৌছানোর পূর্বে এই মুসলিম লীগ নেতার পুত্রকে বিদায় দেয়া হয়। সমস্ত পথই ছিল বিপদ সংকুল। তখন সকল স্থানে স্বাধীনতা বিরোধীরাও সংঘবদ্ধ। দুইরাত দুইদিন কখনও নৌকায়, কখনও পায়ে হেটে মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে ১২ আগষ্ট কমাণ্ডো দল এসে পৌঁছে চাঁদপুরের কাছাকাছি দাসাদী গ্রামে। গ্রামের দুই তরুণ কমাণ্ডো এবং সহদর শাহজাহান কবির এবং সামসুল কবির এই দলের সদস্য ছিলেন। তাঁরা এলাকার প্রবীন শিক্ষক ইব্রাহিম বি.টি সাহেবের দুই পুত্র। তাঁদের বাড়ীতে কমাণ্ডোদের প্রথম আশ্রয় স্থল হলেও নিরাপত্তা ও দূরের অবস্থানে থেকে, অভিযানে অসুবিধা হবে চিন্তা করে পরের দিন চাঁদপুরের অতি সন্নিকটে শাহ্জাহান কবিরের মামা করিম খাঁনের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এই দলের সদস্র প্রায় সকলে স্থানীয় যুবিক। একই দিনে দলের দুজন সদস্য শাহআহান কবির এবং মমিনউল্লা পাটওয়ারী, গ্রামের আরও দুইজন সাহসী যুবকের সাথে নিয়ে বন্দর এলাকা পরিদর্শন র‍্যাকী) করে বন্দরের হাজাজ এবং শত্রু সৈন্যের অবস্থান ও শক্তি পর্যবেক্ষন করে দলনেতাকে অবহিত করেন।

১৪ আগষ্ট অপারেশনের পরিকল্পনা থাকলেও রেডিও মাধ্যমে নির্ধারিত সঙ্গীত না বাজানোর জন্য অন্যান্য বন্দরের ন্যায় চাঁদপুরে ও এদিন অভিযান স্থগিত রাখা হয়। পরের দিন ১৫ আগষ্ট সকাল ৭.৩০ মিঃ নির্বাচিত গান "আমার পুরল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ী" বেজে ওঠে। সাথে সাথে

দলনেতা সকল কমাণ্ডোকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। সবাই প্রস্তুত। অথ্যানুসারে দলনেতা দলনেতা ফেরী, বার্জ, পল্টুন জাহাজ মিলিয়ে ৬টি টার্গেট ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। সেই লক্ষ্যে দলনেতা ১৮জন কমাণ্ডোকে ৬জন দলে ভাগ করে প্রতিটি টার্গেটের জন্য ৩ জন কমাণ্ডোকে নির্দিষ্ট করে দেন। দলনেতা বাদিউল আলম নিজেও অভিযানে সামিল হন। দুজন কমাণ্ডো অপারেশনে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে বন্দরের দূরবর্তী নিরাপদ স্থানে নৌকা নিয়ে যুদ্ধশেষে কমাণ্ডোদের উদ্ধারের জন্য অপক্ষো করার নির্দেশ দেয়া হয়। দলনেতাসহ প্রত্যেকে একটি মাইন বুকে বেঁধে রাতের অন্ধকারে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে মেঘনা ও ডাকাতিয়ার মোহনায় অথৈ জলরাশির মাঝে নেমে পড়েন। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানুষের রব নেই। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। গ্রামের কুকুর গুলিও যেনো দানবের ভয়ে নিরব। চারিদিকে অথৈ পানি আর এর ছল ছল শব্দ। এরমাঝে কমাণ্ডোরা এগিয়ে চলেন অদম্য যুদ্ধ জয়ের নেশায়।

বর্ষায় মেঘনার মোহনা। এক ভয়ংকর রূপে সেজে মানব কুলের দিকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে চলেছে। নদীতে প্রবল ঢেউ এবং স্রোত। কিন্তু অজেয় মুক্তি সেনারা সকল ভয় ভীতি ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে অভিষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে সাঁতরিয়ে চলেছেন। বন্দরের গোটা এলাকা আলোয় ঝলমল করছে। জাহাজ থেকে অনুসন্ধানী আলো ঘুরে যাচ্ছে চারিদিক। এমন বিপজ্জনক পরিবেশের মাঝেও কমাণ্ডোরা নিঃশব্দে পৌঁছে যান প্রত্যেকের নির্দিষ্ট টার্গেটের পাশে। কোমর থেকে ড্যাগার খুলে একই সাথে ডুব দেন ৩জন কমাণ্ডো। ৬ ফুট পানির নীচে জাহাজের গায়ে বহুদিনের জমে থাকা শেওলা চেঁছে পরিষ্কার করে নেন মাইন স্থাপনের জন্য। আবার ভেসে উঠেন পানির উপর। কমাণ্ডোকে একইস্থানে অবস্থানের জন্য সাঁতরাতে হয় স্রোতের বিরুদ্ধে। এবার বুকে বাধা মাইন খুলে ডুবদিয়ে পৌঁছে যায় পূর্বের স্থানে। যেখানে পূর্বে ড্যাগার দিয়ে পরিস্কার করে নিয়েছে। জাহাজের গায়ে হাত ঘষে স্থান খুঁজে স্থাপন করে হাতের মাইনটি। মাইনের তলায় স্থাপিত শক্তিশালী চুম্বক মাইনকে আটকিয়ে রাখে জাহাজের সাথে। একই সময়ে মাইনের সাথে রাবারের ক্যাপ খুলে পানি প্রবেশের সুযোগ করে দেন মাইন বিষ্ফোরণের জন্য এবারে পানির উপর ভেসে দ্রুত নিরাপদস্থানে সরে পড়ার

পালা। ৪৫ মিনিট পর মাইন বিস্ফোরিত হবে। এ সময়ের মধ্যে কমাণ্ডোদের মোহনার বাঁক ঘুরে পৌঁছতে হবে নিরাপদ স্থানে। কিন্তু ইতিমধ্যে মেঘনার মাহনায় কমাণ্ডোদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে নতুন বিপদ। মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় যেপথে তাঁদের পালাতে হবে সেখানে খুলনা থেকে এসে নোঙ্গর ফেলেছে রকেট সার্ভিসের জাহাজ 'গাজী'। জাহাজে অসংখ্য পাকিস্তানী সৈন্য আর সাথে গোলাবারুদ। গাজী তীক্ষ্ম আলো ছড়িয়ে রেখেছে চারদিকে। কমাণ্ডোদের এখন গাজী জাহাজের সামনে দিয়েই পালাতে হবে। অন্যপথ নেই। কোনভাবে দেখে ফেললে নেমে আসবে ঝাঁক ঝাঁক গুলি। সকলে অপেক্ষা করতে থাকেন একটি বার্জের আড়ালে। কিন্তু সময় শেষ হযে আসছে। একটু পরেই মাইনের বিস্ফোরণ শুরু হবে। কথা বলার সুযোগ নেই। এর মাঝে একজন কমাণ্ডো মুখের উপর কচুরিপানা ধরে সাঁতরে পালিয়ে যান। সাথে সাথে অন্যরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সার্চলাইটের আলোর মাঝেই সাঁতরাতে শুরু করেন এবং কোন রকমে তাঁরা শত্রু সৈন্যর দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে নদীর কিনার বেয়ে সাঁতার কেটে নিরাপদ দুরত্বে বহরী বাজার চলে আসেন। কমাণ্ডোদের সাতাঁরের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ শরীর পানির নিচে ডুবিয়ে চিৎ সাঁতার কাটা। এসময় কেবল নাক এবং চোখ পানির উপরে থাকতো। যেজন্য অতি নিকট দিয়ে সাঁতার কেটে গেলেও অন্যের চোখেও পড়ার কথা নয়। কোনরকম শব্দ ছাড়া পায়ের সাহায্যে সাঁতার কাটতে হতো। এভাবে স্রোতের অনুকুলে ঘন্টায় ৬/৭ মাইল সাঁতরানো সম্ভব।

এদিকে মাইনের বিষ্ফোরন শুরু হলে শত্রু সৈন্যের প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দে অদূরে অবস্থানরত উদ্ধারকারীদল নৌকা নিয়ে সরে পড়ে। শফিকুর রহমান নামের একজন কমাণ্ডো উদ্ধারকারী দলের দায়িত্বে ছিলেন। মাইনের লাগাতার বিষ্ফোরণে পাকিস্তানী সৈন্যরা ডাকাতিয়ার দু'পাড় থেকেই একটানা গুলি বর্ষন করে। যদিও কমাণ্ডোরা তখন শত্রুদের নাগালের বাইরে। কমাণ্ডোদের উদ্ধারকারী নৌকা স্থান ত্যাগ করায় তাঁদের এখান থেকে সরে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সকলে মেঘনার তীরে উঠে পাট কিংবা ধান ক্ষেতে লুকিয়ে থাকেন। ততক্ষণে পাকিস্তানী গানবোট অবিরাম গুলি বর্ষন করে খুজে ফিরছে চারিদিক। পূবের আকাশও ফর্সা হয়ে উঠেছে। কমাণ্ডোরা যখন একত্রিত হবার চেষ্টারত তখন গ্রামের লোকজন তাদের খালি গায়ে এবং কেবল জাঙ্গিয়া পরিহিত অবস্থায়

দেখে ভয় ও মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তাদেরকে ডাকাত সন্দেহে দা, বটি, কুড়াল, বর্ষা নিয়ে আক্রমণে উদ্যত হয়। কমাণ্ডোরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, এমুহুর্তে রক্ষা পাবার জন্য তারা সাথের ফিনস উচু করে গ্রাম বাসীর প্রতি ভয় দেখান যে, সামনে এগুলে গুলি করা হবে। জাঙ্গিয়া পরিহিত মানুষগুলির হাতের জিনিষটি কি, তা-তাদের ধারণা ছিলনা, ফলে গ্রামবাসী ভয়ে দূরে সরে যায়। কিন্তু পরিবেশ তখনও বিপদ সংকুল। কমাণ্ডোরাও একত্রিত হতে পারেনি। কয়েকজন কমাণ্ডো একটি বাড়ীর সামনে রক্ষিত মাছ ধরার নৌকা জোর পূর্বক নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। বাকীরা কোথায় তখন ভাবার অবকাশ নেই। নৌকায় কয়েক জন কমাণ্ডো জেলেদের পোশাক পরে বৈঠা বেয়ে দাসাদী গ্রামে চলে আসেন। ১৬ আগষ্ট সন্ধ্যা নাগাদ সকল কমাণ্ডো দাসাদী গ্রামে শাহ্জাহান কবিরের পিতা, ইব্রাহিম মাষ্টার সাহেবের বাড়ীতে পুনঃ একত্রিত হন।

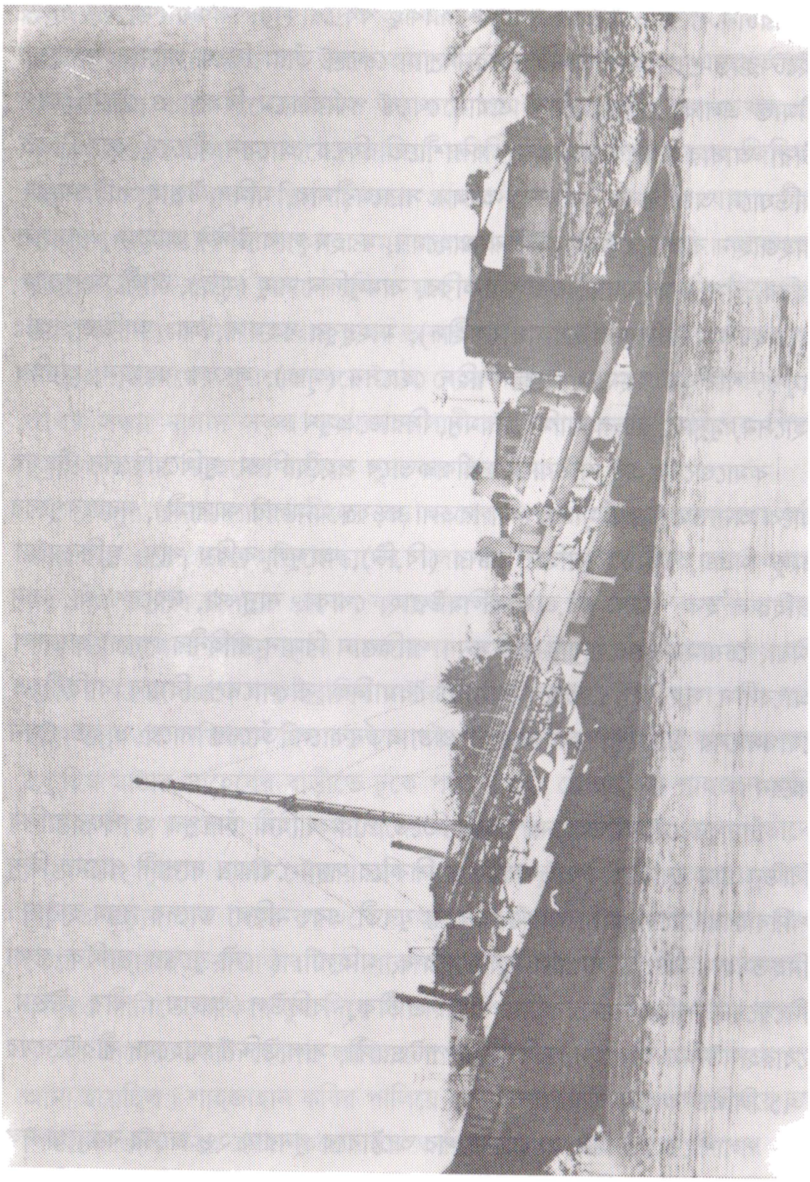
চাঁদপুর বন্দরে পাকিস্তানীদের বড় ধরণের বিপর্যয় ঘটায়, হানাদাররা অতি ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের পালানোর সব পথ বন্ধ করে দেয়। গ্রামের পর গ্রাম তল্লাসি চালাতে থাকে। কমাণ্ডোরা পালাতে না পেরে দাসাদী গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামে ও বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকেন। কিন্তু তার পরও রক্ষা হয়নি। শত্রুরা জেনে যায় ইব্রাহিম মাষ্টার বি,টি সাহেবের দুই ছেলে এবং নাতি মমিনউল্লা এই অভিযানে ছিল। ১৭ আগষ্ট শত্রুবাহিনী সম্পূর্ণ গ্রাম অবরুদ্ধ করে ইব্রাহিম মাষ্টার সাহেবের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। এবং গ্রেপ্তার হয় শাহজান কবির ও তাঁর পিতা। শত্রুরা অন্য কমাণ্ডোদের গ্রামের পর গ্রাম খুজতে থাকে। তাঁদের পিতা এবং পুত্রকে একটি নৌকায় রশি দিয়ে বেঁধে দুইজন শাস্ত্রী পাহারায় থাকে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে অত্যন্ত কৌশলে দাঁত দিয়ে হাতের বাধন কেটে পাহারারত রাজাকারটিকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিয়ে শাহজাহান কবিরও পানিতে লাফিয়ে ডুব দিয়ে সাঁতরিয়ে পালিয়ে যান। একই সাথে বৃন্দাবন নামের গ্রামের একটি ছেলেও লাফিয়ে পালায়। তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে ধরে আনা হয়েছিল। শাহজাহান কবির পালিয়ে যাওয়ায় বর্বররা আরও ক্ষীপ্ত হয়ে তার পিতাকে গুলি করে হত্যা করে। ১৯ তারিখ সন্ধ্যার পর আশে পাশের গ্রামে লুকিয়ে থাকা কমাণ্ডোরা সবাই একত্রিত হন সরকার বাড়ীতে। এখানে রাতের খাবার সেরে পুনরায় ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কারণ নির্দেশ ছিল 'হিট

এণ্ড রিটার্ন ব্যাক"। সুতরাং পূর্বানুরুপে কিছু পথ নৌকায়, আবার কিছু পথ পায়ে হেঁটে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আগরতলার বিশ্রাম কেন্দ্রে তাঁরা ফিরে আসেন ভারতের সীমান্ত এলাকা সোনামোড়া। এখান থেকে পর্যায়ক্রমে বিমান ও ট্রেনে চেপে তাঁরা আবার প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পলাশীতে ফিরে আসেন বীরের বেশে।এই অভিযানে অংশ নেন– বদিউল আলম সাবমেরীনার, মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী, শাহজাহান কবির, বোরহানউদ্দিন আহমেদ, মরহুম সালাউদ্দিন আহ্মদ, শামসুল কবির, এস,এ মজুমদার, ফজলুল কবির, সামসুদ্দিন সামু (মৃত), আলী আশরাফ, আঃ হাকিম, রফিকুল ইসলাম (শহীদ), মাহবুবুর রহমান, আঃ আজিজ, আঃ গফুর, শফিকুর রহমান, হাজী শহিদ হোসেন (মৃত), লূৎফর রহমান, আমির হোসেন, মুন্নাফ, রুহুল আমিন, সামসু, সিরাজ প্রমুখ।

কমাণ্ডোদের এই অভিযানে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন তাঁদের মাঝে অন্যতম স্টুয়ার্ড মুজিব (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী), নরায়নপুরের বাচ্চু মিঞা, শহীদ ইব্রাহিম মাষ্টার (বি,টি), আব্দুল করিম খান, মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠান, বি,এম কলিমউল্লাহ, খোকা, নান্নু খা, দরবেশ খাঁ, নানু মিয়া, চেয়াম্যান দেলোয়ার হোসেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সদস্য জয়নাল আবেদীন সহ অপর ৩জন বাঙালি বৈমানিক বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে কমাণ্ডোদের প্রত্যাবর্তনকালে তাঁদের সাথে ভারত গমন করেন।

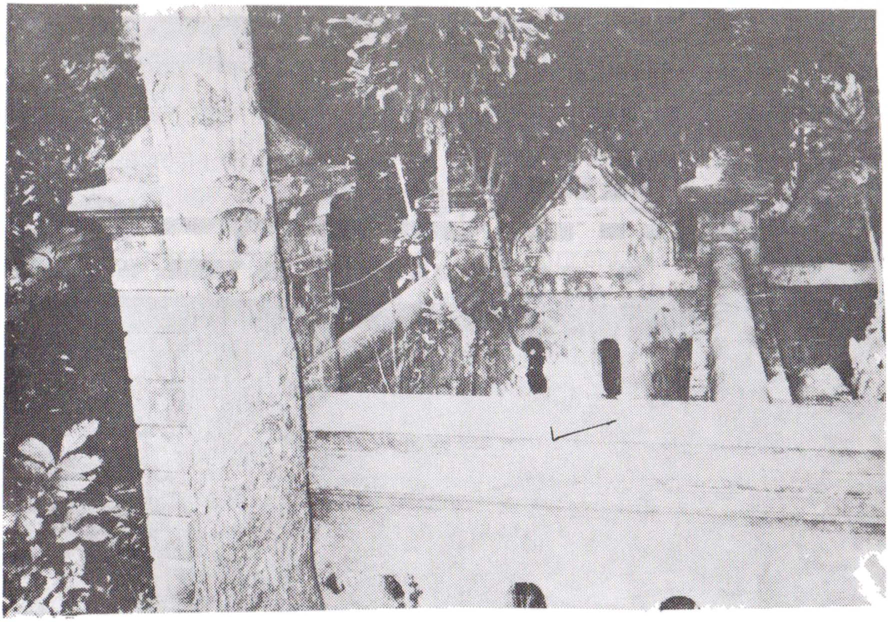
চাঁদপুর নৌ-অভিযানের ফলশ্রুতিতে পাক-বাহিনী চাঁদপুর ও সফরমালির বিভিন্ন গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। বর্বরতার শিকারে সম্ভ্রম খোয়ায় দাসাদী গ্রামের হিন্দু পরিবারের মেয়ে ঝর্ণা। আরও অসংখ্য যুবতী এবং মহিলা তাদের সম্ভ্রম হারান। নিহত হন অসংখ্য বাঙালি যুবক-পুরুষ, মহিলা। (নৌ-যুদ্ধের সার্বিক তথ্য দিয়েছেন শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, বদিউল আলম। বীর উত্তম, বোরহানউদ্দিন আহমেদ, মমিনউল্লা পাটওয়ারী, সালাউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তমের '৭১ লিখিত কাগজ পত্র থেকে।

পলাশীতে ১০ দিন অবস্থানের পর অক্টোবরে পুনরায় ২৬ জনের কমাণ্ডো দল যাত্রা করেন চাঁদপুর বন্দর আক্রমণের উদ্দেশ্যে। এই যাত্রায় দলনেতা ছিলেন সাবমেরিনার এ,ইউ শেখ, ফ্রান্স থেকে পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগকারী সাবমেরীনার।

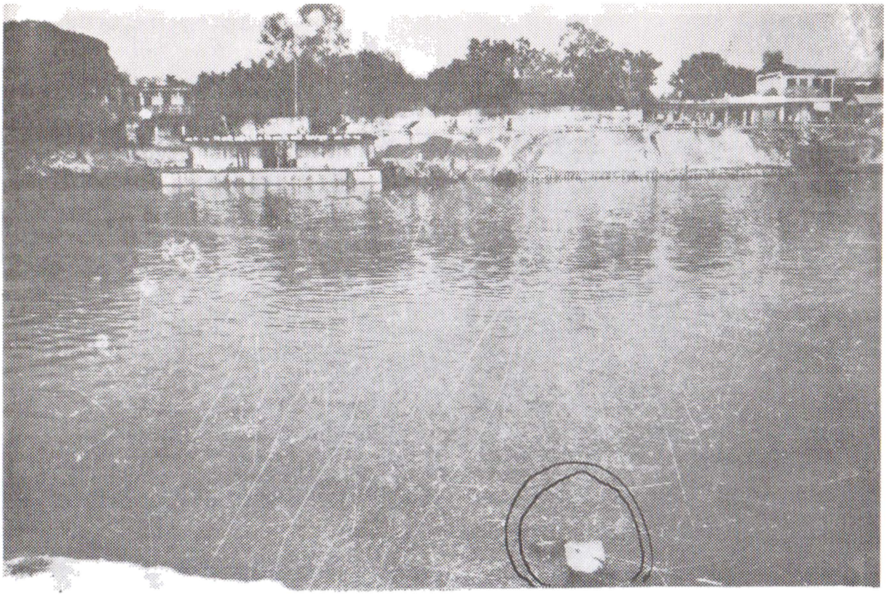


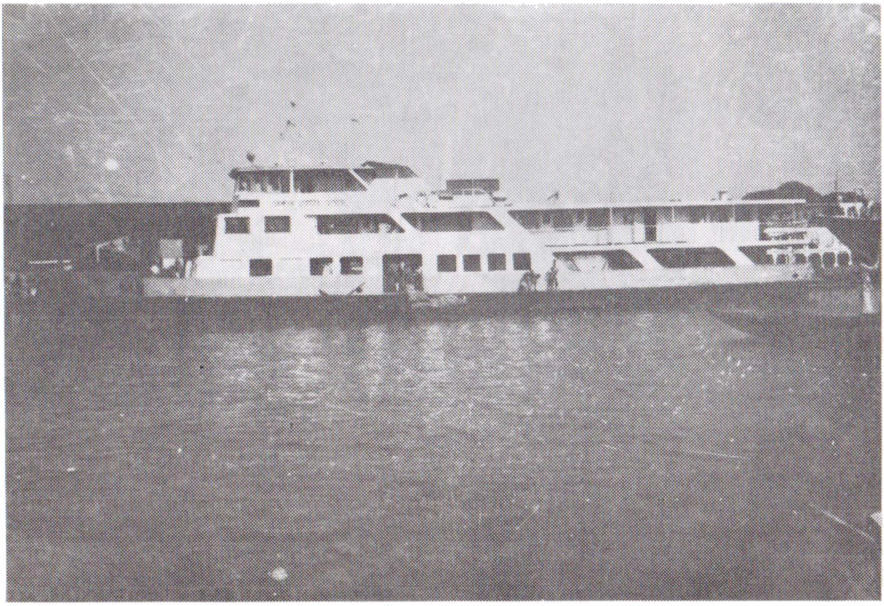
কমাণ্ডো অভিযানে ধ্বংস প্রাপ্ত সমুদ্রগামী জাহাজ





শহীদ বি.টি. সাহেবের কবর (×) চিহ্ন স্থানে বি.টি সাহেবকে গুলি করে হত্যা করা হয়।





চাঁদপুর বন্দরে কমাণ্ডোদের দুঃসাহসী অভিযানে ধ্বংস লোরেম জাহাজের মাস্তুলের দৃশ্য নীচে এম.ভি লিলি '৭১ সালে কমাণ্ডোরা এ জাহাজটি মাইনদ্বারা ডুবিয়ে দেয়। স্বাধীনতা উত্তর মেরামত করে পুনরায় চলাচল উপযোগী করা হয়।

১৬ আগষ্ট সারাদেশে বন্দরে ব্যাপক সংখ্যক জাহাজ ডুবীর ফলে পাকিস্তানী প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয় যে, একজন কমাণ্ডোকে ধরিয়ে দিলে তাকে দশ হাজার টাকা পুরুস্কার দেয়া হবে। ত্রাস সৃষ্টি এবং জনসাধারণ যেনো কমাণ্ডোদের সাহায্য না করে সে জন্যই এই ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী কমাণ্ডোদের কোন ভাবেই রুখতে পারেনি পাক হানাদার বাহিনী। তাই অব্যাহত থাকে নৌ-কমাণ্ডো অভিযান, চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তায়, সাবমেরিনার শেখ আমানউল্লার নেতৃত্বে ২৬ জন কমাণ্ডো পলাশী ক্যাম্প থেকে একই পথে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। প্রস্তুতি এবং সরঞ্জাম পূর্বের অনুরূপ। দূর্গম পথ অতিক্রম করে কমাণ্ডোদল মধ্য অক্টোবরে চাঁদপুরের দক্ষিণে বালিয়াগ্রাম ও আখন হাটে পৌছে বিভিন্ন বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আগষ্ট মাসের বিপর্যয়ের কারণে এবার তাঁদের আশ্রয়স্থল পরিবর্তন করতে হয়। এবারের যুদ্ধাভিযান আগের মতো ব্যাপক কিংবা পরিকল্পনা মাফিক সংঘটিত হয়নি। দ্বিতীয় এবং পরবর্তী যতগুলি অভিযান পরিচালিত হয়েছে সবগুলিই দলনেতা কিংবা সহ নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনায়। তখন কোন নির্ধারিত সময় এবং এলাকা যেমন বেঁধে দেয়া হয়নি, তেমনিভাবে অভিযানও ছিল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। এখানে চাঁদপুর এলাকায় পরবর্তী যুদ্ধ গুলির বর্ণনা দেয়া হলো।

(দুই)

২৬ অক্টোবর চাঁদপুরে অবস্থানকারী নৌ-কমাণ্ডোর এই দল দখলদার বাহিনীর জন্য দুইটি খাদ্য-শস্য বাহী নৌকা দখল করে নেন এবং ৩১০০ মন খাদ্য নিলামে বিক্রী করে অর্থ স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির হাতে অর্পন করেনকমাণ্ডোদল কয়েকজন স্থানীয় গেরিলা ও সংগ্রাম কমিটির সদস্য সমন্বযে হাইমচরের সন্নিকটে এসে নৌকা দুটিকে আটক করেন। নৌকাগুলি পকাসৈন্যদের জন্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে রায়পুর যাচ্ছিল। এর নেতৃত্ব দেন বোরহান উদ্দিন আহম্মদ, মমিনউল্লা পাটওয়ারী, শাহজাহান কবির, সেলিম উল্লাহ, ফজলুল কবির, মাহবুবুর রহমান, সালাউদ্দিন আহমদ প্রমুখ কমাণ্ডোবৃন্দ। দ্বিতীয় অভিযানে যশোর ও ফরিদপুরের আরও দু'জন তরুণ কমাণ্ডো অরুনভট্টাচার্য্য ও গাজী আমিনকে চাঁদপুর পাঠানো হয়।

(তিন)

২৯ অক্টোবর এই দলের সদস্য ফজলুল কবির ও মমিনউল্লা পাটওয়ারী এবং স্থানীয় বাসিন্দা নান্নু, (তিনি কমাণ্ডোদের প্রথম অভিযানেও সাহসের সাথে সহযোগীতা করেছিলেন।) তাকে নিয়ে বেলা ১২টার সময় একসপ্লোসিভের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চাঁদপুরের বার্মা ইষ্টার্ণ তেলের ডিপোর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেন। ফলে হাজার হাজার গ্যালন তেল পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আগুনের লেলিহানে টহলরত কয়েকজন পাকসেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত ও মারাত্মক ভাবে আহত হয়। প্রতিটি অভিযান সফল করতে কমাণ্ডোদের যে দুঃসাহসীকতার পরিচয় দিতে হয় তা ছিল অকল্পনীয় মৃত্যু ভয় তাদের ছিলনা, জীবনের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হয়। অত্র এলাকায় কমাণ্ডোদের জন্য সবচেয়ে প্রতিকূল ছিল এলাকায় অবস্থান গ্রহণ। চারিদিকে শত্রুবেষ্ঠিত অবস্থায়, নিরাপত্তাহীন ভাবে অবস্থান গ্রহণ, যুদ্ধ সামগ্রী রাখা এবং সাথে সাথে অভিযান চালানো সত্যিই দুঃসাধ্য ছিল । চাঁদপুর অভিযানে নৌ-কমাণ্ডোরা (যুদ্ধের সময়ে) নিরাপত্তা প্রদান এবং এলাকায় অবস্থানের ব্যাপারে ব্যাপক সাহায্য পাননি। নৌ-যোদ্ধাদের সবচেয়ে দূর্বলতা ছিল যে, এই দলের কাছে ২/১ টি ষ্টেনগান ভিন্ন ভারী কোন অস্ত্র দেয়া হয়নি। কমাণ্ডোরা অস্ত্রও চালাতে জানতোনা। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ-যোদ্ধাদের নিরাপত্তা প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু বরিশাল এবং চাঁদপুরে এর ব্যতিক্রম ঘটে। অন্য এলাকায় এমনটি ঘটেনি। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা কমাণ্ডোদের অপারেশন সফল করার জন্র সার্বিক সাহায্য করেছিলেন।

(চার)

৩০ অক্টোবর চাঁদপুর ডাকাতিয়া নদীতে, লণ্ডন ঘাটে, আমেরিকান পতাকা বাহী জাহাজ "এম,ভি লোরেন" দখলদার বাহিনীর জন্য খাদ্য ও সমরাস্ত্র বহণ করে নোঙর ফেলেছিল। দলনেতাকে এই জাহাজের অবস্থানের কথা জানানো হলে তিনি সেদিন রাতেই ওই জাহাজ আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐদিন রাতে ১৫/১৬ জনের একদল কমাণ্ডো লিমপেট মাইন সহ লণ্ডন ঘাটের বিপরীত পারে ডব্লিউ রহমান জুট মিলের পাশে এসে অবস্থান নেন। এই সময়ে বন্দর

এলাকায় শত্রুবাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার ছিল। বন্দর থেকে সার্বক্ষণিক সার্চ লাইটের আলো ফেলে রাখা হতো নদী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায়। প্রতিটি জাহাজের গায়ে ও আলো জ্বলতো। নদীতে পাক নৌ-বাহিনীর গানবোট অনবরত টহল দিতো। এরই মাঝে জাহাজ আক্রমণের জন্য মাইন বুকে নদীতে নেমে পড়েন কমাণ্ডো মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী, আঃ হাকিম সহ তিনজন। কমাণ্ডো শাহজাহান কবির, সালাউদ্দিন আহমেদ, বোরহানউদ্দিন আহমেদ, সামসুল কবির, আব্দুল মান্নান, শহিদ হোসেন, মাহবুবুর রহমান, ফজলুল কবির, গাজী আমিন, অরুন ভট্টাচার্য, প্রমুখ কমাণ্ডোবৃন্দ ডব্লিউ রহমান জুট মিলের দেয়াল ঘেঁষে হালকা অস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। বুকে মাইন নিয়ে কমাণ্ডো তিনজন পানিতে কচুরিপানার আড়াল করে অতি সর্তকতার সাথে জাহাজে (মাইন) লাগিয়ে কিনারে ফিরে আসেন। লণ্ডন ঘাটে '৭১ এর ডুবন্ত মার্কিন জাহাজ 'এম,ভি লোরেন" আজও নৌ-কমাণ্ডোদের দূর্ধর্ষ অভিযানের স্মৃতি বহন করে চলেছে। স্বাধীনতা উত্তর জাহাজটি অপসারণ করা হয়নি। এই জাহাজটিকে উত্তোলন করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে যে কোন যাদুঘরে স্থাপন করা যেতে পারে। কমাণ্ডোদের প্রতিটি অভিযানের বর্ণনা কিংবা অভিযানের ধরণ একই রকম মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। স্থান ও অবস্থান ভেদে কমাণ্ডোদের সুচিন্তিতভাবে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এক-একটি অভিযান সফল করতে হয়েছিল।

(পাঁচ)

৩০ অক্টোবর এর কয়েকদিন পূর্বে চাঁদপুরের ভাটিতে নীলকমলে অবস্থানরত গানবোটে মাইন লাগিয়ে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর গানবোট ডুবিয়ে দেন। প্রতিকুল পরিবেশে শত্রু গানবোর্ট ডোবানোর জন্য কমাণ্ডো শহিদ হোসেন (মৃতু), সালাহউদ্দিন আহমেদ (মৃতু) ও সামসুল কবির প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী স্থান থেকে হাতে হাত ধরে সাঁতরিয়ে জাহাজের নিকটে পৌছেন এবং সাথে গানবোটে মাইন লাগিয়ে আবার তাঁরা ভাটিতে পালিয়ে যান। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং বহু পাকসেনা গানবোটে অবস্থান করছিল। হানাদার বাহিনীর জন্য এই আঘাত ছিল চরম বিপর্যয়ের। কিন্তু অতীব সতর্কাবস্থায় থেকেও তারা কখনই দুর্ধর্ষ নৌ-কমাণ্ডোদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। নৌ-কমাণ্ডোরা এ সময় সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় মরিয়া হয়ে উঠেন। তাঁরা চাঁদপুর লাকসাম রেলপথে একটি রেল ইঞ্জিন এবং সড়ক পথের একটি কালভার্ট ও বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেন। এ সকল অভিযানে অতি অল্প সংখ্যক কমাণ্ডোর

অংশ গ্রহণে যে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়, নিয়মিত বাহিনীর দ্বারা অনুরূপ সাফল্য পেতে হলে শক্তির পরিমাণ যেমন সমান সমান প্রয়োজন ছিল, অনুরূপভাবে যুদ্ধে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণও হতো অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোদের অভিযান পরিকল্পনা ছিল পৃথিবী সেরা।

(ছয়)

লণ্ডন ঘাটে 'এম,ভি লোরেন' ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে রাত্রে কোনো জাহাজ আর বন্দরে কিংবা ডাকাতিয়া নদীতে নোঙর ফেলতোনা। তখন থেকে বার্জ, ষ্টীমার, জাহাজ চাঁদপুর পোর্টের উত্তরে ও দক্ষিণে বেশ দূরে মেঘনা নদীতে রাতে নোঙ্গর করে থাকতো। দলনেতা এই সংবাদ জানার পর কমাণ্ডো গ্রুপকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দুই দিকে পাঠান। একটি দলের নেতৃত্ব দেয়া হয় মমিনউল্লা পাটওয়ারীর উপর (এখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক)। উত্তর অঞ্চলের দায়িত্বে থাকেন শাহ্জাহান কবির। তাঁরা এখলাসপুরে কমাণ্ডো সেলিমউল্লাহ খাঁনদের বাড়ীতে গোপনে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করেন। সালাউদ্দিন, বোরহান, সেলিম, অরুন, হাকিম, বাচ্চু ও শহিদ এই দলে ছিলেন।

নভেম্বরের ২ তারিখ নৌ-কমাণ্ডোরা মেঘনা নদী থেকে পাকিস্তান সৈন্যদের জন্য প্রেরিত ৩৮৫ ব্যারেল সয়াবীন তেল ছিনিয়ে নিয়ে সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে নিলামে বিক্রী করে সমুদয় অর্থ সংগ্রাম কমিটির নিকট জমা দেন। আশ্চর্য জনক হলেও সত্যি যে, চাঁদপুর এলাকায় নিয়োজিত কমাণ্ডোরা সেই সময়েও অফিসের নিয়মানুসারে সকল প্রকার খরচের হিসাব রাখতেন এবং প্রসংশনীয় সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। গর্বের সাথে যাদের কথা বলতে হয়, তাঁরা হলেন কমাণ্ডো মমিনউল্লা পাটওয়ারী, শাহজাহান কবির, ফজলুল কবির, বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সেলিমউল্লা, মাহবুবুর রহমান, শহিদ হোসেন, সালাউদ্দিন আহমেদ, সামসুদ্দিন সামু, সামসুল কবির, বাচ্চু পাটওয়ারী, আঃ হাকিম, অরুন ভট্টাচার্য্য, গাজি আমিন, আঃ আজিজ, লুৎফর রহমান, জহুরুল ইসলাম, মনির হোসেন প্রমূখ।

(সাত)

এম,ভি স্বামী আক্রমণ

৭১ 'র ৪ঠা নভেম্বর বেলা ১২টার সময় নৌ-কমাণ্ডোরা দেখতে পান পাকিস্তান শিপিং করপোরেশনের জাহাজ 'এম.ভি স্বামী' এখলাসপুরের দক্ষিণে আমিরাবাদ এর নিকটে মেঘনা নদীতে অবস্থান করছে। জাহাজে অস্ত্র ও রসদ

বহন করছিল। কমাণ্ডোরা অনুমান করে যে, জাহাজটি বেশিক্ষণ অপেক্ষা বরবেনা, সুতরাং তাঁরা প্রকাশ্য দীবালোকেই এই জাহাজ ধ্বংস করার সংকল্প গ্রহণ করেন। মাইন নিয়ে প্রস্তুত হন সেলিম, সালাহউদ্দিন ও শাহ্জাহান কবির। তারা ৩জন কমাণ্ডো একটি বড় ছইওয়ালা-পালতোলা নৌকায় চড়েবসেন। সেলিম নৌকার ছই এর উপর। আর ছই এর ভিতর অপেক্ষমান অপর দু'জন কমাণ্ডো। তাদের পায়ে ফিন্স আটা বুকে মাইন, কোমরে বিষাক্ত ড্যাগার। স্রোতের অনুকুলে নৌকা জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু দূরবর্তী থেকে নৌকার পিছন দিয়ে সন্তর্পনে দুজন কমাণ্ডো পানিতে নেমে পড়েন। দিনে নদীতে তখন অসংখ্য নৌকা। সব নৌকাই পালতোলা। জেলে নৌকাগুলি ও নদীতে মাছ ধরছে। সেদিনের ছোট কমাণ্ডো সেলিম, পাকিস্তান সৈন্যদের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবন্ধ রাখার জন্য নৌকার ছইয়ের উপর দাড়িয়ে পাগলের সাজে নেচে-নেচে উচ্চকণ্ঠে বেসুরো গান গেয়ে চলেছে। পাক বাহিনী উৎফুল্ল চিত্তে সেলিমের পাগলামী অবলোকন করছে। এর মাঝে অকুতোভয় দুই কমাণ্ডো সালাউদ্দিন এবং শাহ্জাহান কবির কচুরীপানা আড়াল করে সাঁতরিয়ে জাহাজের গায়ে পৌছেন। অতি ক্ষীপ্রতার সাথে জাহাজে মাইন লাগিয়ে তাঁরা যখন সাঁতরিয়ে দূরে চলে যেতে চেষ্টা করছেন টহলরত সৈন্যরা তাঁদের দেখে ফেলে এবং উর্দু ভাষাতে গালি দিয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কমাণ্ডো দু'জন জানান নৌকা ডুবিতে তাদের পরিবারের সদস্যদের সলিল সমাধি ঘটেছে, তাঁরা উদ্ধারের চেষ্টা করছে। শাস্ত্রীরা কমাণ্ডোদের কথা বিশ্বাস করে। এর মাঝে তাঁরা দ্রুত সাঁতরিয়ে স্থান ত্যাগ করতে থাকলে পাকিস্তান সৈন্যদের সন্দেহ হয় এবং তাঁদের প্রতি গুলি বর্ষন করে। সেলিমউল্লা খান নৌকা থেকে নেমে অদূরে চরে দাঁড়িয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পাকিস্তান সৈন্যদের গুলির জবাবে সেও তাঁর ক্ষুদ্র ষ্টেনগান থেকে পাকিস্তান সৈন্যদের প্রতি গুলি ছোড়েন। এরই মধ্যে জাহাজের গায়ে স্থাপিত মাইন দ'ুটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে জাহাজের সৈন্যরা গুলি থামিয়ে প্রাণভয়ে চিৎকার এবং উদ্ধারের জন্য বিপদ সংকেত বাজাতে থাকে। মুহূর্তে নদীতে মাছ ধরার জন্য নৌকাগুলি স্থান ত্যাগ করে। নদী জনশূন্য হয়ে পড়ে। কমাণ্ডো শাহজাহান কবির ও সালাহউদ্দিন সাঁতরিয়ে কিনারে উঠে ক্রলিং করে সেলিমের নিকট চলে আসেন। প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে তারা পোশাক বদলিয়ে

গ্রামের মানুষের বেশ ধারণ করেন। এম,ভি স্বামী যখন পানির নীচে তলিয়ে যাচ্ছে তখন রেড ক্রসের একটি জাহাজ মতলব কলেরা হাসপাতালের জন্য ঔষধ নিয়ে এলাকা অতিক্রম করছিল। এম,ভি স্বামীর বিপদ সংকেত শুনে রেডক্রসের জাহাজটি পাকিস্তানী সৈন্যদের উদ্ধার করে কিন্তু তারও বিপদের আশংকায় দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। সেদিন 'এম,ভি স্বামীর" মেঘনা বক্ষে সলিল সমাধি ঘটে।

জাহাজের বিপদ সংকেত পেয়ে পাক বাহিনীর তিনটি গানবোট অল্পক্ষণেই ঘটনাস্থলে পৌছে এবং নির্বিচারে গ্রামের উপর গুলি ও শেল বর্ষন শুরু করে। কমাণ্ডোরা পলায়ন পর গ্রামবাসীদের সাথে মিশে নিরাপদ স্থানে পৌছতে সক্ষম হন।

(আট)

৫ নভেম্বর '৭১। মমিনউল্লাহ পাটওয়ারী তাঁর সহযোদ্ধা ফজলুল কবির (ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা বাহুবল), আঃ মান্নান (বর্তমানে পাগল) আঃ হাকিম, মফিজুর রহমান ও বোরহানউদ্দিন কে সঙ্গে নিয়ে চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে পাকিস্তান সৈন্যের জন্য অস্ত্র ও খাদ্য ভর্তি একটি চীনা পতাকাবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেন। চাঁদপুর নদী বন্দরে নৌ-কমাণ্ডোবৃন্দ যে দুঃসাহসীকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা ইতিহাসে বিরল। এই অভিযানে সহযোগিতা করেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান ও লোকমান হাওলাদার।

(চাঁদপুর যুদ্ধের তথ্য দিয়েছেন ঃ বোরহানউদ্দিন আহমদ, মমিনউল্লা পাটওয়ারী বীর প্রতীক, শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, সেরিম উল্লা খান মাহবুবর রহমান মরহুম সালাহউদ্দিন আহমদ বীর উত্তম এর লিখিত তথ্য থেকে।)

(নয়)

৭ নভেম্বর, পাক ওয়াটার ওয়েজের যাত্রীবাহী জাহাজ 'এ,ভি, লিলি' চাঁদপুরে যাত্রী নামিয়ে রাত্রি যাপন এবং নিরাপদে কাটানোর জন্য এখলাসপুর বাজারের নিকট খালের মুখে নোঙ্গর ফেলে। নৌ-কমাণ্ডোরা সেই রাত্রেই 'এম,ভি লিলি' আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু কিভাবে যেনো জাহাজের ক্রুরা জাহাজ আক্রমণের কথা জানতে পেরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মোহনপুরের অপর পারে চরের নিকট নোঙ্গর ফেলে। কমাণ্ডোরা তখন অন্য একটি ছোট মাছ ধরার ট্রলার হাইজ্যাক করে 'লিলি', জাহাজটির অবস্থান খুজতে থাকেন এবং একসময়

অবস্থান নির্ণয়ে সক্ষম হন। কমাণ্ডোরা সরাসরি জাহাজের নিকট না গিয়ে অদূরবর্তীতে ট্রলার রেখে কমাণ্ডো সেলিমউল্লাহ খাঁন ও সামসুল কবিরকে মাইন নিয়ে পানিতে নামিয়ে দেন। উভয়ে দ্রুত কিন্তু সর্ন্তপনে সাঁতরিয়ে জাহাজের গায়ে পৌছে লিমপেট মাইন স্থাপন করেন। অপর কমাণ্ডো বোরহান উদ্দিন আহমেদ (জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা), সালাহউদ্দিন আহ্‌মেদ (DAD, BDR), শাহজাহান কবির এবং স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সদস্য কবির ও খলিলউল্লা ষ্টেনগান ও রাইফেলসহ মাছ ধরার ট্রলারে থেকে অপারেশনে অংশগ্রহণকারী কমাণ্ডোকে উদ্ধারের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। কমাণ্ডো সেলিম ও সামসুল কবির মাইন স্থাপন করে নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দে মাইনের বিস্ফোরণ ঘটে এবং 'এম.ভি লিলি' জাহাজ দ্রুত চালিয়ে পাশ্ববর্তী চরে লাগিয়ে ক্রুসহ নিরাপত্তা রক্ষিরা পালিয়ে যায়। 'লিলি' অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় নদীর কিনারে পরিত্যাক্ত অবস্থায় থাকে। পরদিন সকালে কমাণ্ডো শামসুল কবির, সেলিম, বোরহান পুনরায় আর একটি মাইন লাগিয়ে জাহাটিকে ডুবিয়ে দেন। 'এম,ভি লিলি' থেকে কমাণ্ডোরা জৈষ্ঠ মধু, চিরতার বস্তা, ইউসুফ গুলের ভূষি এবং বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করে পুনরায় জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেন। তাঁরা জাহাজের ভিতরে দুজন পাক-মিলিশিয়ার লাশ খুজে পান। কমাণ্ডোদল উদ্ধারকৃত সকল মালামাল সংগ্রাম কমিটির হাতে হস্তান্তর করেন। পাক-ওয়াটার ওয়েজের জাহাজ 'লিলি' মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক-বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে মাঝে মাঝে ঢাকা থেকে চাঁদপুর যাওয়া আসা করতো। কমাণ্ডোরা জাহাজ কতৃপক্ষকে সৈন্য বহন না করার জন্য অনুরোধ জানালেও তারা কর্ণপাত করেনি। 'লিলি' জাহাজের সলিল সমাধির মাধ্যমে তার অবসান হয়। যদিও স্বাধীনতা উত্তর এই জাহাজকে উত্তোলন করে পুনরায় সচল করা হয়।

(দশ)

নদীপথে বিপর্যয় দেখে পাক সেনারা বিকল্প হিসাবে রেলপথের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠে এবং রেল লাইনকে পাহারা দেবার জন্য সার্বক্ষণিক একটি ইঞ্জিন ও একটি বগী পাক সৈন্যসহ চাঁদপুর থেকে লাকসাম যাতায়াত করতো।

নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ মমিনউল্লাহ পাটওয়ারী, আঃ হাকিম ও কয়েকজন কমাণ্ডো সংগ্রাম কমিটির সদস্য মফিজ পাটওয়ারীকে সংগে নিয়ে চাঁদপুর এবং সাহাতলীর মাঝামাঝি স্থানে রেলপথ ও একটি রেলের বগী এক্সপ্লোসিফ দিয়ে

উড়িয়ে দেন। একই দিনে চাঁদপুরের টেলিফোন লাইনের পিলার গুলিও বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। নৌ-কমাণ্ডো দলের এ,কে,এম, মান্নান, সিরাজুল ইসলাম সহ কয়েকজন এই অভিযানে অংশ নেন। এর ফলে চাঁদপুরের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তা ঠিক করা সম্ভব হয়নি। এই অভিযানে তিনজন পাকসেনা ও পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়। পাকসেনা ও রাজাকার দল রেল বগীতে অবস্থান করছিল। আশ্চর্যজনক হলো নৌ-কমাণ্ডোদের এই সকল অভিযানে গেরিলা সদস্যবৃন্দের সহযোগিতা চাইলেও তাঁদের মাঝে ২/১ জন ছাড়া সার্বিক ভাবে এগিয়ে আসেননি। ফলে কমাণ্ডোদের আত্মগোপনে থেকে অভিযানে অংশ নিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সহযোগীতা অবিস্মরণীয়।

(এগারো)

১১ নভেম্বর চাঁদপুরের উত্তরে এখলাসপুরের সন্নিকটে মেঘনা বক্ষে পাকিস্তান শিপিং করপোরেশনের জাহাজ 'এম,ভি সোবান' এবং 'এম,ভি গফুর (ফ্লাট)' ২টি মাইনের সাহায্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেন। এই অভিযানে অংশ নেন বোরহানউদ্দিন আহ্মদ, আবুল কাশেম, ফজলুল কবির, সেলিমউল্লাহ, মান্নান এবং কমাণ্ডো সিরাজুল ইসলাম স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়ে কমাণ্ডো শাহজাহান কবির এবং সালাহউদ্দিন আহমেদ অপারেশনে অংশ গ্রহণকারী কমাণ্ডোদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। ধ্বংস প্রাপ্ত দুটি জাহাজ থেকে বহু মালামাল ভেসে যেতে থাকলে কমাণ্ডোরা সেগুলি উদ্ধার করে বিক্রয় লব্ধ টাকা সংগ্রাম কমিটির নিকট জমা রাখেন।

(বারো)

১৩ নভেম্বর চাঁদপুরের দক্ষিণে অবস্থানকারী কমাণ্ডো দল হাইমচরের নিকটে মেঘনা নদীতে পাক বাহিনীর আরও একটি জাহাজ ডুবিয়ে দেন। সেই অভিযানে অংশ নেন কমাণ্ডো শহিদ হোসেন, শফিকুর রহমান সহ কয়েকজন কমাণ্ডো। স্থানীয় আবুল খায়ের অভিযানে সার্বিক সহযোগীতা করেন। কমাণ্ডো বাচ্চু পাটওয়ারী চাঁদপুর যুদ্ধের সকল সংবাদ আগরতলা ক্যাম্পে নিয়ে যেতেন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সকল রসদ এবং মাইন আগরতলা থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত নিয়ে আসতেন। এই কাজটি যেন ছিল ঝুকি বহুল অনুরূপ ভাবে দুঃসাহসিকও বটে। যুদ্ধের মাঝে ভারত থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত শত্রুর মাঝ দিয়ে এত ভারী মাইন এক্সপ্লোসিভ, রসদ বয়ে আনা অতি মাত্রায় ঝুঁকি পূর্ণ ছিল। নৌ-কমাণ্ডোদের

একেরপর এক অভিযানে পাকিস্তানী বাহিনী ভিত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ডিসেম্বরের শুরুতে তারা চাঁদপুরের অবস্থান ত্যাগ করে ঢাকার পথে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

চাঁদপুর নৌ-কমাণ্ডো অভিযানে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মাঝে অন্যতম হলেনঃ বালিয়ার ছিটু শেখ, রঘুনাথপুরের খোকা, দরবেশ, নান্নুখান, আবুল খায়ের, মফিজ পাটওয়ারী, এখলাসপুরের কবির, খলিল উল্লাহ, রেয়াজউদ্দিন, মফিজুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে খালেক, মনসুর, জহির, হানিফ পাটওয়ারী, মহিউদ্দিন, মমিনখাঁন, কিরণ, জহির পাঠান, রব সাহেব সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। চাঁদপুরে নৌ-কমাণ্ডোদের আশ্রয় কেন্দ্র ছিল– দাসাদী গ্রামে বি,টি সাহেবের বাড়ী, তালুকদার বাড়ী, সরকার বাড়ী, করিম খাঁর বাড়ী, বালিয়ার ছিটু শেখের বাড়ী, হাশিমপুরের সেলিমউল্লা খানের বাড়ী, এখলাসপুরের রাড়ী বাড়ী, চৌধুরী বাড়ী, পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজউদ্দিন আহ্‌মেদ সাহেবের বাড়ী, সরকার বাড়ী, জহিরাবাজ এর কামাল উকিলের বাড়ী, নাওভাঙ্গার সোনা মিয়া চৌধুরী বাড়ী। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে জাফর সাহেব, প্রফেসর সামসুদ্দিন, এ্যাডভোকেট সিরাজ প্রমুখ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

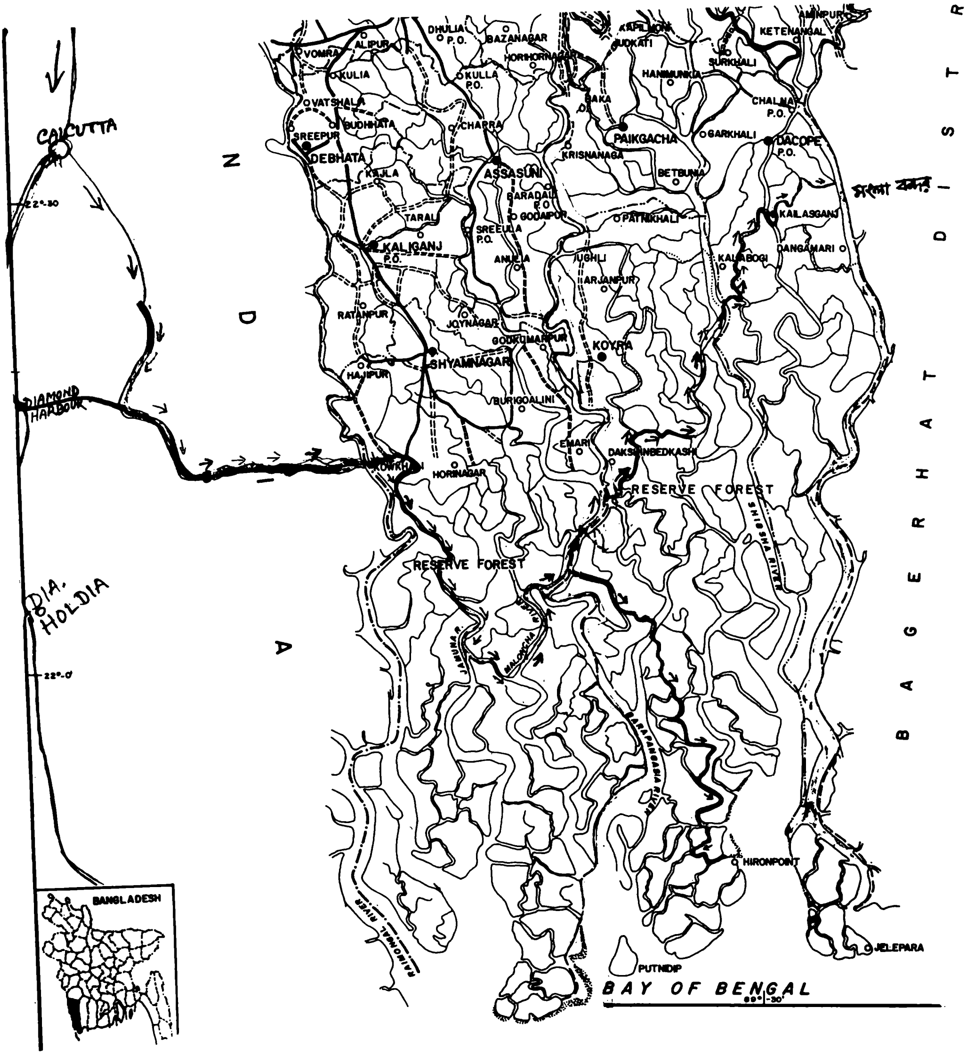
চাঁদপুরের জলসীমায় বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণকারী কমাণ্ডোবৃন্দ হলেন ঃ শাহ্‌জাহান কবির বীর প্রতীক, মমিনউল্লাহ পাটওয়ারী বীর প্রতীক, সালাউদ্দিন আহমেদ বীর উত্তম, আঃ হাকিম বীর প্রতীক, বোরহান উদ্দিন আহ্‌মেদ, সামসুল কবির, ফজলুল কবির, সেলিমউল্লাহ খাঁন, মাহাবুবুর রহমান, বাচ্চু পাটওয়ারী, গাজী আমিন, আঃ হাকিম বীর প্রতীক, সহিদ হোসেন, আমিন-২, অরুন কুমার ভট্টাচার্য্য, সিরাজুল ইসলাম, আঃ মান্নান, তোফায়েল আহমদ, শহীদ রফিকুল ইসলাম, লুৎফর রহমান, আঃ আজিজ সহ কয়েকজন।

মংলা অভিযান

পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে "নৌ-কমাণ্ডো অপারেশন" এক গৌরবজ্জ্বল অনন্য অধ্যায় রচনা করেছে। অর্জন করেছে পৃথিবীময় সুখ্যাতি। ১৫ই আগষ্ট থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত একের পর এক দূর্বার কমাণ্ডো হামলায় অপরাজেয় হিসেবে খ্যাত পাকিস্তানের নৌ-বাহিনী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। সাথে পরাক্রমশালী দখলদার সরকারের ভিতও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। নৌ-কমাণ্ডোদের দুঃসাহসিকতাপূর্ন অভিযান গুলি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে বহিঃবিশ্বে পাকিস্তানের এই প্রচার আসা এবং মিথ্যা প্রামাণিত হয়। কমাণ্ডোদের হামলায় জাহাজ ডুবির সংবাদও তখন বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলি গুরুত্বের সাথে প্রচার করায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডো অপারেশন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ করা হয়েছে ১৫ আগষ্ট মধ্যরাত থেকে বাংলাদেশের জলসীমায় এই অভিযানে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর এবং চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও দাউদকান্দী নদী বন্দরকে আক্রমণ পরিকল্পনার মধ্যে নেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সমগ্র বাংলাদেশের জলসীমায় তা ছড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্যজনক হলো মুক্তিযুদ্ধে এমন বৃহৎ একটি অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের কোন দলিলপত্র কিংবা গ্রন্থে সংরক্ষিত হয়নি। দুইযুগের অধিক সময় মুক্তিযুদ্ধ অতিক্রান্ত। এই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অনেকেই ইতিমধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। স্বাধীনতা উত্তর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জাতির চরম অবহেলায় মুক্তিযোদ্ধারা আশাহত হয়েছেন। আত্মদহনে একসময় ভুলতে চেষ্টা করেছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির কথা। অনেকের কাছে বাঙালি জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঘটনা মহান মুক্তিযুদ্ধ বিস্মৃত প্রায়। এখন চেষ্টা করেও সকলে সব কথা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারেন না। ভুলে গেছেন সহযোদ্ধাদের নাম, তারিখ, যুদ্ধস্থান প্রায় সব।

চরম অবক্ষয়ের মাঝেও নিরাশ না হয়ে মুক্তিযুদ্ধের এই গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়টি তুলে ধরার জন্য যোগাযোগ করেছি শত শত যোদ্ধার সাথে। সাক্ষাৎ

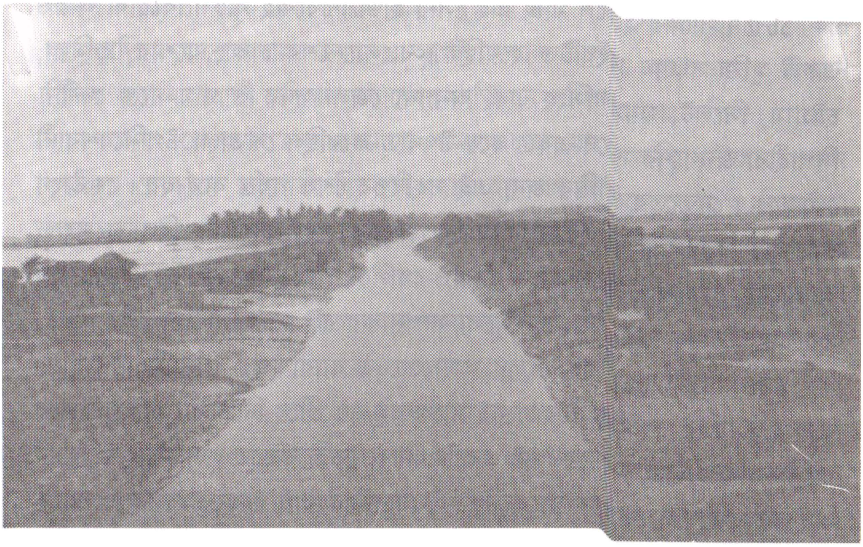


খুলনা এলাকার মানচিত্র। (⟶) চিহ্ন কঃ যাত্রাপথ



সুন্দরবনের গভীর অঞ্চল ধরে নৌকাযোগে কমাণ্ডোদল মংলা বন্দরের উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে।





সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গভীর জঙ্গলে কমাণ্ডোদল আত্মগোপন অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। নীচে সুতারখালি থেকে মংলার উদ্দেশে সরু খাল। যেপথ ধরে কমাণ্ডোর মংলা বন্দর পৌছায়।

করেছি অধিকাংশ কমাণ্ডো যাঁরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। প্রায় সকল নৌ-কমাণ্ডো তাঁর স্মৃতিচারণ পাঠিয়েছেন। তারপরও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে সহযোদ্ধাদের নিকট থেকে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছি। সুতরাং এই গ্রন্থের মূল উপাদান তাঁরাই যুগিয়েছেন যাঁরা একাত্তরে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং পাশে থেকে নৌ-যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

অপারেশন জ্যাকপটের পরিকল্পনায় মংলা বন্দরে অপারেশন করার জন্য সাবমেরিনার মোঃ আহসানউল্লাহ'র অধীনে ৬০ জন কমাণ্ডোর আরও একটি দল পাঠানো হয়। আগষ্ট মাসের ১ তারিখেই প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ৪ তারিখের মধ্যে সবকটি দলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় নেয়া হয়। চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, বন্দরে অভিয়ানের জন্য মনোনীত কমাণ্ডোদের ভারতীয় সমরিক বিমানে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী মেঘালয় আনা হয় এবং মংলা বন্দরের জন্য নির্ধারিত ৬০ জন কমাণ্ডোকে আগষ্টের ৪ তারিখ কলকাতায় ব্যারাকপুর সেনানিবাস আনা হয়।

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ, এই সেনা ছাউনি থেকেই বৃটিশ বিরোধী আরও একটি মুক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। বাংলাদেশের ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং অন্যান্য জেলা সদর ও গ্রাম-গঞ্জে দেশীয় সিপাহীরা জনগণের সাথে একত্র হয়ে উৎখাত করেছিল শ্বেতাংগ উপনিবেশবাদী ফৌজকে। নেতৃত্বের ভ্রান্তির জন্য এই সহবিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। শ্বেতাংগ শাসকের উত্তরসূরী পাকিস্তানী সামরিক জান্তার-বাঙালির প্রতি বিমাতা সূলভ আচরণের প্রতিশোধ নিতে হয়ত তাঁরাও গোপনে শপথ নিয়েছিলেন তাঁদের পূর্ব পুরুষের অসমাপ্ত কাজ যে কোন মূল্যে সম্পন্ন করবেই।

৪ঠা আগষ্ট '৭১, এই দলের কমাণ্ডোদের ব্যারাকপুর সেনানিবাসে রাত্রে আহার সমাপ্তির পর কড়া নিরাপত্তার মাঝে যমুনার তীরে নিয়ে যাওয়া হয় বন্দরে অপেক্ষমান জাহাজ দেখিয়ে স্পষ্ট একটি ধারণা তৈরী করতে। জাহাজে ইঞ্জিনের অবস্থান মালামাল কোথায় থাকে, শত্রু সৈন্যরা কোথায় থাকতে পারে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান নিয়ে তাঁরা ফিরে আসেন। আগের দিন কমাণ্ডো বাহিনীর

অগ্রবর্তী দলগুলিকে একই সেনানিবাস থেকে দমদম বিমানবন্দর হয়ে উড়োজাহাজে চেপে মেঘালয় নিয়ে যাওয়া হয়।

মংলা বন্দরের জন্য নির্ধারিত কমাণ্ডোদের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং পথে খাওয়ার জন্য টিনজাত খাদ্য, ফল, চিড়া, গুড়, চিনি, লবন, দিয়াশলাই সহ টুকিটাকি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই গুছিয়ে নিয়ে ৫ আগষ্ট সকালে খিদিরপুর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে ডায়মন্ড হারবারের কাছাকাছি ক্যানিং আনা হয়। ২০০ বৎসর পূর্বে ক্যাপ্টেন ক্লাইভ তার জাহাজ ও একদল সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে পৌছলে এই বন্দরে প্রথম অবতরণ করেন। সকাল ৮-৩০ মিঃ কমাণ্ডোদল এখানে পৌছেন। ৫ আগষ্ট দিনভর এখানে স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্পেই তাঁরা অবসর নেন। খোলা মাঠ। নদীর কিনারে একটা মনোরম পরিবেশ। নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় সেনা বাহিনীর ৫০ জন সৈনিক সশ্রস্ত্র অবস্থায় কমাণ্ডোদের পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করে। এইখানে সুন্দরবনে পথচলার জন্য বিশেষ ম্যাপ এবং অপারেশনের বিস্তারিত শেষবারের মত বুঝিয়ে দেয়া হয়। নদীতে অপেক্ষমান ছয়টি ছুইযুক্ত দেশী নৌকা। আকারে মোটামুটি বড়ই বলা যায়। নৌকায় পাল টানানোর জন্য বাঁশের মাস্তুল এবং নতুন কাপড়ের পাল। এদিন রাতে সামরিক ট্রাক থেকে মাইন যুদ্ধাস্ত্র এবং খাদ্য সামগ্রী ছয়টি নৌকায় আনুপাতিক হারে তোলা হয়। ৬ আগষ্ট সকাল নয়টায় কমাণ্ডোদের এখানে বিদায় জানান পলাশী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের খ্যতিমান প্রশিক্ষক লেঃ কপিল।

ক্যানিং থেকে যাত্রার প্রাক্কালে কমাণ্ডোদের মাঝে প্রতি নৌকায় ৪জন গেরিলা যোদ্ধাকে সহযাত্রী হিসেবে দেয়া হয় পথ চিনিয়ে নেয়া ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য। গেরিলা দলের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি করে এস,এল,আর এবং ৬টি নৌকার জন্য ছিল ২টি এল,এম,জি। কমাণ্ডোদের প্রতি সাতজনের জন্য ১টি এস,এল,আর প্রত্যেকের জন্য দু'টি গ্রেনেড এবং একটি লিমপেট মাইন। এক ব্যান্ডের ২টি রেডিও একসপ্লোসিভসহ প্রয়োজনীয় বেশ কিছু করটেক্স, ডেটনেটর, এন্টি পার্সোনেল মাইন, সেফটি ফিউজ সাথে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে কমাণ্ডো দলটিকে মূলত বিষ্ফোরক এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। সকল রকম একসপ্লোসিভ, মাইন এবং বিভিন্ন ধরণের ডেটোনেটিং ডিভাইজ গুলির ব্যবহার। একটিভেট ও ইনএকটিভ করার পারদর্শিতা অর্জনে প্রশিক্ষণ

দেয়া হয়। নিরাপত্তা গেরিলাদের মাঝে ছিলেন খুলনার প্রখ্যাত যোদ্ধা খিজির আলী (বীর বিক্রম) আফজাল এবং আনোয়ার। পথ প্রদর্শক হিসেবে কমাণ্ডোদের সাথী হিসেবে অর্ন্তর্ভূক্ত করা হয় বরিশালের এক অসমসাহসী মাঝিকে। লোকটির নাম রয়জুদ্দিন। শিক্ষার আলো তার নিকট পৌছায়নি। চোরাচালান তার এক সময়ে পেশা ছিল। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদিয়ে তিনি উজ্জ্বল দেশপ্রেমের নিদর্শন রেখেছেন। দূর্গম সুন্দর বনের অভ্যন্তরে অসংখ্য অজ্ঞাত পথ তার নখদর্পনে ছিল। এছাড়া সুন্দরবন এলাকায় পাক বাহিনীর সম্ভাব্য অবস্থান সম্বন্ধে ও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। বেটে-খাটো কিন্তু অতুলনীয় সাহসের অধিকারী এই লোকটিকে এজন্য কমাণ্ডো বাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসেবে দেয়া হয়।

৬ আগষ্ট ক্যানিং নদী বন্দর ত্যাগ করে কমাণ্ডো বহর দুপুর বারটায় ক্যানিং থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে মাদ্রা নামের এক ভয়াবহ নৌ-মোহনায় এসে পৌছে বিপর্যয়ের মাঝে পড়েন। ভয়াবহ হলেও আর কোন বিকল্প রাস্তা না থাকায় মাদ্রার ভয়াল মোহনা পাড়ি ধরতে হয়। নদীতে প্রবল স্রোত কমাণ্ডোদের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রবল বাতাস ছিল অনুকূলে। তাই পালের সাহায্যে নৌকা তীরের বেগে এগিয়ে চলে। সব নৌকার সাজ সরঞ্জাম নতুন জিনিষে তৈরী হলেও নদীর বিরাট ঢেউ ও স্রোত এত প্রবল যে, কমাণ্ডোদের নৌকা মোহনা পাড়ি দেয়া বিপদজ্জনক হয়ে উঠে। প্রবল বাতাসের বেগে একটি নৌকার পাল টাঙানোর বাশ মাঝখান থেকে ভেঙ্গে যায়। নৌকাটি এসময় মোহনার মাঝখানে এবং নদীর উভয় তীর এক মাইল দূরে। নদীতে ৮ ফুট থেকে ১০ ফুট উচু এক একটি ঢেউ। প্রবল স্রোতের বিপক্ষে পালছাড়া সামনে এগুনো ছিল অসম্ভব। কমাণ্ডোদের মাঝে আশংকা দেখা দেয় যেকোন মুহুর্তে নৌকাটি তলিয়ে যেতেপারে। সকলে পায়ে ফিনস্ পরে নৌকার ছই এর বাইরে চুপচাপ বসে দোয়া পড়তে থাকেন। নৌকার হাল ধরেছিলেন সবল-সুঠামদেহী কমাণ্ডো মুজিবুর রহমান। বর্তমানে খুলনার বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন অফিসার। শরীরের সমস্ত শক্তিদিয়ে দাঁড় টানছিলেন ইমদাদুল হক এবং খলিলুর রহমান। দীর্ঘ দুই ঘন্টা তুফানের সাথে যুদ্ধ করে একসময় নৌকা পাড়ে পৌছে। কিন্তু সেখানেও কমাণ্ডোদের জন্য নতুন বিপদ অপেক্ষায় ছিল। ৮ ফুট-১০ ফুট উচু ঢেউ নৌকাটিকে তীরে কংক্রীটের বাঁধ এর সাথে আছাড় মারতে পারে। আর এমনটি ঘটলে নৌকায় রাখা মাইনগুলির

বিস্ফোরিত হয়ে লন্ড-ভন্ড ঘটে, এই ভয়ে কমাণ্ডোরা নৌকার কিনারা ধরে পানিতে ঝুলে ঢেউয়ের আছাড় থেকে নৌকাকে রক্ষার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করতে থাকেন। আর ছয়জন নৌকাতে মোটা কাঁছি বেঁধে সামনে টেনে বিকাল চারটায় ছোট একটা নদীতে প্রবেশ করে বিপদ মুক্ত হন। এই এলাকাটি ছিল ভারতেরই ভূমি এবং সুন্দরবনের সন্নিকটে। কমাণ্ডোদের কেউ কখনও কোনদিন এই পথে চলাচল করেননি। যদিও নদীতীরের ক্ষেত খামার ও গ্রাম গুলোতে বাংলাদেশের চির সবুজ ছায়া প্রতিফলিত। রাতের আবছা অন্ধকারে এক সাথে ছয়টি নৌকা সীমান্তে শমসের নগরের পথে এগিয়ে যায়। কমাণ্ডোরা তখনও ভারতের ভূ-খন্ডে। শত্রু সৈন্যের আচমকিত আক্রমণের ভয় নেই, এর পরেও তাঁদের বিরাম ছিলনা। নির্ভীক যোদ্ধারা মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ ভেবে সামনে চলতে থাকেন। সারারাত নৌকা বেয়ে সকালে অপর ভয়াল নদী রায়মঙ্গলের মোহনা পুনরায় পাড়ি ধরেন। এ সময় নদীর অপর পাড়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে লাল টকটকে সূর্য আস্তে আস্তে মাথা উচু করছে। অপূর্ব সে দৃশ্য। কমাণ্ডোরা ভাবছে সৌর জগতের বিশাল গ্রহটিই রক্তিম হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাঁদের অভিবাদন জানাচ্ছে, হাতছানি দিয়ে সামনে ডাকছে।

শ্রাবণে রায় মঙ্গলের ওপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে চলে। বাংলার দামাল কমাণ্ডোরা শক্ত হাতে দাঁড় টেনে মোহনা অতিক্রম শুরু করেন। রায়মঙ্গল নদী-সমুদ্রের খুব কাছাকাছি। তাছাড়া অনেকগুলি নদী এই মোহনায় মিশে এখানকার স্রোতের ক্ষীপ্রতা প্রচণ্ড এবং বড় এলো মোলো। যে কারণে বহু পূর্ব থেকেই এই নদী সম্বন্ধে মাঝি মাল্লারা সাবধান। গাইড নদী সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করলেন। কিন্তু কমাণ্ডোদের এত ভাবার সূযোগ কোথায়? যুদ্ধের নেশায় তাঁদের গায়ের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এই মোহনায় ঢেউ নেই। আছে প্রবল ঘূর্ণায়মান স্রোত। যার সম্মুখে পড়লে কেবল নৌকা নয়-লঞ্চও তলিয়ে যাবে। যুগ-যুগ ধরে শত শত নৌকা-লঞ্চ এই মোহনায় তলিয়ে সাগরে ভেসে গেছে। এই প্রবল স্রোতের মুখে কেবল শরীরের শক্তি দিয়েই পাড়ি দিতে হবে। রায়মঙ্গল নিয়ে কমাণ্ডোদের অনভিজ্ঞতাই তাঁদের সাফল্যে সাহায্য করে। এতকিছু জানা থাকলে এই মোহনা পাড়ি দিতে হয়তো তাঁদের মন কেঁপে উঠতো। এ অভিযাত্রায় প্রত্যক্ষ্যদর্শী হিসেবে দেখেছি নদীর ঘূর্ণায়মান স্রোতের বিপক্ষে চলতে, সেগুন

কাঠের নতুন নৌকাও মড়-মড় শব্দ হচ্ছে। পুরনো হলে নৌকা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। সে এক ভয়াল ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

আজ স্মৃতিতে ভেসে উঠলে মনে হয়, আমাদের আজকের ছেলেরা বানোয়াট রোমাঞ্চকর কাহিনী কিংবা আবিষ্কার, ভ্রমণের গল্প পড়ে শিহরীত হতে ভালবাসে। কিন্তু একাত্তরে বাঙালি যুবকেরাই যে দুঃসাহসী অভিযাত্রা চালিয়েছিলেন, তা যথাযথ ভাবে রূপ দিলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর গ্রন্থে পরিণত হবে। দুপুর দু'টায় এই কমাণ্ডো দল ভারতের সীমান্তে এবং সর্ব দক্ষিণে, হিঙ্গলগঞ্জ সাব সেকটরের নিয়ন্ত্রণে কৈখালি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন। তাঁদের জন্য খাবার পূর্বে প্রস্তুত ছিল এবং তা ছিল যথেষ্ট উপাদেয়। মাংস, মিষ্টি, ভাত। এ মরুভূমির মাঝে ঠান্ডা পানি মুখে তুলে দেয়া, আর কি? কিন্তু এর গোপন রহস্যের কথা আয়োজকবৃন্দ জানতেন। আর জানাছিল অকুতোভয় কমাণ্ডোদের। তাই উপাদেয় খাদ্যও চোখের নোনাজলে স্বাদহারা হয়ে উঠে। একই সাথে পরিবেশও হয়ে উঠে ভারী-গম্ভীর। কারণ এ ছিল অনেকের জন্য অগস্ত যাত্রা। ভারতভূমির শেষ অবস্থান থেকে কমাণ্ডোদলকে বিদায় জানাতে পূর্বেই উপস্থিত হয়েছিলেন লেঃ কমাণ্ডার জি,এম, মার্টিস এবং মুক্তিযুদ্ধে নয় নম্বর সেকটরের কমাণ্ডার মেজর জলিল। তাঁরা এখানে একটি গানবোটে অপেক্ষা করছিলেন। কৈখালি ক্যাম্পটি ছিল সুন্দরবনের মাঝে এবং এর আলাদা বৈশিষ্ট হলো মুক্তিযোদ্ধাদের গাছের উপর মাঁচা করে থাকতে হতো। কারণ জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া, দ্বিতীয়তঃ এসব এলাকা জোয়ারের সময় পানিতে তলিয়ে যায়। অদ্ভুত পরিবেশ। আফ্রিকার জঙ্গলে শিকারের দৃশ্যে যেমনটি দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে মার্টিস সাহেব কমাণ্ডোদের এক আবেগময় পরিবেশের মাঝে বিদায় জানালেন। সাথে মেজর জলিল ও লেঃ মাহফুজ আনাম বেগ। মিঃ বেগ, পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সদস্য কিন্তু প্রথম থেকেই স্থলযুদ্ধে যোগদেন। ৯ নম্বর সেকটরের সাব সেকটর কমান্ডার এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই অভিযানে নিরাপত্তার জন্য অর্ন্তভূক্ত ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের অপর অফিসার লেঃ জিয়াউদ্দিন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে একশত মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ভারত পৌছেন।

৭ আগষ্ট সন্ধ্যায় ভারত সীমান্তে 'কৈখালি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প' হতে বিদায় নিয়ে কমাণ্ডোদল মংলা বন্দরাভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। এবারকার যাত্রা সমুদ্র উপকুলবর্তী সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অজানা-অচেনা ছোট নদী ধরে। যাত্রা পথ দুর্গম হলেও বনের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য কমাণ্ডোদের বিমোহিত করে। প্রকৃতির যে এত রূপ, না দেখলে বোঝা যায়না। চারিদিকেই সবুজে ভরা। জীব জগতের সব কিছুই এখানে উপস্থিত থাকলেও নেই কেবল কোলাহল। বনের এই গম্ভীরতাই এর বৈশিষ্ট, এর অহংকার। মাঝে মধ্যে বন মোরগের ডাক ভেসে আসে, নদী কিনারে গাছের ডালে শত শত বানরের লাফালাফি আর কিচির মিচির শব্দ। কমাণ্ডোরা সার্বক্ষণিক দুরু-দুরু বুকে হালে পানির ছলাত ছলাত শব্দে নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে নদীর এক-এক বাঁক পাড়ি দিচ্ছেন সম্মুখে সর্তক দৃষ্টি রেখে, কোন মুহুর্তে শত্রুর গানবোট থেকে ঝাকে ঝাকে গুলি এসে না তাঁদের সকল ইচ্ছার সমাপ্তি টেনে দেয়। গভীর বনের ভিতর দিয়ে যেতে কখনো বাঘ, কখনো ঝাকে-ঝাকে হরিণ নদীর পাড়ে বিচরণ করছে, অবলোকন করেন। কিন্তু গতিপথে কেবল গুলি ছোড়াই নয়, জোরে শব্দ না করে চলার নির্দেশ ছিল। শত্রু পক্ষ কোন ভাবে অবস্থান টের পেলে সমূহ বিপদ। ভগীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে কমাণ্ডোরা কোনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার ফিরে আসার কোন পথ নেই। দিনে দিনে না খেয়ে এখানে মৃত্যু অনিবার্য। যেজন্য কমাণ্ডোদের নৌকাগুলিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার কড়া নির্দেশ ছিল। এবং সবকটি নৌকাকে দলবদ্ধ থাকতে বলা হয়। সুন্দর বনের এসব পথে কদাচিৎ কেউ যাতায়াত করে। আর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শত্রুর ভয়ে বন-জঙ্গল, নদী ছিল জনশুন্য। বাওয়ালী, জেলে, মধূ আহরণের জন্য কেউই জঙ্গলে প্রবেশ করত না। সুতরাং এখানে যানবাহন হারালে ভয়াবহতার কথা বর্ণনার প্রয়োজন হয়না। তাই সার্বক্ষণিক সাবধানতার নির্দেশ। সতর্কভাবে চলার পরামর্শ ছিল।

দিনের আলো থাকতেই খাওয়া দাওয়ার কাজ শেষ করতে হতো, রাতে আগুন জ্বালালে বিপদের সম্ভাবনা তাই। সকালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে একদল জঙ্গলে নামলে অন্য দল আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে রাখত, জঙ্গলে বাঘ এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য। প্রথম কয়েকদিন খাওয়ার কষ্ট না থাকলেও শেষের দিকে পানি এবং টিনজাত প্রায় সব খাদ্যই শেষ হয়ে যায়। তখন কেবল চিড়া,

গুড় এবং নদীর তীক্ষ্ম নোনা পানি পান করেই কাটাতে হয়। ১২ তারিখ এইদল খুলনা জেলার দক্ষিণে কয়রা থানার অর্ন্তগত কালাবগি গ্রামে এসে পৌছে। ছয়দিন পর লোকালয়ে প্রথম পদার্পন। কিন্তু কোথাও জনমানুষের সাক্ষাৎ মিলেনা। শত্রু বাহিনীর অত্যাচারে প্রাণের মায়ায় গ্রামশুদ্ধ মানুষ অনেক আগেই নিরাপদ কোন আশ্রয়ে চলে গেছে। তাদের ফেলে যাওয়া পানি সংগ্রহের বিরাট আকৃতির মাটির পাত্র খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকায় তাতে বৃষ্টির পানি জমে ভর্তি ছিল। তার মধ্যে জন্মেছিল অসংখ্য পোকা। গামছায় পানি ছেঁকে কমাণ্ডোদল তাদের পাত্রে ভর্তি করে সাথের পানি বিশুদ্ধ করার টেবলেট মিশিয়ে সকলে দীর্ঘসময়ের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবৃত করেন। কমাণ্ডোদলের মুলযুদ্ধের আগেই একটি দুর্গম অভিযানের সফল সমাপ্তি ঘটলো। কমাণ্ডোদলটিকে প্রায় ২০০ মাইল দূর্গম এবং জঙ্গলাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হয়।

১৩ আগষ্ট বিকেলে মংলার অদূরবর্তী সুতারখালি গ্রামে এসে তাঁরা অস্থায়ীভাবে ঘাটি তৈরী করেন। সাতদিন পর দলনেতা, গাইড, নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধাসহ ৪৮ জন নৌ-কমাণ্ডো এবং সব মিলিয়ে ৬০ জন একত্রে মিলিত হন। এখানে পৌছানোর পূর্বেই ১০ আগষ্ট হীরণ পয়েন্টের জন্য নির্ধারিত ১২ জন কমাণ্ডোসহ গাইড রয়েজদ্দিন এবং লেঃ জিয়াউদ্দিন তাঁদের পথে মূলদল ত্যাগ করে চলে যান। মংলার জন্য গাইড খিজির আলী বীর বিক্রম, আনোয়ার, ও আফজাল ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা, প্রাক্তন সেনাবাহিনীর সদস্য এবং অসমসাহসী সৈনিক। প্রায় জনমানবহীন লোকালয়ে কোথা থেকে তারা একটি খাসী, চাউলসহ খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে আনেন সকলের ক্ষুধা নিবৃতির জন্য। বলতে হয় গত ছয়দিন প্রায় তাঁদের অনাহারে কেটেছে।

সুতারখালি গ্রাম যেখানে এসে কমাণ্ডোদল আশ্রয় নেন এ বাড়ীটি ছিল একটি হিন্দু পরিবারের পরিত্যাক্ত বাড়ী। এখানে আহার পর্ব সেরে সন্ধ্যার সাথে সাথে সকলে নৌকায় উঠে জঙ্গলের অভ্যন্তরে যেয়ে রাত্রি যাপন করেন। কারণ এখান থেকে মংলাবন্দর অতি সন্নিকটে। যে কোন ভাবে মুক্তিযোদ্ধা দলের উপস্থিতি প্রকাশ ঘটলে অভিযান ব্যর্থ হবে, উপরন্ত শত্রু বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়। একটি দল কিংবা একজন কমাণ্ডো নৌ-যুদ্ধের সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে পারতো। তাই সার্বিক গোপনতা রক্ষা অপরিহার্য ছিল।

নৌ-অভিযানের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে অপারেশনের দিন তারিখ নিয়ে। বিভিন্ন লেখক কিছু-কিছু লেখার মাঝে ১৪ আগষ্ট '৭১ কে অপারেশনের তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা হলো, ১৪ আগষ্ট অপারেশনের দিন নির্ধারিত ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণে অপারেশনের দিন একদিন পিছিয়ে দেয়া হয় বিশেষ সাংকেতিক গান এর মাধ্যমে। সাংকেতিক গান দু'টির বিশ্লেষণ হলো পরিকল্পনা কারীদের এইমত নির্দেশ ছিল যে, আকাশবাণীর 'খ' কেন্দ্র থেকে দু'টি গান বাজানো হবে এবং সম্ভাব্য দিনের কথা জানিয়ে দেয়া হয়, ওই মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখের মাঝে। প্রথম গান বাজলে বুঝতে হবে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং দ্বিতীয় গান বাজানোর পর, এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্দেশিত স্থানে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। এখানে সময় একটি লক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একই নির্দেশের অধীনে বাংলাদেশের চারটি বন্দরে অভিযান পরিচালনার কথা। ভুল হলে সার্বিক পরিকল্পনা ব্যর্থ অথবা বড় ধরণের দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই গান দুটি বাজানোর সময় সম্পর্কে বিভ্রান্তির নিরসন আবশ্যক। এই সম্পর্কে অনেক কমাণ্ডোর সাথে কথা বলেছি। স্মৃতিচারণ করে অসংখ্য লেখাও পেয়েছি এবং এখানে উল্লেখ আবশ্যক ভাবছি যে, এই যুদ্ধে আমিও অংশ নিয়েছিলাম। আমার স্মৃতি, অন্যান্যদের স্মৃতিচারণ এবং কমাণ্ডো জি,এম,এ গপফার এর'৭১'র লেখা ডায়রী থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, ১৩ আগষ্ট, সকালে পঙ্গজ মল্লিকের কণ্ঠে প্রথম গানটি বাজানো হয়। কিন্তু ১৪ আগষ্ট পরবর্তী গান সন্ধ্যামুখোপাধ্যায়ের "আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ী" বাজানো হয়নি। এই গানটি বাজানো হয় ১৫ আগষ্ট সকালে।

প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, বীর সেনানী মুক্তিযুদ্ধে এক নম্বর সেক্টরের-সেক্টট কমাণ্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম, তাঁর 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থে বলেছেন চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য ৬০ জন কমাণ্ডোকে তিনভাগে ভাগ করে পাঠানো হয়। এর একটি গ্রুপ নির্দিষ্ট সময়ে বন্দর এলাকায় পৌছতে ব্যর্থ হওয়ায় অপারেশন একদিন পিছিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এই তথ্য যথাযত নয়। অভিযানে সকলদল যেখানে সতর্কতার সাথে আত্মগোপন করে অগ্রাভিযানে রত ছিলেন, সেখানে চট্টগ্রাম জেলে পাড়ায় ৩য় দল আটকা পড়েছে তা সংযোগের কোন পন্থা

নিয়ন্ত্রক বৃন্দের হাতে ছিলনা। বরঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ ছিল শেষ গান শোনার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতেই হবে। লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের দায়িত্ব কমাণ্ডোদের উপর অর্পিত ছিল। লেখক সেজান মাহমুদ তাঁর 'অপারেশন জ্যাকপট' বইয়ে একজন কমাণ্ডোর লেখার বরাত দিয়ে সময় সম্বন্ধে যে তথ্য উপস্থাপন করেছেন সেখানেও ভুল বোঝার অবকাশ থাকে। তিনি লিখেছেন "সংকেত প্রদানের পর তারিখ পিছানোরও কোন উপায় ছিলনা।" ১৩ ও ১৪ আগষ্টে যথাক্রমে ওয়ানিং এবং এ্যাকশন সিগন্যাল পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক ইতিহাস সৃষ্টির জন্য লিখছি দ্বিতীয় সিগন্যালটি পৌছে ছিল ১৫ আগষ্ট সকাল ৭.৩০ মিঃ।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদল, ১৩ আগষ্ট সকালে আক্রমণের প্রস্তুতি সংকেত পাবার পর দৃঢ় মনে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। ১৪ আগষ্ট, সকালে বন্দরে র‍্যাকী করার জন্য একজন গাইডের সাথে দুজন কমাণ্ডোকে পাঠানো হয়। নৌকাগুলি অবস্থান করছিল লোকালয় থেকে কিছু দূরে জঙ্গলের অভ্যন্তরে। একটি ছোট খালের মধ্যে। সমগ্র সুন্দরবন এমন অসংখ্য সরু খাল দিয়ে জালের মত বোনা। কয়েকজন কমাণ্ডোকে পাঠানো হয় গ্রামের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। সরু খালে নেমে দলটি পানির মধ্য দিয়ে সামনে হেটে যাচ্ছেন। কারণ খালের ডান তীরে ঘন কেয়াবন, আর বাম তীরে সেদিন সকালেই একটি বাঘ হরিণ শিকার করেছে। দূর্ভাগ্য কিছুদূর এগুতে কমাণ্ডোদলের চোখে পড়ে বাঘটি বুকের নীচে শিকার করা হরিণটি নিয়ে শুয়ে আছে। ভয়ে খাল পাড়ি দিয়ে অপর তীরে কেয়াবনের মাঝে ঢুকে অনেক কষ্টে সামনে এগিয়ে গেলেন কমাণ্ডো দলের সদস্য কজন। কিন্তু কেয়াবনের মধ্য দিয়ে এগুনো সম্ভব নয়। আবার খালে নেমে আসেন তাঁরা। দলে সাতজন। সকলের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বাঘের দিকে তাঁক করা। বাঘকে পিছনে ফেলে সামনে যেয়ে দু'জন পিছনে চোখ রেখে উল্টা পায়ে হাটতে থাকেন। কমাণ্ডোদের জন্য এটিও ভয়ংকর এবং নতুন অভিজ্ঞতা। সুন্দর বনে শিকারী বাঘের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া এমন ইতিহাস কেবল 'সুন্দরবনের' শিকারী পচাব্দী গাজীর জীবন ইতিহাসে লেখা আছে।

একই দিন দুপুরে পুনরায় সুতারখালি গ্রামে পূর্বের বাড়ীতেই সকলে আহার পর্ব সম্পন্ন করে পর্যবেক্ষণ দলের জন্য অপেক্ষায় রত। প্রায় জনশুন্য হলেও দলনেতা এলাকায় নিরাপত্তার জন্য কার্ফু জারী করলেন। যেনো কোনভাবেই এই দলের অবস্থান শত্রু শিবিরে না পৌছে। নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত গেরিলা দল

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ

"জেল জুলুম আমাকে দুর্বল করতে পারেনা কিন্তু মানুষের ভালবাসা আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে" — মুজিব

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৫শে কার্তিক, ১৩৭৮ সন। ১৯৭১ সাল। মূল্য ২৫ পঃ

সম্পাদকীয়

খাদ্য সংরক্ষণ

হানাদার বাহিনীর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে অধিকৃত দেশকে দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলে দেয়া। সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে উপনিবেশিক শাসকগণ বর্বর বাহিনীকে লেলিয়ে দেয় নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর। তাই তারা খাদ্যশস্য লুটপাট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অমানুষিক বীভৎসতায় মেতে উঠে। এইরূপ অবস্থায় দেশকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করতে না পারলে বিপ্লবের উদ্দেশ্য বিপথগামী হয়ে পড়ে। পররাজ্য লোলুপ পাঞ্জাবী শাসক এবং শোষক গোষ্ঠি বাংলাকে তাদের অধীনে রাখার জন্যে উপনিবেশিকদের পুরাতন সত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে। একটা জাতিকে উপনিবেশিক শক্তির উপর নির্ভরশীল করে তুলতে না পারলে তাকে শোষণ এবং শাসন কোনটাই করা যায় না। দীর্ঘদিন যাবত ওরা কূট-চক্রান্তের বেড়াজালে বাংলার জনগণকে ওদের মুখাপেক্ষি করে তুলতে সক্ষম হয়নি। তাই বর্বর

(৪র্থ পৃঃ ১ম কঃ)

বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর সফল অভিযান

নবাবগঞ্জ। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে গত বুধবার নবাবগঞ্জ ছাউনি থেকে হানাদার বাহিনীর একটি বিরাট দল কুমরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করলে পথিমধ্যে বক্সনগরের ফুলবাড়া থেকে আমাদের দুর্ধর্ষ গেরিলারা এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দুজন পাকসেনাকে নিহত এবং তিনজনকে আহত করে। পরে আতঙ্কগ্রস্ত পাক দস্যুরা আশেপাশে বেপরোয়া ভাবে গুলিবর্ষণ করে এবং অনেক বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়।

চাঁদপুর ঃ আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন গত ২৫শে অক্টোবর চাঁদপুরে আমাদের গেরিলারা এক সফল অভিযান চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বাহী একটি আমেরিকান জাহাজ ডুবিয়ে দেন। আরো জানা গেছে আমাদের গেরিলারা মাইনের সাহায্যে শত্রু এবং শত্রুর জন্যে রসদবাহী দুটি ট্রেন উড়িয়ে দেন এবং হানাদার বাহিনীর জন্যে চাল বোঝাই দুটি জাহাজ আটক করেন।

(৬ষ্ঠ পৃঃ ১ম কঃ)

খতম করেছে।

সীমান্ত চৌকি দখল

গত ১৫ই নভেম্বর আমাদের মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা ও রাজশাহী সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর 22টি সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছে।

নৌ-কমান্ডোদের তৎপরতা

খবরে প্রকাশ আমাদের সুদক্ষ নৌ-কমান্ডোদের তৎপরতার ফলে খুলনা ও চালনা বন্দর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। অন্য এক খবরে কমান্ডোদের তীব্র আক্রমণে চালনা বন্দরে 'মেলবোর্ন' নামক জাহাজটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

!! নৃশংস হত্যা !!

পাকহানাদারদের বর্বরতার কোন নজির নেই। আলফাডাঙ্গা সেদিন নির্যাতকে কাদার ইউনিয়ন তাদের চৌকিদারিক নৃশংসতার শিকারে পরিণত হলেন। গত ১৩ই নভেম্বর তিনি বাড়িতে ছিলেন শিবিরের সামনে দিয়ে তখন নরখাদক পশুরা তাকে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

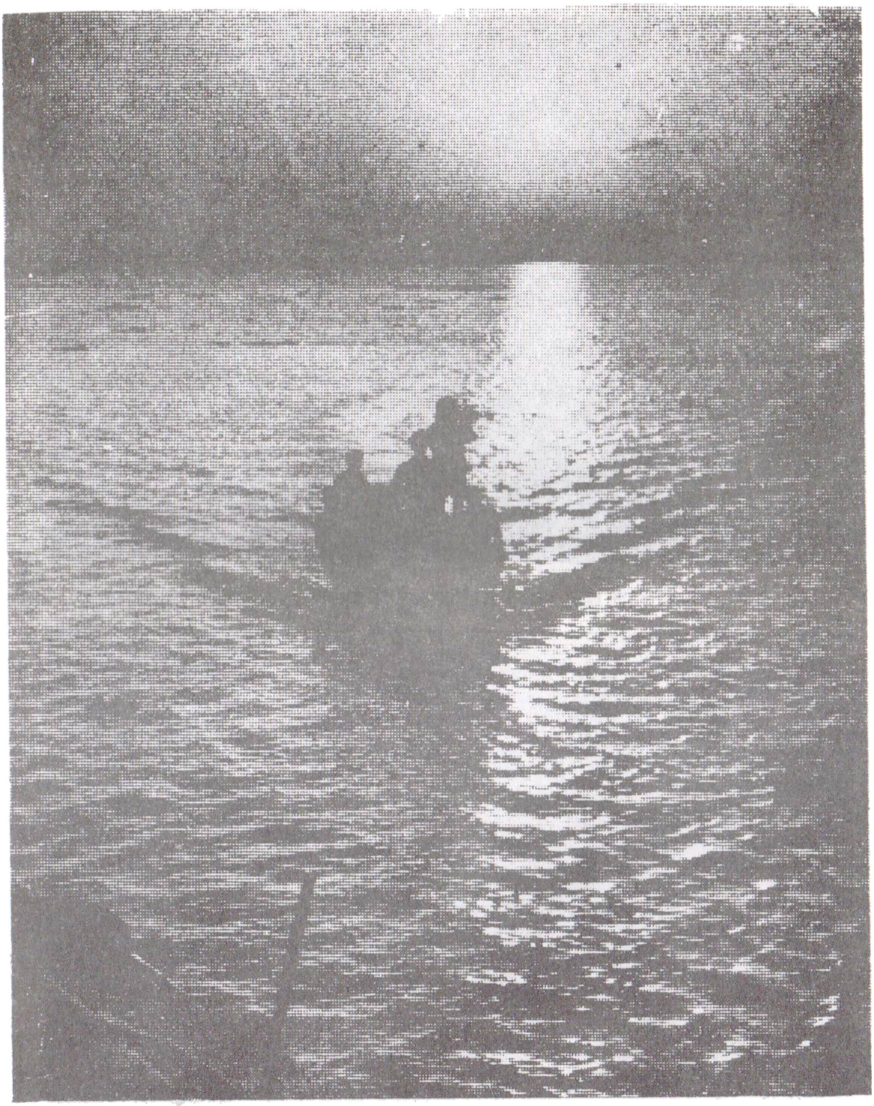
চট্টগ্রামঃ—

গত ৩রা নভেম্বর আমাদের গেরিলা কমান্ডোরা চট্টগ্রামে পাকসেনাদের উপর হামলা চালিয়ে হাটহাজারী রোড-2 নামক ডাকবাংলোটি বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছে।

ঢাকায় গেরিলা তৎপরতাঃ—

গত ৪ঠা নভেম্বর ঢাকায় গেরিলারা তটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। —>

(৬ষ্ঠ পৃঃ ২য় কঃ)



কমাণ্ডোরা দূর্গম রায়মঙ্গল এর মোহনা পাড়ি দিচ্ছে। (ছবি ১৯৭১)





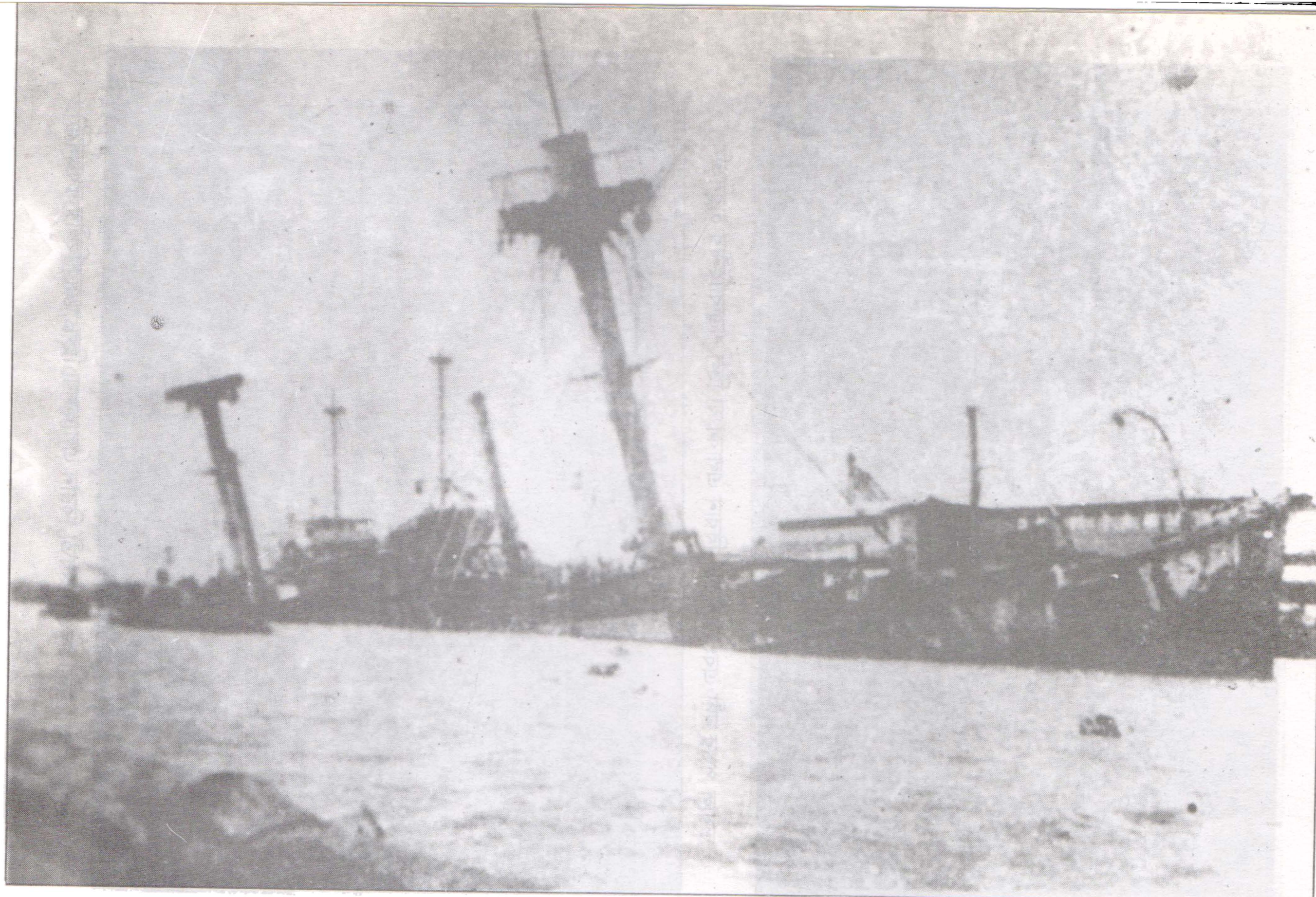
মংলার পার্শ্ববর্তী পশুর নদীর দৃশ্য। মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে কমাণ্ডোদল এই নদী অতিক্রম করে বন্দরে জাহাজ ডোবায়।



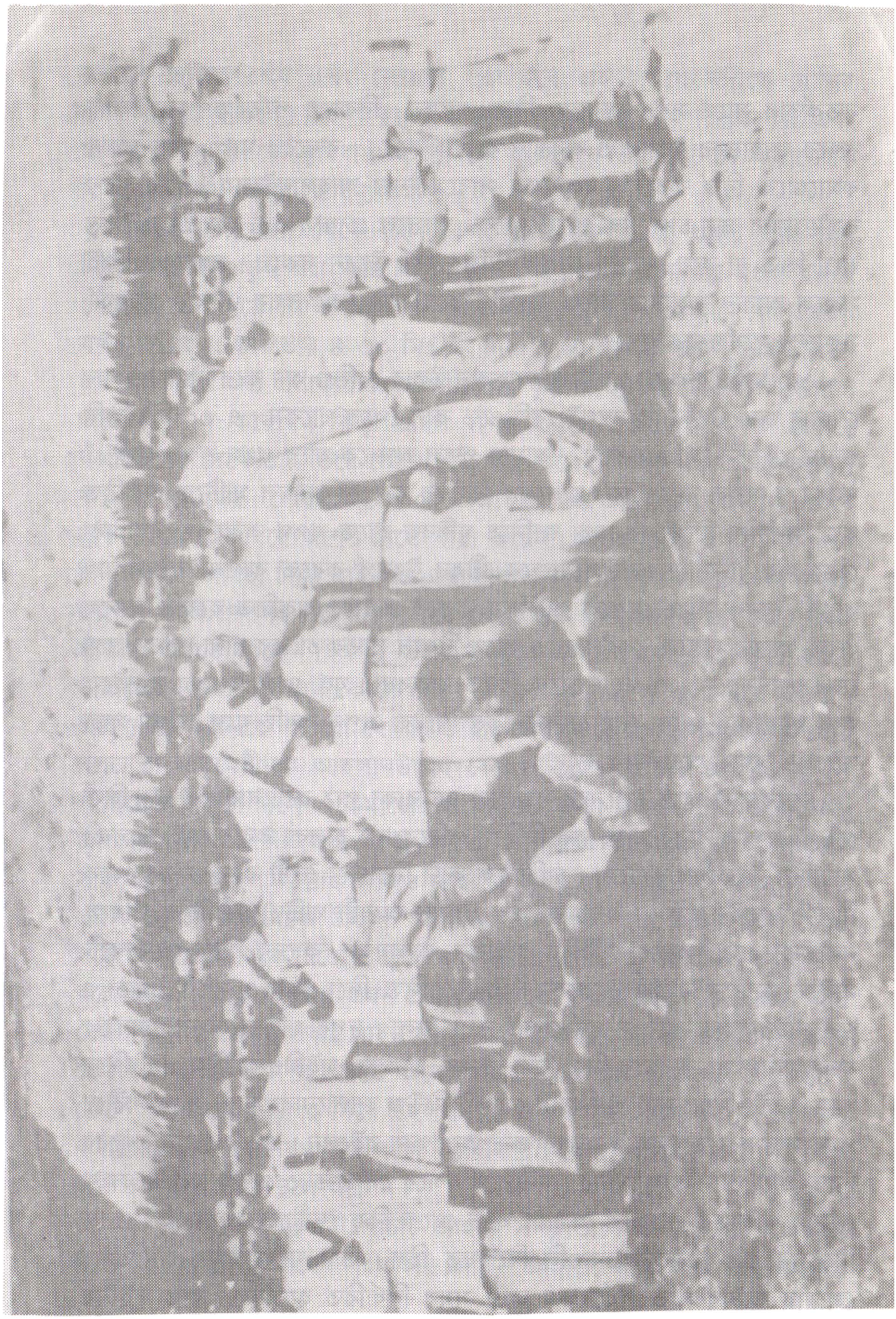
ভয়াল পশুর নদী এবং পার্শ্ববর্তী বিরান এলাকা যা ছিল শক্রবাহিনীর চারনভূমি।



ভয়াল পশুর নদী এবং পার্শ্ববর্তী বিরান এলাকা যা ছিল শক্রবাহিনীর বধ্যভূমি।



১৫ আগষ্ট, '৭১ মংলাবন্দরে ধ্বংসপ্রাপ্ত মার্কীন জাহাজ এস.এস. লাইটনিং।



অভিযান শেষে হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী ৪ জন কমাণ্ডো।

সতর্কতার সাথে সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে আছেন। বিকালে পর্যবেক্ষণ দল ফিরে বন্দরে জাহাজের সংখ্যা ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। বন্দরের ম্যাপ খুলে সকল কমাণ্ডোকে ব্রিফ করলেন দলনায়ক সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ। ধীরে ধীরে কমাণ্ডোদের স্নানু চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অজান্তে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠে। কিন্তু ভয়ে ভিত না হয়ে, যুদ্ধের নেশায় অস্থির হয়ে উঠেন সকলে। সন্ধ্যার সাথেই সকলে আবার জঙ্গলের মাঝে অন্তরীণ হয়ে যান। অপেক্ষায় থাকেন পরবর্তী সকালের সূর্যোদয়ের জন্য।

১৫ আগষ্ট সকালে দলনেতা আহসান উল্লাহ রেডিও অন করে নির্ধারিত গান শোনার জন্য উৎকণ্ঠার সাথেই রেডিওতে কান পেতে থাকেন। ৭-৩০ মিঃ তিনি শুনতে পেলেন কাঙ্খিত গান, "আমার পুতুল আজকে যাবে প্রথম শ্বশুর বাড়ী।" দলনেতা সকল কমাণ্ডোকে জঙ্গলের কিনারে বাংলার শ্যামল মাটিতে একত্রিত করে সর্বশেষ নির্দেশের কথা জানিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে শপথ করালেন, "আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতে কার্পন্য করবোনা। বাঙালি যুবক যাঁরা দেশকে শুক্রমুক্ত করতে এখানে একত্রিত হয়েছি সকলে একই মায়ের সন্তান, কেউ কারও সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবোনা। শত্রু ভয়ে ভিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবনা। যুদ্ধ শেষে হয়তো সবাইকে আর আমাদের মাঝে দেখাযাবেনা কিন্তু আমরা শপথ করছি যুদ্ধে কারো মৃত্যু ঘটলেও আমরা আদর্শচ্যুত হবনা।"

আবেগময় কণ্ঠে দলনেতা সকলকে দৃঢ় বাক্য পাঠ করানোর পর অশ্রুসিক্ত চোখে একে অপরের সাথে বুক মিলিয়ে পরিবেশকে হালকা করার চেষ্টা করেন। সারাদিন উৎকণ্ঠার কাটলো। চারিদিকে কড়া নিরাপত্তা তৈরী করে নৌকা থেকে মিলপেট মাইন, ফিনস্, ড্যাগার, এক্সপ্লোসিভ অস্থায়ী ঘাটির বাড়ীটিতে নামিয়ে দলনেতা এবং কমাণ্ডো মুজিবর, মহসিন, আলফাজ, কাদের মিলে প্রত্যেকটি মাইনে ডেটনেটরাইজড করেন। এক্সপ্লোসিভ দিয়ে আরও দশটি স্লাভ ও ডেটনেটরাইজড করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হলো। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। সকলে যতসামান্য আহার সেরে নিজ-নিজ ফিনস্, ড্যাগার, সুইমিং কষ্টিউম, পলিথিনে মুড়ে একটা দিয়াশলাই ও নিলেন সেফটি ফিউজ জ্বালানোর জন্য। সমস্ত শরীরে প্রচুর সরিষার তেল মেখে যাত্রার জন্য অপেক্ষায় রইলেন। এখান থেকে বন্দরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। নদীপথে বন্দরে পৌছতে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা সময় নেবে। গাইডের পরামর্শে অস্থায়ী ঘাটি থেকে কিছু দেরীতে রওয়ানার সিদ্ধান্ত নিলেন। নৌ-যুদ্ধের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তার মধ্যে সময় অন্যতম। জোয়ার ভাটার গতি পর্যবেক্ষণ করে সময় নির্ধারিত হয়েছিল। রাত দুইটায়

নদীতে ভাটার শেষ এবং জোয়ার শুরু হবে এই সময়ে নদীতে পানির স্থীতিশীলতা থাকবে। এই অবস্থায় কমাণ্ডোদের সাঁতরাতে পরিশ্রম কম এবং মাইন স্থাপন করতে সুবিধা। অপরদিকে এ সময়ে ভাটার টানে কমাণ্ডোকে সাগরে ভাঁসিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু সুতারখালী থেকে মংলা বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা শুরুর পর সময় নির্ধারণের জন্য ভুল ধরা পড়ে। স্রোতের বিপক্ষে নৌকা চালিয়ে মংলা বন্দরে পৌছতে ভোর হয়ে যায়। বন্দরের বিপরীত পাড়ে বানিয়া শান্তা গ্রামে কমাণ্ডোদল যখন পৌছে তখন ভোর ৪-৩০ মিঃ। বানিয়া শান্তা গ্রামটি সম্পূর্ণ পতিতালয়। এর পূর্ব পর্যন্ত অত্র এলাকায় কোন প্রতিরোধ যুদ্ধ না হওয়ায় পতিতা বাসিন্দারা আবাস ত্যাগ করেনি। কিন্তু এদিন সশস্ত্র ব্যক্তি এবং প্রায় উলঙ্গ শরীরে কমাণ্ডোদের দেখে তারা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। চিৎকার দিয়ে এক হুলুস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। গেরিলা দলের নেতা আফজাল ও আনোয়ার তাদের দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে যার যার ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। সাথে সাথে কমাণ্ডোরা পায়ে ফিনস্ পরে, গামছা দিয়ে মাইন ও এক্সপ্লোসিভ বুকে বেঁধে কোমরে একটি মাত্র ড্যাগার গুজে গ্রুপসহ সন্তর্পণে নদীতে নেমে হাত ধরে নির্দিষ্ট জাহাজের প্রতি সাঁতরে এগুতে থাকেন। অপর তীরে বন্দরের মসজিদ থেকে সেসময় ফজর নামাজের আজানের ধ্বনী কানে ভেসে আসে। চারিদিকে ফর্সা হয়ে উঠছে। এজন্য এদিন বন্দরে পনেরো-ষোলটি জাহাজ অবস্থান করলেও সময় নষ্ট হওয়ায় দলনেতা সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ কেবল নিকটের ছয়টি জাহাজে মাইন লাগানোর নির্দেশ দিলেন। কমাণ্ডোর সংখ্যা ৪৮ জন। সুতরাং প্রতি জাহাজে ৮ জন কমাণ্ডোকে নির্দিষ্ট করা হলো, যাতে কোনভাবে অভিযান বিফল না হয়। সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ নিজেও জাহাজে মাইন স্থাপন করেন। তখন নদীতে প্রবল স্রোত, চারিদিকে উজ্জ্বল আলো। অনবরত গানবোটের টহল, সার্চ লাইটের আলো থেকে নিজেকে লুকানোর জন্য প্রত্যেকে মুখের উপর কচুরিপানা ধরে এগুতে থাকেন। কিন্তু এমন প্রতিকূল পরিবেশ কমাণ্ডোদলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিক্ষিপ্ত ভাবেই সবাই মাইন স্থাপন করে জোয়ারে গা ভাসিয়ে তড়িৎ কূলে ফেরার জন্য প্রাণপণে সাঁতরাতে থাকেন। এর মাঝে শত্রু গানবোট তীব্র আলো ফেলে কমাণ্ডোদের উপর দিয়ে টহল দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু নিপুন প্রশিক্ষণ কমাণ্ডোদের আত্মরক্ষায় কাজে লাগে। ডুবিদিয়ে নিজেকে লুকিয়ে তাঁরা গানবোট অতিক্রম করে তীরে চলে আসেন।

এ অভিযানে সমুদ্রগামী পাঁচটি জাহাজ সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে যায়। এছাড়া S.S Lightning নামের বৃহতকায় মার্কিন জাহাজ, পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে

পাকিস্তান বাহিনীর জন্য সমরাস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী বহন করে মংলা বন্দরে এসেছিল। এই জাহাজে প্রায় ২০ হাজার টন যুদ্ধাস্ত্র ছিল, গম ও খাদ্য সামগ্রীর নীচে লুকানো। S.S Lightning আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটিকে ভারতের খিদিরপুর নিয়ে মেরামতের পর মংলা বন্দরে ফিরে এলে নৌ-কমাণ্ডোরা পুনরায় মাইন লাগিয়ে ডোবানের চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারও সম্পূর্ণভাবে জাহাজটি ডোবেনি তবে যুদ্ধাস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রীর প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দরে প্রথম অভিযানে কমাণ্ডোরা যখন প্রমত্ত পশুর নদীর মাঝে জাহাজে মাইন লাগিয়ে অনেকে তীরে ফিরেছেন, অনেকে পৌছানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, তখন দিনের আলোতে জাহাজের ডেকে পাকিস্তানীদের বিক্ষিপ্ত পায়চারি স্পষ্ট চোখে পড়ে।

পশুর নদীর বিশাল ঢেউগুলোকে গুড়িয়ে দিয়ে যখন মাইনের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে তখন ঘড়ির কাটা সকাল ছয়টা ছুয়ে গেছে। এরপর বিকট শব্দে একটির পর একটি বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। একই সাথে নদীর তীরে নিরাপত্তার জন্য অবস্থানকারী যোদ্ধাদের এল,এম,জি দু'টিও গর্জে ওঠে। পশুর নদীর তীরে এক প্রলয়ংকারী অবস্থার অবতারনা হয়। শত্রু গানবোটগুলি আচমকা আক্রমণে হতবিহ্বল হয়ে প্রথমে সাগরের দিকে দ্রুত পালিয়ে যায়। বাণিজ্যিক জাহাজ গুলি গুরুতরভাবে আক্রান্ত বুঝতে পেরে একটানা বিপদ সংকেত বাজিয়ে S.O,S বার্তা পাঠাতে থাকে উদ্ধারের জন্য। পাকিস্তানী গানবোট চারটি সম্বিত ফিরে পুনরায় বন্দরে ফিরে হেভী মেশিনগান থেকে ঝাকে ঝাকে গুলি চালাতে থাকে। নদীর তীরের গাছপালা, বাড়ীঘর ঝাঝরা করে দেয়। মর্টারের শেলগুলি কমাণ্ডোদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পানি-ঘাসের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে। একটি শেলের বোমা ও বিস্ফোরিত হয়নি। গ্রামের ভিত-সন্ত্রস্ত মানুষেরা ছুটে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। এর মাঝে সকল কমাণ্ডো অপেক্ষমান নৌকায় ফিরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। যুদ্ধ শেষে বন্দর থেকে দূরে গ্রামের ভিতর একটি স্কুলে সকলের সম্মিলিত হওয়ার জন্য পূর্ব থেকে নির্দেশ দেয়া ছিল। দু'একজন কমাণ্ডো যাঁরা উদ্ধারকারী নৌকায় আসতে পারেননি তাঁরা গ্রামের মানুষের সাহায্য নিয়ে অনতিবিলম্বে নির্দিষ্ট স্কুল গৃহে এসে পৌছেন। সকাল নয়টা। স্কুলটির সম্মুখে অপেক্ষমান কমাণ্ডো যোদ্ধাদের ঘিরে শত শত মানুষের ভিড় জমে গেছে। গ্রামের মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত যোদ্ধাদের আপ্যায়নের জন্য প্রচুর ডাব, নারিকেল, গুড়, মুড়ি যে-যা পেরেছেন সাথে নিয়ে এসেছে। আপনার সন্তানের মত তাদের যতসামান্য সামর্থ দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা কমাণ্ডোদের হৃদয় ছুয়ে যায়। কিন্তু এখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা নিরাপদ নয় ভেবে কমাণ্ডোদল

ছয়টি নৌকা সমবিহরে সুতারখালির উদ্দেশে বিজয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে চলেন। কিন্তু দুপুর শেষে বাণিয়াশান্তাসহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলির মানুষের উপর মেনে আসে পাশবিক অত্যাচার। দস্যুরা সমগ্র পতিতা নিবাসটি জ্বালিয়ে দেয়। বেয়নেটে খুচিয়ে হত্যা করে কয়েকজন বৃদ্ধাসহ শিশুকে। যুবতী যারা পালানোর সুযোগ পায়নি উঠিয়ে নিয়ে যায় তাদের গানবোটে। যাদের নাম পরিচয় আর কোনদিন মেলেনি। বিকালে সুতারখালি ফিরে দলনেতা যথাশীঘ্র ভারতে প্রত্যাবর্তণের প্রস্তুতি নিতে চান। কারণ শত্রু সৈন্যরা এই পরাজয়ের পরিশোধ নিতে কমাণ্ডোদের খুজে ফিরবেই। এছাড়া ক্যাম্প পরিচালক কমাণ্ডার মার্টিসের নির্দেশ ছিল অপারেশন শেষে পলাশী ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য গেরিলা যোদ্ধারা স্থান ত্যাগ করতে অসম্মতি জানান। ফলে এখানে কমাণ্ডোদলের সাথে গেরিলা যোদ্ধাদের মতের অমিল দেখা দেয়। যে কারণে কমাণ্ডো দলের ৭ জন, মূলদল ত্যাগ করে আলাদাভাবে ভারতে প্রত্যাবর্তণের সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পথ ভুলে শত্রুর এমবুশের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধে তাঁরা শত্রু সৈন্যের হাতে বন্দী হন। ১৮ আগষ্ট, সাতক্ষীরার বুধহাটাতে। হানাদাররা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালায় কিন্তু ব্যর্থ হয়ে কমাণ্ডো আফতাবউদ্দিন ও সিরাজুল ইসলামকে গুলি করে হত্যা করে। বাকী ৪জন কমাণ্ডো ১৮ সেপ্টেম্বর যশোর সেনানিবাস থেকে পালিয়ে জীবনে রক্ষা পান।

এই অভিযানের অন্যান্য কমাণ্ডোবৃন্দ সুন্দরবন এলাকা থেকে বনবিভাগের নিরাপত্তারক্ষীদের অসংখ্য রাইফেল, খাদ্য সামগ্রী এবং দুটি বৃহত আকারের টহল লঞ্চ ‘বনলক্ষি’ ও ‘বনহুর’ দখল করে ভারতে নিয়ে যান। এই দুটি লঞ্চকে পরবর্তী সময়ে রূপান্তর করে গানবোর্টে রূপ দেয়া হয়। দেশের অন্যান্য বন্দর অভিযানের সাথে মংলা বন্দর অভিযানে পার্থক্য হলো, তাঁদের স্থানীয় জনগনের সাহায্যের প্রয়োজন ছিলনা। শত্রুর মোকাবেলার জন্য নিজস্ব শক্তিতে অগ্রসর হতে হয়েছে।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কমাণ্ডোদের তালিকাঃ- মোঃ আহসানউল্লাহ, আব্দুল কাদের, মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবুর রহমান, শহীদ আফতাব উদ্দিন, শহীদ সিরাজুল ইসলাম, ইমাম বারী, যোয়াদুর রসুল বাবু, আমিনুর রহমান , জি,এম, এ রহিম, আলাউদ্দিন আহমেদ, খলিলুর রহমান, শেখ মহসীন আলী, মোহর আলি, এমদাদুল হক, আলফাজউদ্দিন, আব্দুস সেলিম, এবাদুল ইসলাম, প্রফুল্ল

কুমার মিস্ত্রী, রাম প্রসাদ, অনিল কুমার, মহেন্দ্রনাথ, অরুন মুখার্জি, দিলিপ কুমার, বিশ্বনাথ পালিত, রফিকুল ইসলাম, আবদুস সাত্তার, মোঃ মোস্তফা, আব্দুল কুদ্দুস, আঃ গফুর, জহুরুল হক, রইছউদ্দিন, শফিক আহমদ, আবুল হোসেন, মনসুর আহমদ, খলিলউল্লাহ, মফিজউদ্দিন, আঃ রহিম, আঃ মালেক প্রমুখ।

মেজর জিয়াউদ্দিন ১১জন কমাণ্ডো দলটিকে হীরন পয়েন্ট না নিয়ে রাজাপুর নিয়ে যান, ফলে হীরন পয়েন্টে কোন অপারেশন হয়নি। নৌ-কমাণ্ডোদের বিশ্বময় সাড়াজাগানো "অপারেশন জ্যাকপট" এ মংলা বন্দরে নিমজ্জিত মার্কিন জাহাজ S.S. Lighting এই অপারেশনের পর হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড এভাবে প্রচার করে, "সম্প্রতি বাংলাদেশের নদীপথে নেভাল কমাণ্ডোদের গেরিলা তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ এতই তীব্রতর হয়েছে যে, এরই মধ্যে ৬টি সমুদ্রগামী বানিজ্যিক জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। এরমধ্যে ২টি আমেরিকান, ২টি চায়নিজ, ১টি জাপানী ও ১টি পাকিস্তানী জাহাজ ছিল। এই জাহাজগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন করছিলো।" হীরন পয়েন্টে অংশ গ্রহণকারী কমাণ্ডোবৃন্দ ঃ- মোঃ জালালউদ্দিন, শেখ মাহফুজুল হক, হুমায়ুন কবীর, আঃ রহিম, মজিবুর রহমান-২, নুরুল ইসলাম, জি,এম গফফার, শেখ আঃ কাদের, ফজলুর রহমান, আজিজুল আলম, শমশের আলী। মেজর জিয়াউদ্দিন এই দলের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। (এ অভিযানের বর্ণনা কমাণ্ডো আব্দুল গফফার এর '৭১ সালের ডায়রী থেকে উদ্ধৃত করা হলো)।

দুই

১৫ আগষ্ট, সকল স্থানে নৌ-কমাণ্ডোদের প্রথম অপারেশন অত্যন্ত সফল হওয়ায় আক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তায় চাঁদপুর অপারেশনের সফল দলনেতা সাবমেরিনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে পুনরায় আর একটি দল মংলা বন্দরে পাঠানো হয়। এই দলে প্রথম অভিযানের সাহসী যোদ্ধাদের সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নতুন কয়েকজন কমাণ্ডোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবারের যাত্রাপথ ছিল ভিন্ন। পলাশী থেকে সামরিক ট্রাকে কমাণ্ডো দলটিকে নেয়া হয় পশ্চিম বঙ্গের বসিরহাট শহরের অদূরবর্তী বাগুন্ডি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। দলে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০ জন। বাগুণ্ডি ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী

পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য সুলতানউদ্দিন আহ্মেদ এবং দলটির নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়, নয় নম্বর সেক্টরের সাব সেক্টর কমাণ্ডার তখন লেফটেন্যান্ট, পরে মেজর (অবঃ) সামসুল আরেফিনের উপর। তিনি বিজয় অর্জন পর্যন্ত নয় নম্বর সেকটরের অধীনে নৌ-যোদ্ধাদের সাথে ওৎপ্রতভাবে জড়িত ছিলেন এবং যুদ্ধ পরিকল্পনায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন। তাঁরমত সাহসী যোদ্ধা ছিল বলেই খুলনা এলাকার অনেক কঠিন যুদ্ধেও সফলতা অর্জিত হয়েছিল।

অক্টোবরের ২ তারিখ কমাণ্ডো বাহিনী ভারতের হাসনাবাদ সীমান্তনদী ইছামতি অতিক্রম করে বাংলাদেশের কালিগঞ্জ থানা হয়ে দীর্ঘ ৪০ মাইল পথ প্রত্যন্ত অঞ্চল ধরে পায়ে হেটে মংলা বন্দর এলাকায় পৌছেন। এই সময়ে সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ অঞ্চল ছিল এক রকম মুক্ত এলাকা। অনাহুত কোনো বিপদের মোকাবেলা ছাড়াই দলটি অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে পৌছে যায় মংলা বন্দরের অদূরে সুন্দরবনের প্রান্তসীমায়। প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং এলাকার রাস্তাঘাট পরিচিত হওয়ায় কমাণ্ডোদের কাছে বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ হতে থাকে। এছাড়া এবার নিরাপত্তার জন্য শক্তিও অনেক বাড়ানো হয়েছে। প্রথম অভিযানের দুঃসাহসী যোদ্ধা খিজির আলী, আফজাল, আনোয়ার ছাড়াও রয়েছে শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা। উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় নৌ-অভিযানের বৈশিষ্ট ছিল ভিন্ন। এবারে যুদ্ধের এলাকা কিংবা সময় নির্দিষ্ট ছিলনা। নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো মাধ্যম বা সংকেত ব্যবহৃত হয়নি। যুদ্ধ পরিকল্পনার ভার সম্পূর্ণভাবে দলনেতার উপর দেয়া হয়।

নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে এবার এইদল তাঁদের আশ্রয়স্থল অস্থায়ীভাবে কৈলাশগঞ্জ গ্রামে স্থাপন করেন। যেখান থেকে মংলা বন্দরে পৌছানো ছিল সহজ। যুদ্ধ নেশায় উম্মত্ত কমাণ্ডো দল ও দলনেতা ৮ অক্টোবর দুপুরে বন্দরে পুনরায় জাহাজের অবস্থান জানতে রেকী করতে লোক পাঠান। তাঁরা ফিরে জানান বন্দরে ছয়টি জাহাজ অবস্থান করছে। দলনেতা বদিউল আলম, লেফটেন্যান্ট সামছুল আরেফিনের সাথে পরামর্শ করে সেইদিন রাত্রেই আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোদের মধ্যে থেকে অত্যন্ত সাহসী বিশজন কমাণ্ডোকে নির্দিষ্ট করা হয়। সন্ধ্যার পূর্বেই আহার সেরে

বিশজন কমাণ্ডোসহ দলনেতা এবং স্থলের মুক্তিযোদ্ধার দল সমবিবহরে লেফটেন্যান্ট আরেফিন ও খিজির আলী মংলার উদ্দেশে কৈলাশগঞ্জ ত্যাগ করেন। এটি কমাণ্ডোদের দ্বিতীয় যুদ্ধযাত্রা মংলা বন্দর অভিযানে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আলো জ্বালানো যাবেনা। মাঝিরা স্থানীয়, তাই তাদের রাস্তা চিনতে কষ্ট হয়না। অল্প সময়ের মাঝেই তারা বন্দর সোজা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়। কমাণ্ডো দল নৌকার মধ্যেই সকল প্রস্তুতি নিয়ে মাইন, ফিনস্ ড্যাগারসহ নদীর কিনারে পৌছেন। নদীর পাড়ে স্থল-যোদ্ধারা কয়েকভাগে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন লেঃ সামসুল আরেফিন। ছয়টি জাহাজকে টার্গেট করে কমাণ্ডোরা ছয়ভাগে বিভক্ত হয়ে জাহাজের দিকে সাঁতরাতে থাকেন।

ভরা বর্ষায় পশুর তখন উছলে পড়ছে। নিথর ভয়াবহ পরিবেশ। নদীতে টহলরত গানবোট এবং বন্দর থেকে সার্বক্ষনিক সার্চ লাইটের তীব্র আলো ঘুরে যাচ্ছে। এর মাঝে কমাণ্ডোরা দুঃসাহসীকতার সাথে জাহাজের দিকে সাঁতরিয়ে এগিয়ে যান। মৃত্যুভয়, তাদের দৃঢ়তার কাছে হারমানে। সাথে সাবমেরিনার বদিউল আলমও আছেন। প্রত্যেকটি দল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে নির্দিষ্ট জাহাজের সামনে মাঝে ও পিছনে মাইন লাগিয়ে অতি দ্রুত তীরে ফিরতে থাকেন। কমাণ্ডোরা নির্দিষ্ট আশ্রয়ে ফেরার পূর্বেই মাইনে বিস্ফোরণ শুরু হয়। এবং সাথে সাথে পাকিস্তানীদের গুলি বর্ষণ আর সাইরেনের শব্দে বন্দর এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। কমাণ্ডোদের নিরাপত্তার জন্য শত্রুর গুলির জবাবে মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেলও গর্জে ওঠে। তারা বন্দর এবং শত্রু জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। বাঁধের আড়ালে তাঁদের অবস্থান। উভয়পক্ষের গুলি বিনিময়ের ফাঁকে কমাণ্ডোরা নিরাপদে পৌছে গেছেন স্থল-মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। তখন ভোর হয়ে আসছে। কমাণ্ডোরা নৌকায় আশ্রয় নিলে ক্রমশ গুলি কমিয়ে এক পর্যায়ে সকল যোদ্ধা কৈলাশগঞ্জের পথে রওয়ানা দেন।

এই যুদ্ধে অংশ নেনঃ আলী আশরাফ, জবেদ আলী, জি,এম,এ, গাফফার, আঃ হক, আলফাজউদ্দিন, জি,এম,এ, রহিম, ডাঃ মাহফুজুল হক, আব্দুল হাকিম, রাম প্রসাদ, দিলিপ কুমার,মোস্তফা, আঃ সাত্তার, আব্দুস সেলিম, আঃ কাদের,

রুহুল আমিন, আঃ গফুর, শাহ আলম, আঃ মালেক, সুশীল, আকরাম, রবীন্দ্রনাথ, শমশের আলী, সুবোধ বিশ্বাস, আঃ সেলিম, রমেশ চন্দ্র, সামসুল হক, আব্দুর রহিম, শওকত আলী, সামসুল আলম, ওয়াহেদ আলী, হুমায়ূন কবির প্রমুখ।

(তথ্যঃ কমাণ্ডো জি,এ,এ, রহিম, মোয়াজ্জিন, মিটফোর্ড হাসপাতাল ছাত্রাবাস মসজিদ, ঢাকা ও ডাঃ মাহফুজুর রহমান)

(তিন)

৮ অক্টোবর মংলা বন্দরে দুঃসাহসিকভাবে ছয়টি জাহাজ ডুবানোর পরদিনই মংলা থেকে ২০ কিলোমিটার উজানে চালনা বন্দরে পশুর নদীতে পুনরায় অভিযান পরিচালিত হয়। অসমসাহসী দলনেতা জানতে পারেন শত্রুবাহিনীর জন্য খাদ্য ভর্তি একটি জাহাজ খুলনার পথে চালনা বন্দরে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে। প্রচন্ড দুর্যোগপূর্ণ রাত। সন্ধ্যা থেকে প্রবলভাবে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। এমন আবহাওয়া নিয়মিত সৈনিকদের জন্য প্রতিবন্ধক হলেও নৌ-কমাণ্ডোদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল ছিল কয়েকটি কারণে ঃ (এক) শত্রু সৈন্যরা এমন পরিবেশে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। (দুই) তাঁদের গতিপথ শত্রুরা নির্দিষ্ট করতে পারেনা। বর্ষায় ক্ষিপ্ত পশুর নদীতে দুইকূল ছাপিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। এর সাথে ঝড়ের বেগ নদীর স্রোত এবং ঢেউকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সেই আবহাওয়ায় পশুর নদীতে ঝাপ দেয়া কেবল বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন একজনের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু সেদিন এমন অসাধ্য কাজও নৌ-কমাণ্ডোরা সফল করেছিলেন ঠাণ্ডা মাথায় দক্ষতার সাথে।

দলনেতার নির্দেশে সেই রাতে ১৬জন নৌ-কমাণ্ডো শপথ নিয়ে যাত্রা করেছিল শত্রুজাহাজ ডোবাতে। একে অন্যের হাত ধরে সাঁতার শুরু করলেও অল্পক্ষনেই তাঁদের হাতের বাঁধন ছুটে যায়। প্রবল ঢেউ, এক-একজনকে পানির সাথে আছড়ে ফেলতে থাকে। সাঁতরে জাহাজ পর্যন্ত পৌছনো তখন নিতান্তই অসাধ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু অনেকের কাছে যা অসাধ্য ছিল তরুণ এবং অদম্য সাহসী যোদ্ধা জি,এম,এ রহিমের কাছে তা ছিল সম্ভব। সকলকে পিছনে ফেলে সেদিনের কমাণ্ডো রহিম (আজকে মিটফোর্ড ছাত্রাবাস মসজিদের মোয়াজ্জিন) একাই জাহাজে মাইন লাগিয়ে শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত করেছিলেন। এর সাথে ঘটেছিল অসংখ্য শত্রুসেনা আর সমরাস্ত্রের সলিল সমাধি। সেদিনের এই সকল

তরুণের দেশপ্রেম কিভাবে মূল্যায়িত হবে তা ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের দুঃসাহসীকতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী প্রজন্মও দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসবে।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, বিগত দুইযুগে মুক্তিযুদ্ধের এসব কাহিনী জাতির কাছে তুলে ধরা হয়নি। কত ত্যাগ স্বীকারের পর স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে আজকের প্রজন্ম তা জানেনা। মৃত্যুঞ্জয়ী এসব বীরদের ঠিকানাও আজ কেউ রাখেনা। অথচ খোদ মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোদের অভিযান সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেছে। জাপানের NHK এই নৌ-যুদ্ধের উপর চলচিত্র নির্মাণ করতে আগ্রহ দেখিয়েছে অথচ এই দেশের কেউ এবিষয়ে উৎসাহ দেখায়নি যে কারণে এযাবৎ এমন চলচিত্র নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

(চার)

মংলা এবং চালনার নদী বন্দরে বারবার জাহাজ ডুবির ফলে পাকিস্তানী বাহিনী যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সাথে সাথে নিরাপত্তার জন্য তারা নদীতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। স্থলভাগে ও হানাদার বহিনী কম্বিং অপারেশন শুরু করে। ফলে নৌ-কমাণ্ডোরা খুলনায় তাঁদের আশ্রয়স্থল বদল করে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে অত্র এলাকায় সেনা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাবমেরিনার এবং নৌ-প্রশিক্ষণ ঘাটির অন্যতম সংগঠক, গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে আরও একদল নৌ-কমাণ্ডো মংলা এলাকায় পাঠানো হয়। পূর্ব দলের সাথে এই দলের সমন্বয় এবং স্থল যোদ্ধাদের সাথে সমন্বিত হওয়ায় খুলনার দক্ষিণ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি অনেক গুণে বেড়ে যায়।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে রাজনৈতিক সশস্ত্র দলের সদস্য কামরুজ্জামান টুকু, আব্দুস সালাম, জাহিদুর রহমান, স,ম বাবর আলী, শেখ আঃ কাইয়ুম, হুমায়ুন কবীর বালু, মাহবুবুর রহমান হিরণ, মোশারফ হোসেন, রফিকুল ইসলাম, হেকমত আলী ভূইয়া প্রমুখ যোদ্ধাও সমন্বিত যুদ্ধ পরিকল্পনায় সংযুক্ত হন। অপরদিকে সেই সময়ে আশাশুনি থানার রাকাজারদের শক্তি এবং অত্যাচার বহুগুণে বেড়ে যায়। ফলে এই সমন্বিত বাহিনী আশাশুনি থানা দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আশাশুনি থানা দখলে আনা সম্ভব হলে গোটা

এলাকায় তাঁদের চলাচল অবাধ হবে। সে অবস্থায় মংলাসহ অন্য নৌ-বন্দরগুলোতে নৌ-কমাণ্ডোদের অপারেশন চালানোও অনেক সহজ হবে, এমন মনে করে সমন্বিত মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী আশাশুনি থানা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় পরামর্শ এবং প্রস্তুতি শেষ করে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি এক রাতে সম্মিলিত আক্রমণ চালানো হয় থানার ওপর। কিন্তু শত্রু বাহিনী নিরাপত্তা রক্ষার্থে এখানে থানার ছাদসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বাড়ীর ছাদেও সুরক্ষিত বুহ্য বানিয়ে রেখেছিল। সারারাত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর এগারোজন যোদ্ধা মারাত্মক ভাবে যখম হয়। সেদিন প্রচন্ড যুদ্ধের পরও থানা দখল সম্ভব হয়নি। ভোর রাতে মুক্তিবাহিনী পিছু হটে যায়। যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট আরেফিন, গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ, খিজির আলি, কামরুজ্জামান টুকু, স,ম আবর আলী।

পরদিন রাতে একই বাহিনী পুনরায় আশাশুনি থানায় আক্রমণ চালান। এদিন নৌ-কমাণ্ডোরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপর পারে থানার ঘাটে ভাসমান ফেরী পল্টুনে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান। ফলে দখলদার বাহিনী ও রাজাকার যারা ছিল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর সদস্য দির্ঘাঙ্গী খিজির আলি এই যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর সম্মুখেই দন্ডায়মান অবস্থায় দুটি এল,এম,জি, দুই বগলে চেপে গুলি ছুড়তে ছুড়তে থানায় যেয়ে উঠেন। রাজাকার এবং পাকিস্তানী সৈন্যরা তার ভয়াল মূর্তি দেখে অস্ত্র-সস্ত্র ফেলেই পালাতে শুরু করে। এদিন আশাশুনি থানার পতন ঘটে। এরপর পাকিস্তানী হেলিকপ্টার নিয়ে অত্র এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের খোজা শুরু করে। পাক বাহিনী পরদিন হেলিকপ্টার থেকে নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর গুলি ও বোমা ছুড়তে থাকে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় পিছুহটে সুন্দর বনে আশ্রয় নিতে হয়। আশাশুনি থানার পতন হলে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর বাঙ্কার থেকে ১০/১২ জন বাঙালি যুবতীকে উদ্ধার করে। দীর্ঘদিন যাবত তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল। এই যুদ্ধে ৪০ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধার হাতে বন্দী হয়। কমাণ্ডো আঃ সাত্তার ও জহুরুল হক এখানে মারাত্মক ভাবে আহত হন। (মেজর (অবঃ) সামছুল আরেফীনের সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য উদ্ধৃত)

(পাঁচ)

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর জাহাজ নালশীরা ধ্বংস

এরপর সুন্দর বনের অভ্যন্তরে অবস্থান থেকে বেশ কয়েকটি দুঃসাহসিক অভিযান চালান নৌ-কমাণ্ডোবৃন্দ। বনরক্ষী ও কর্মকর্তাদের চিকিৎসার জন্য সুন্দরবনের অভ্যন্তরে চিকিৎসা জাহাজ 'নালশিরা' অবস্থান করছিল। যার নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত ছিল পশ্চিমা মিলিশিয়া ও একদল রাজাকার। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তায় সাবমেরীনার রহমতউল্লাহ (দাদু) নেতৃত্বে আরও একটি দল সুন্দরবন এলাকায় সমবেত হন। লেঃ আরেফিন, খিজির আলী, শেখ কামরুজ্জামান টুকু, স,ম, বাবর আলী পূর্ব থেকেই অত্র এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পক্ষে রেখেছিলেন।

২০ অক্টোবর সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ অন্যান্যের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন সুন্দরবনের মাঝে অবস্থানকারী পাক নৌ-বাহিনীর চিকিৎসা ও উদ্ধারকারী জাহাজ যে কোন মূল্যে ধ্বংস করতে হবে। জাহাজের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য লেঃ আরেফিন ও লেঃ রহমতউল্লাহর সহদর মোঃ আয়ুব আলী কাঠুরিয়ার বেশে ছোট একটি নৌকায় চেপে শত্রু বাহিনীর জাহাজের কাছাকাছি পৌছেন। এমনকি তারা পানি খাওয়ার কথা বলে জাহাজেই চড়ে বসলেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য উভয়ের কোমরে গোজা দুটি রিভলবার। জাহাজে প্রচুর পরিমাণ ঔষধ ও খাদ্য সামগ্রী থাকলেও নিরাপত্তার জন্য দক্ষ সেনা সদস্য ছিলনা। উভয়ে রেকী শেষে ফিরে সিদ্ধান্ত নিলেন সেদিন রাতেই 'নালশিরা' আক্রমণ করতে হবে।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ছোট নদী। স্রোতের তীব্রতা নেই। শত্রুর নিরাপত্তার ব্যবস্থাও দুর্বল। কিন্তু জঙ্গলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সৃষ্টি কর্তাই জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, সাপ, এবং পানিতে অসংখ্য কুমির রেখেছে। অধিনায়ক সেদিক বিবেচনা করে কমাণ্ডো সংখ্যা কমিয়ে মাত্র চারজনকে অভিযানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। যদিও দুটি মাইন এমন মাঝারি আকৃতির একটি জাহাজ ডোবানোর জন্যই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দলনেতার সন্দেহ ছিল কুমিরে কাউকে না কাউকে আক্রমণ করলেও মিশন যেন ব্যর্থ না হয়। উল্লেখ করতে হয়

নৌ-কমাণ্ডোদের প্রতিটি অভিযান পরিচালিত হতো পুরোপুরি নিরাপত্তাহীন ভাবেই। একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এমন আত্মত্যাগ এবং সাহসীকতাপূর্ণ যুদ্ধের নজির কোন জাতি স্থাপন করতে পারেনি। পরিকল্পনাকারীরা জানতেন সকল কমাণ্ডো নির্বিঘ্নে ফিরে আসবেন না। পরিকল্পনার ৫০% ভাগ সফলতা আসবে এমন মনে করতেন। যদিও ফলাফল অর্জিত হয়েছিল অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধে-নৌ-যুদ্ধের ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ অনেক দীর্ঘও বটে।

২০ অক্টোবর রাত ২টা, চারজন কমাণ্ডো আব্দুল গফুর, আব্দুল কাদের, জি,এম,এ গফফার এবং প্রফুল্ল কুমার মিস্ত্রি বুকে মাইন বেঁধে, পায়ে ফিনস পরে কোমরে একটি ড্যাগার গুজে জাহাজের প্রতি সাঁতরিয়ে চললেন। নিকটবর্তী দুরত্বে মাঝারি ও ভারী অস্ত্র নিয়ে কমান্ডোদের নিরাপত্তার জন্য অবস্থান নিলেন, লেঃ রহমতউল্লাহ,লেঃ সামসুল আরেফিন, খিজির আলীসহ ২৫/৩০ জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। নৌ-কমাণ্ডোদের এই ড্যাগার দেয়া হতো কয়েকটি উদ্দেশ্যে (এক) পানির নীচে জাহাজের গায়ে জমা শেওলা পরিস্কার করে সেইস্থানে চুম্বক মাইন স্থাপনের জন্য (দুই) সম্ভাব্য শত্রু বা জানোয়ারের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য (তিন) শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পূর্বে কমাণ্ডোদের এই ছুরির সাহায্যে আত্মহত্যার নির্দেশ ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য যুদ্ধে আত্মঘাতি যোদ্ধাদের সায়ানাইড ট্যাবলেট দেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমাণ্ডোদের এমন কোন ট্যাবলেট বা এর ধারণা দেয়া হয়নি।

২০ অক্টোবর কমাণ্ডোদের দ্বারা 'নালশিরা' জাহাজ ধ্বংসের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিপুল অর্জন বয়ে আনে কারণ জাহাজ ধ্বংসের সাথে সাথে যেমন বেশ কিছু শত্রু সৈন্যর সলিল সমাধি ঘটে পাশাপাশি জাহাজে রক্ষিত প্রচুর খাদ্য, ঔষধ এবং রক্ষিদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে এমন বৈরী পরিবেশে প্রানির মধ্যদিয়ে জাহাজ ধ্বংস হতে পারে তা অভিজ্ঞ পাক সৈন্যদের ধারণার বাইরে ছিল। সাবমেরীনার গাজী রহমতউল্লা এবং অন্যান্য কুশলী যোদ্ধার রণকৌশলের কাছে শত্রুবাহিনী একের পর এক পরাজয় মানতে থাকে। (তথ্যঃ মেজর এ,এস,এম, সামছুল আরেফিন)

(ছয়)

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তায় সাবমেরিনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে ২০ জন কমাণ্ডোর দল পূনরায় চালনা বন্দরে শিবশা নদীতে ৩টি খাদ্যবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেন। এই তিনটি জাহাজ চীন ও পাকিস্তানের পতাকা বহন করছিল। নৌ-কমাণ্ডোদের প্রতিটি আক্রমণ ছিল পরিকল্পিত এবং অতীব সাহসীকতাপূর্ণ। বাস্তব চিত্র সত্যিকার অর্থেই ফুটিয়ে তোলা যায় না। দেশ প্রেমের কথা যারা বলেন, তাঁরা কি আজও মেনে নেবেন তাঁর সন্তান অন্ধকারে বর্ষায় উন্মত্ত পশুর, কিংবা কর্ণফুলির মোহনা অতিক্রম করুক? অপ্রাসঙ্গিক হলেও এলেখা অবতারনার অর্থ হলো, মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটিয়ে তোলা এবং একথা বোঝানোর চেষ্টা করা যে, মুক্তিযুদ্ধ ছিল জাতির কঠিন ত্যাগের পরীক্ষা।

এই মাসের শেষ সপ্তায় বদিউল আলম আরও একটি অভিযান পরিচালনা করেন চালনা নদী বন্দরে। এই অভিযানেও ৩টি জাহাজডুবি ঘটে। এই সকল যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং সময় নির্ধারণ সবকিছুই নির্ভর করতো দলনেতৃবৃন্দের উপর। মংলা বন্দরে শেষের এই যুদ্ধ গুলির পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ, বদিউল আলম, সামসুল আরেফিন এবং খিজির আলী যৌথ পরিকল্পনার মাধ্যমে। কমাণ্ডো বজলুর রহমান এই সকল যুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন। খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল হাতিয়াডাঙ্গায়। এখানে স্থানীয় ৮০ জন যুবককে নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন কমাণ্ডো বজলুর রহমান ও অন্যান্য সিনিয়র নৌ-কমাণ্ডোরা। নভেম্বরের এই অপারেশনের পর মাইন শেষ হয়ে গেলে দলনেতা বদিউল আলম ভারতে ফিরে যান।

(তথ্যঃ বদিউল আলম, বীর উত্তম, জনতা ব্যাংক, হেড অফিস)

(সাত)

নভেম্বরের ২৫ তারিখ সাবমেরিনার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ, কামরুজ্জামান টুকু, খিজির আলি ও লেঃ আরেফিনের নেতৃত্বে ২০০ মুক্তিযোদ্ধা, নৌ-কমাণ্ডো যৌথভাবে কপিলমুনি রাজাকারঘাটি আক্রমণ করেন এবং এর পতন ঘটান। এখানে ১০৭ জন রাজাকার আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। তখন নৌ-কমাণ্ডোরাও

স্থল বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত এই অগ্রাভিযান অবিরত ছিল।

(আট)

খুলনা অভিযানে পদ্মা ও পলাশ

একের পর এক যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী তখন অগ্রাভিযানে রত। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। বিভিন্ন রণাঙ্গণে পরাজয়ের খবর, হানাদার বাহিনীর মনোবল একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে। শত্রু সৈন্যরা তখন পালানোর পথ খুঁজছে। যৌথ বাহিনী তখন প্রায় সকল রণাঙ্গনে শত্রু সেনাকে ঘিরে রেখেছে। আকাশ পথ বিপর্যস্ত হওয়ায় পাক-সেনারা জলপথে পালানোর উদ্দেশ্যে যশোর সেনা নিবাস ত্যাগ করে খুলনার দিকে পিছু হটছে। খুলনার অদূরে শিরমনিতে তারা একটি রক্ষা ব্যূহ তৈরী করে। ১০ ডিসেম্বর মেজর মঞ্জুর ভারতীয় রাজপূত ডিভিশনের এক বিরাট বহর ও মুক্তিবাহিনী সমবিব্যহরে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও ট্যাঙ্ক নিয়ে শত্রু সেনার মুখোমুখি অবস্থান নেন। খুলনার আকাশ তখন মিত্র বাহিনীর পুরোপুরি দখলে। শত্রু সৈন্যের অবস্থান খুজে মিত্র বাহিনীর বিমান অবিরাম বোমা ও গুলি বর্ষণ করে চলেছে। ঐদিনই মেজর জলিল আরও কিছু সৈন্য নিয়ে মেজর মঞ্জুরের সাথে যোগ দেন। সেদিন রাত থেকে শুরু হয় উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ।

বিশ্বখ্যাত পাকিস্তান নৌ-বাহিনী মংলা বন্দরের দখল ছেড়ে খুলনার নৌ-ঘাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অতি দক্ষ ও কৃশলী কমাণ্ডার সুমন্তের অধীনে ও নির্দেশনায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-বাহিনীর দুটি যুদ্ধ জাহাজ পদ্মা ও পলাশ এবং মিত্র বাহিনীর অপর দুই যুদ্ধ জাহাজ চিত্রাঙ্গদা ও এম,ভি পানভেলসহ খুলনা শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। তারিখ ১০ ডিসেম্বর। পদ্মার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এস,কে, মিত্র, পলাশের লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার রায় চৌধুরী, চিত্রাঙ্গদায় ছিলেন BSF-এর দু'জন অফিসার ও লেফটেন্যান্ট কপিল এবং পানভেলে অবস্থানকারী কমাণ্ডার সুমন্ত, পানভেল সহ সম্পূর্ণ নৌ-অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। প্রতিটি গানবোটে বিমান বিধ্বংসী কামান, ডেপথ চার্জার এইচ,এম,জি, সহ দীর্ঘ সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত আধুনিক সমরাস্ত্র ও

পর্যাপ্ত রসদ ছিল। মিত্র বাহিনীর নাবিক এবং নৌ-কমাণ্ডো ও প্রাক্তন বাঙালি নৌ-সেনাসহ সকল রনতরীই নিপূণ ভাবে সাজানো। কিন্তু তার পরেও এই যুদ্ধ বহরের মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে, আত্মঘাতি বিমান হামলায়।

আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ পরিকল্পনায় অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের পাশাপাশি রণকৌশল ও যে গুরুত্ব বহন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালি সেনাধ্যক্ষরা এর স্বাক্ষর রেখেছেন। একই যুদ্ধে ভারতীয় কমান্ডারের ভুল সিদ্ধান্তে বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এক অপরিময়ে ক্ষতি সাধিত হয়।

তথ্যানুসন্ধানে যতদূর জানা যায়, বিজয়ের অতিশয্যে এবং যুদ্ধ জয়ের নেশায় কমাণ্ডার সুমন্ত পরিকল্পনার বাইরে একক সিদ্ধান্তে ৪টি রনতরীকে খুলনাভিমুখে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় বিমানের ছত্রছায়ায় রনতরীগুলি এগিয়ে যাবে এবং ১০ ডিসেম্বর দুপুর দুইটার পূর্বে তা কোনক্রমেই খুলনা শীপ ইয়ার্ড অতিক্রম করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেনা। এছাড়া রনতরীগুলি মিত্রবাহিনীর তা বোঝানোর জন্য জাহাজের ছাদে হলুদ কাপড় বিছিয়ে রাখার নির্দেশ থাকলেও রনতরীগুলি সে নির্দেশ না মেনে দুপুর বারটার পূর্বেই খুলনার জলসীমায় প্রবেশ করে। যে কারণে ঘটে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বৃহৎ বিপর্যয়।

ভারতীয় বোমারু বিমান রনতরীগুলিকে পাকিস্তানী পক্ষের ভেবে এর উপর উপর্যপুরি বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। চিত্রাঙ্গদা ও পানভেল ছিল অনেক এগিয়ে। পদ্মা ও পলাশ ছিল সকলের পিছনে। বিমানের বোমার আঘাতে জাহাজ দুটিতে আগুন ধরে যায়। সাথে সাথে মারা যান ভারতীয় কমাণ্ডার ও নাবিক সহ বেশ কয়েকজন বাঙালি নাবিক ও নৌ-কমাণ্ডো। বিপদ আন্দাজ করতে পেরে আত্মরক্ষার জন্য যারা পানিতে লাফিয়ে পড়েন কেবল তারাই ছিলেন অক্ষত। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা জাহাজ আকড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা হয় শহীদ না হয় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। কমাণ্ডো রফিকুল ইসলামের দেহ বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ ভাবে দ্বি-খন্ডিত হয়ে যায়। বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন (ই,আর,এ) প্রথমেই গোলার আঘাতে আহত হন। বিমান থেকে নিক্ষেপিত গুলিতে তার বামহাত ভেঙ্গে যায়। তিনি ১১ই নভেম্বর তারিখ যুদ্ধে যোগদিয়েছিলেন। প্রচুর রক্তক্ষরণে যখন তিনি যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছেন তাঁরই সহযোদ্ধা এবং অপর নাবিক রুহুল আমিন (সম্প্রতি বাংলাদেশ নেভী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন) আহত বন্ধুকে নিয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়েন। রুহুল আমিনের সাক্ষাৎকার থেকে জানা

যায়, তিনি আহত বন্ধুকে নিয়ে সাঁতরিয়ে কূলে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। প্রবল স্রোতের তোঁড়ে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন আহত অবস্থায় আপ্রাণ চেষ্টা করে সাঁতরিয়ে রূপসার তীরে পৌছতে সক্ষম হলেও পিশাচ রাজাকাররা তাঁকে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে মেরে ফেলে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর মরদেহ রূপসা নদীর তীরে কবরস্থ করে। ১৭ই ডিসেম্বর খুলনা শত্রুমুক্ত হলে, ১৮ তারিখ নৌ-সদস্যবৃন্দ ধ্বংস প্রাপ্ত পদ্মা ও পলাশ থেকে আরও দুটি লাশ উদ্ধার করেন। যার মাঝে একটি মুহিবুল্লাহ (এ,বি) বীর বিক্রমের। জাহাজের ছাদে ৯দিনে তার দেহ শুকিয়ে হাড়ের সঙ্গে কেবল চামড়া লেগে ছিল। সহযোদ্ধাদের তাঁর মরদেহ সনাক্ত করতে কষ্ট হয়নি। অপর শহীদের মরদেহ সনাক্ত সম্ভব না হলেও, স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাঙালি নাবিকেরা উভয়ের মরদেহ রূপসা তীরে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের কবরের পাশে সমাধিস্থ করেন। এই দূর্যয় অভিযানের প্রধান সমন্বয়কারী তৎকালীন লেফটেন্যান্ট পরবর্তীতে মেজর সামছুল আরেফিন সেদিনের মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতিচারণে জানান বিজয়ের পূর্ব মুহুর্তে এতবড় দুঃখজনক ঘটনা ভোলা যায় না। সাথে সাথে সামান্য ভুলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয় তা অপূরনীয়। এ দুটি জাহাজ বিধ্বস্ত নাহলে এরই সিড়ি বেয়ে 'নৌ-কমাণ্ডো' হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়মিত নৌ-বাহিনী হিসেবে রূপদান পেতো। ১০ ডিসেম্বর সহযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি নিহতদের রূপসা তীরে সমাধিস্থ করেন। অধিক আহতদের ঝুঁকি নিয়েও খুলনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান। কম আহতদের উদ্ধার করে ভারতে পাঠান চিকিৎসার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের ইতি-হাসে নৌ-যুদ্ধের ঘটনা সন্নিবেশিত হয়নি। অথচ স্বাধীনতাযুদ্ধে জাতীয় বীরদের বীরত্বগাঁথা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হলে তাঁদের আত্মত্যাগের পাঠ গ্রহণ করে আগামীদিনের সন্তানেরাও দেশকে ভালবাসার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারতো। অগ্রজদের ন্যায় শোষন বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানষিক শক্তি অর্জন করে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মাতৃভুমির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে শিক্ষা লাভ করত।" কিন্তু নির্মম পরিহাস এমনটি এদেশে হয়নি। তবে ভবিষ্যতে যখন মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস লেখা হবে তখন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কমাণ্ডোদের যথাযথ মূল্যায়ন হবে একথা বলা যায়।

খুলনার দক্ষিণ রনাঙ্গনে নৌ-কমাণ্ডোরা নৌ-পথে জাহাজ ডোবানোর পাশাপাশি স্থলযুদ্ধেও অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাদের গুরুত্বপূর্ণ

যুদ্ধগুলির মাঝে কপিলমুনির যুদ্ধ, আশাশুনি থানা দখল, বার আড়িয়ার যুদ্ধ, গল্লামারীর রেডিও ষ্টেশন আক্রমণ এবং খুলনা বিজয়।

এই সকলযুদ্ধে যে সকল কমাণ্ডো অংশ নিয়েছিলেন তাদের মাঝে লেঃ গাজী রহমতউল্লা, ডাঃ মাহফুজুল হক, আলফাজউদ্দিন, যোয়াদুর রসুল, শেখ মহসীন আলী, মুজিবুর রহমান, আঃ কাদের, জি,এম,এ, রহিম, প্রফুল্ল কুমার, আঃ সাত্তার, শেখ আঃ সেলিম, বজলুর রহমান, আঃ গফুর, গোলাম মোস্তফা, জি,এম, গফফার, আব্দুল হাকিম, আব্দুল কুদ্দুস, এস,এম, খলিলউল্লাহ, নুরুল ইসলাম, আলী আশরাফ, জি,এম, মুস্তাফিজুর রহমান, আঃ ওয়াদুদ, শফিক আহমদ, আঃ রহিম, শেখ আঃ কাদের, খলিলুর রহমান। স্থল বাহিনীর গেরিলা ও,বি,এল,এফ, এর সদস্য যাঁরা বীরত্বের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন ঃ- লেঃ সামছুল আরেফিন, শাহজাহান মাষ্টার। কামরুজ্জামান টুকু, জাহিদুর রহমান, আঃ সালাম, শেখ আঃ কাইয়ুম, মশিউর রহমান, মোশারফ হোসেন, সিরাজুল হক ফকির, মাহবুব আলম হিরণ, হুমায়ুন কবির বালু, কামরুল ইসলাম, মোঃ জোবেদ আলী, খিজির আলী, নুরুল ইসলাম মানিক, গাজী আয়ুব আলী, মোশারফ আলী বিশ্বাস, সোহরাব আলী সানা, রফিকুল ইসলাম, রুহুল আমিন শিক্ষক, জামসেদ আলম, মাহমুদ গাজী, ইয়াসিন আলী, মতিয়ার রহমান, লিয়াকত হোসেন, আঃ গণি, মোজাফর, আঃ রহিম, আঃ হামিদ, এনামুল হক, জি,এম, সিদ্দিক, আসাদুজ্জামান, মুস্তাফিজুর রহমান, কামরুল ইসলাম খান, কামরুচ্ছামা, আঃ ওয়াহিদ, মোহিত হোসেন খান প্রমুখ।

চারজন কমাণ্ডোর বন্দী শিবিরে ত্রিশ দিন যাপন

পৃথিবীতে যে কয়জন ব্যক্তি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন, আমরা তাদের অন্যতম। পরম সৌভাগ্য যে, আমরা দেশের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেবার সুযোগ পেয়েছি। পৃথিবীর অনেক জেনারেল কিংবা ফিল্ড মার্শালও সে সুযোগ হয়তো পাননি। দ্বিতীয়তঃ আমরা যেমন মুক্তিযুদ্ধ করেছি একই সাথে শত্রু সৈন্যের অনেক কাছাকাছি পৌছে তাদের বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয়তঃ আমরা অনেক কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও বেঁচে আছি। মুক্তিযুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল ২৬৫ দিন। এর মাঝে অন্তত ৩০ দিন আমাদেরকে শত্রু শিবিরে রাত কাটাতে হয়েছে। সেজন্য সুযোগ পেয়েছিলাম তাদের কার্যকলাপকে কাছে থেকে দেখার।

এখানে শত্রুসেনা এবং তাদের এদেশীয় সহযোগীদের বর্বরতার একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরছি। ১৫ আগষ্ট' ৭১ সহযোদ্ধাসহ মংলা বন্দরে একটি বড় ধরণের অভিযান চালিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় সাতক্ষীরা জেলার বুধহাটাতে আমরা ৬ জন কমাণ্ডো শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ধরাপড়ি। তারিখ ১৮ আগষ্ট, রাত আনুমাণিক ২টা। প্রবল বর্ষণ ও দুর্যোগপূর্ণ রাত, শত্রুরা আমাদের কৌশলে ধরে তাদের বন্দীখানায় আটকে রাখে। দলে ৭ জন ছিলাম। এর মধ্য থেকে কেবল মহসীন আলী পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। শত্রুরা আমাদের নিরস্ত্র করে চোখ এবং হাত বেধে একটা অন্ধকার ঘরে আটকিয়ে রাখে। বুঝলাম পাশের ঘরে তারা কিছু পরামর্শ করছে। একে একে আমাদের নাম ঠিকানা লিখে নিল।

এরপর অন্ধকার থেকে এক-একজনকে পাশের ঘরে নিয়ে পেটানো শুরু করে। আমরা ছয়জন বন্দী অবস্থায় এখানে নির্যাতনকালে আমার অভিজ্ঞতা টুকুর কথা বলি। আমার আগে তিনজনকে পেটালো। আমরা তাদের আত্মচীৎকার এবং গোঙানি শুনে মার এর মাত্রা অনুধাবন করে নিজেদেরও প্রস্তুত করতে লাগলাম। চতুর্থ সময়ে আমাকেও হেচড়াতে হেচড়াতে নিয়ে পাশের ঘরে চিৎকরে শোয়ায়ে, দু'জন দুই হাতের উপর পা দিয়ে চেপে রাখলো। একজন পায়ের উপর পাথরের মতো চেপে রইল। আর একজন তিন ফুটের লোহার রড দিয়ে পায়ের তলায় শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে পেটাতে থাকলো। প্রথমে অসহ্য যন্ত্রণা কিন্তু কিছুক্ষণ পর মনে হতে লাগলো একটা সূচ বা মোটা কিছু পায়ের মাঝ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত এক সময় অবশ হয়ে যায়। তখন ব্যথা অনুভব হচ্ছেনা। কিন্তু জ্ঞান হারাইনি। এরপর-উপুড় করে সমস্ত শরীরে যত্রতত্র পশুর মতো পিটিয়ে টেবিলের পাশে দু'জনে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু পায়ে জোর না পাওয়ায় নূঁইয়ে যেতে থাকলাম। তাতে তাদের আক্রোশ আরও বেড়ে বেশী ভাবে মারতে থাকে। এরপর, একের পর-এক প্রশ্ন। কোথা থেকে এসেছি ? দলনেতা কে? ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, তাদের সংখ্যা? কি কি অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের আছে সব তথ্য জানার চেষ্টা করলো।

আমরা পূর্বেই অন্ধকার ঘরে ঠিক করে ফেলেছিলাম, ধরা পড়েছি মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং জীবন গেলেও সত্য প্রকাশ করবো না। আর সকলে এক কথা বলবো যে, 'আমরা ভারত থেকে পালিয়ে এসেছি'। এর বেশি নয়। কিন্তু হায়েনারা ক্ষ্যান্ত হলোনা। সত্য জানার জন্য নখের ভিতর লম্বা সূঁচ ঢুকিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললো। অসহ্য যন্ত্রনা, তারপরও ব্যর্থ হয়ে পাষন্ডরা নতুন অত্যাচারের কৌশল গ্রহন করে। পায়ে রশি বেঁধে ইটের রাস্তায় শুইয়ে টানতে

লাগলো। পিটের চামড়া উঠে গেল কিন্তু তাদের অত্যাচার নিষ্ফল। আমরা সত্য ঘটনা প্রকাশ করিনি। ভেবেছিলাম মৃত্যু অনিবার্য তাই মুত্যুর আগে যেনো দেশের সাথে বেঈমানি না করি।

প্রথম পর্যায়ে ছয়জনের ওপর এভাবেই অত্যাচার হলো। নিথর-অসাড় দেহ। ছয়জনকে অন্ধকারে ফেলে রাখলো। কিন্তু কেউ জ্ঞান হারাইনি। তেষ্টায় জীবন বের হয়ে যেতে চায়। পানি চাইলেও পানি দিলনা। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে আল্লাকে ডাকতে থাকি। ভোর চারটায় আফতাবউদ্দিনকে ধরে নিয়ে গেলো। দশ মিনিট পরে বাইরে দুটি গুলির শব্দশুনে বুঝলাম আফতাবকে মেরে ফেললো। এর পর পর প্রবল বর্ষা শুরু হয়। হায়েনারা তাঁকে মৃত ভেবে বাইরে ফেলে, ঘরের ভিতর চলে আসে। একটানা বর্ষার পর বাইরে আফতাবের লাশ না পেয়ে খুনীরা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। তাদের লাশের দরকার। তাই এরপর বন্ধু সিরাজুলকে আমাদের থেকে উঠিয়ে নদীর কিনারে দাঁড় করিয়ে বুকে বন্দুক ধরে পুনরায় গুলি। সিরাজুল উচ্চস্বরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বলতে বলতে মাটিতে ঢলে পড়ে। তখন চারিদিক ফর্সা। খুনীরা জানালা খুলে আমাদের বন্ধুকে হত্যা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করে। যার পিছনে মনস্তাত্বিক কারণ ছিল, আমাদের মাঝে ভীতির উদ্রেক ঘটানো যাতে আমরা সত্য প্রকাশ করি। জবাই করা পশুর মতো সিরাজের দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। মৃত্যু যন্ত্রনায় পানি চাইলে পশুদের একজন তার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এমন অমানবিক ভাবেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

১৯ আগষ্ট, আমাদের চারজনকে পুনরায় চোখ বেঁধে একটি যানবাহনে টেনে তোলে। হাত তখন শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা। অন্যপ্রান্ত হয়তো বাহনের শরীরে বাঁধা। ঘন্টা দুই বাদে বুঝলাম কোন শহরে পৌছেছি এবং আমাদের একটি বাড়ীর দোতলায় টেনে ওঠানো হলো। চোখ এবং হাত বাঁধা। মেঝেতে পড়ে থাকলাম, হাত এমন শক্ত করে বাঁধা, কেটে রক্ত ঝরছে। অল্পক্ষণেই শুরু হলো প্রহার। লাঠি দিয়ে নয়, বুট জুতাসহ লাথি। ফুটবলের মতো একসাথে কতজন কিভাবে মারছে বুঝতে পারছিনা। লাথির সাথে শক্ত বাঁধন বাহুকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইছে। গড়াতে গড়াতে চোখের বাঁধন খুলে গেলে সামনে যা ভেসে উঠলো তা নরকের চেয়েও আতংকজনক। বিরাট হলরুমের ছাদে ফ্যানের হুকের সাথে পা বেঁধে ১০/১২ জনকে ঝুলিয়ে রেখেছে। মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আমাদের পূর্বের শিকার তাঁরা। হয় মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যকারী। মেঝেতে বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে আরও কয়েকজন। নিথর দেহ। রক্ত-মাটি মিশে মানুষ কি পশুর মৃতদেহ বোঝার উপায় নেই।

সন্ধ্যায় আবার চোখ বেধে অন্যত্র নেয়া হলো, একটা কাঠের ব্রীজ পার করে। যেই ঘরে নিয়ে চোখ খুলে দিলে, দেখলাম সুন্দর সাজানো, দেয়ালে মানচিত্র এবং তালিকা টানানো। ঘরের কোণে কয়েকটি অস্ত্রও সাজানো আছে। আমরা মেঝেতে বসা। কিছুক্ষণেই বুঝলাম জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখানে আনা হয়েছে। পাশের ঘরে একজন একজন করে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর ড্রইং রুমে ফিরিয়ে আনা হলো। পাকিস্তানী গোয়েন্দা কর্মকর্তার আচরণ অশোভনীয় ছিলনা। তবে তিনি যেমন প্রশ্নবানে সত্যকে জানার চেষ্টা করেছিলেন, আমরাও পরিকল্পিতভাবে সকলে একই উত্তর দিলাম। "ভুল করে ভারতে গিয়েছিলাম বুঝতে পেরে ফিরে এসেছি।" গুলি বিনিময় হয়েছে তা অস্বীকার করলাম। জানিনা তিনি কি ভাবলেন। লিখিত ষ্টেটমেন্ট নিয়ে পুনরায় 'ডায়মন্ড হোটেলে' ফেরৎ পাঠান। এটি ছিল রাজাকারদের নির্যাতন ক্যাম্প।

বাঁধা অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা এমন যে হিপ মেঝে ছুতে পারছেনা। অর্থাৎ আধা ঝুলন্ত অবস্থা। দুই হাত একসাথে করে পিছন দিকে বাঁধা। রাত নয়টা, একদল সৈন্যের আগমন লক্ষ্য করে নিশ্চিত মৃত্যু গুনলাম। শুরু হলো পেটানো। সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত। এর উপর সৈন্যদের এক একটি আঘাত অসহ্য হয়ে উঠলো। সাথী বন্দী একজনের নাম 'মুজিবুর' শুনে তাকে লাথি মেরে মেঝেতে ফেলে গলার উপর বুট জুতাসহ চেপে দাঁড়ালো। তার জিব বেরিয়ে আসলো। ভাবলাম হয়তো এভাবেই তাঁর মৃত্যু হবে। অন্য একজন সৈন্য মুজিবের উপর থেকে হিংস্র সৈন্যটিকে টেনে সরিয়ে নিল। কোমরের বেল্ট দিয়ে এলোপাতাড়ি মার খেয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। নাক-মুখ বিকৃত। সাথের বন্ধুকেও চেনার উপায় নেই। তখন চব্বিশ ঘনটা হয়ে গেছে, পেটে একফোটা দানা-পানি পড়েনি। ঐ দিন বিকালে গোয়েন্দা কর্মকর্তার সামনে হাজির করার পূর্বে এই হোটেলের পিছনে নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি ছবিতোলা হয়। যা পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। একইদিন রাত দেড়টায় একটা ট্রাক হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেবল শব্দ শুনে আন্দাজ করি। তখনও আমাদের চোখ হাত বাঁধা।

লজ্জাজনক হলো রাজাকারদের মাঝে আমার কলেজ জীবনের এক সহপাঠী ছিল ছবিতে (X) চিহ্ন। সাতক্ষীরা কলেজে কিছুদিন একসাথে পড়েছিলাম। সে আমাকে চিনতে পারে। আমিও তাকে চিনি। যখন অন্যান্যদের (যাদের ঝুলিয়ে রেখেছিল) টেনে টেনে নামাতে থাকে আমার ওই সহপাঠিকে গোপনে জিজ্ঞাসা করি, এদের কোথায় নেয়া হচ্ছে? জানালো শহরের অদূরে বীনেরপোতা ব্রীজে নিয়ে বেয়নেট দিয়ে পেট ফেঁড়ে এদের নদীতে ফেলে দেয়া হবে। এবং আমাদের

পরিনতিও একই। এহি ডায়মন্ড হোটেলে সাতক্ষীরার রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকজনের প্রতিদিনের কর্মসূচী। বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু, এর সাথে ব্যক্তি হিংসা চরিতার্থ করার জন্য রাজাকাররা এভাবে অত্যাচারের পর মেরে ফেলতো বাঙালিদের। সে জানালো প্রতিদিন ৪০ থেকে ১০০ জনকে এভাবে মারা হয়। বীনের পোতা এবং বাকাল ব্রীজ ছিল বধ্যভূমি।

সেই রাতে আমাদের মারার জন্য না নিয়ে হোটেলে রাখা হয়। কিন্তু এরপর যা অনুভব করলাম তারচেয়ে মৃত্যুই ছিল শ্রেয়। হত্যার জন্য ওদের নিয়ে যাওয়ার পর হোটেলে শুরু হয় ভিন্ন চিত্র। হোটেলের মাঝখানে হলরুমের চারিদিকে ছিল অনেকগুলি কক্ষ। সেখানে পূর্বেই এনে রেখেছিল বাঙালি যুবতীদের। রাত নয়টায় যে সৈন্যদল উপস্থিত হয়, তারা মেতে উঠে ওদের নিয়ে। মহিলার আত্ম চিৎকারে বুঝলাম কি ঘটছে। কিন্তু আমরাই অসহায়। সারারাত এই অবস্থা চললো। সৈন্যদের একদল বিদায় নিলে, আর এক দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। আমাদের দুই-চারটি লাথি মেরে তারা ওই কক্ষগুলির দিকে এগিয়ে যায়। আবার শুনি আত্ম-চিৎকার, বুঝলাম ভোররাত পর্যন্ত এমন অবস্থা চলে। আমরা চারজন এই একটি রাতের স্বাক্ষী। সাতক্ষীরা ডায়মন্ড হোটেলে '৭১ সালে যা ঘটতো। মুক্তিযুদ্ধ সময়ে সমগ্র দেশের চিত্র ছিল অনুরূপ।

২০ তারিখ সকাল দশটায় আমাদের চার জনকে একটি খোলা জীপে পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন শওকত আনোয়ারের সামনে উপস্থিত করার জন্য সাতক্ষীরার ওয়াপদা রেষ্ট হাউসের সম্মুখে নেয়া হয়। লক্ষ্য করলাম আমাদের দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভীড় জমে গেছে। ক্যাপ্টেনের বাংলোর সামনে আমরা খোলা জীপে অপেক্ষমান। হাত বাঁধা, চোখ খোলা। এর মধ্যেই ক্যাপ্টেনের নির্দেশ হলো আমাদের পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়ে দিতে। তিনি ভোমরা সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্যদের বড় ধরণের বিপর্যয়ের খবর পেয়ে সেখানে চলে যান। এই সুযোগে সাতক্ষীরার মুসলিম লীগের এম,পি গফুর সাহেব এবং দেবহাটা থানার শখিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ মিয়া আমাদেরকে তাদের হেফাজতে নিয়ে নেন। পাকিস্তানীদের সহযোগী হয়েও আমাদের সাতক্ষীরার বাসষ্ট্যান্ডের একটি হোটেলে বসিয়ে জোর পূর্বক মাছ, মাংস, মিষ্টি, দধি দিয়ে আহার করান। ছত্রিশ ঘন্টা পরে এটিই হলো আমাদের খাবার ব্যবস্থা। বুঝলাম গফুর সাহেব ও আব্দুল মজিদ মিয়া আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর আশংকায়

সুস্বাদু খাবার খাওয়ায়ে আত্মাকে তৃপ্ত করাতে চেয়েছিলেন। এখান থেকে আমাদের চারজনকে সাতক্ষীরা থানা হাজতে রাখা হয়। সেসময় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন সৈয়দ আলতাফ হোসেন। বর্তমানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ঢাকার রায়ের বাজারে নিজ বাসভবনে বসবাস করছেন। দ্বিতীয় অফিসার ছিলেন মোয়াজ্জেম হোসেন। '৭৫ পরবর্তীতে এন,এস,আই এর পরিচালক হন। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন।

২২ তারিখ পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেয়ার পূর্বে সৈন্যরা আমাদেরকে সাতক্ষীরা ডাক বাংলোর সামনের মাঠে হাজির করে। সেখানে আমাদের দিয়ে চারটি কবর খুড়িয়ে তারমধ্যে নামিয়ে বুকে রাইফেল ধরে গুলির প্রস্তুতি নিয়ে সত্য বলার জন্য শেষ সুযোগের কথা বলে। আমরা তখনও পূর্বের কথাই বলি। তারা অনেক চেষ্টা করেও এর বেশী কিছু বলাতে পারেনি। আমাদের গুলি করা হয়নি। পুনরায় থানা হাজতে ফেরত পাঠায়।

২৭ তারিখ আমাদেরকে সাতক্ষীরা থানা হাজত থেকে যশোর সেনা নিবাসে স্থানান্তর করে। এই সাতদিনে সাতক্ষীরা থানা হাজতে ইমামবারী ও আমার মা-বাবা দেখা করেন। ইমামবারী ও শহীদ সিরাজুলের বাড়ী সাতক্ষীরা শহরস্থ কাটিয়া গ্রামে। মুজিবুর ও শহীদ আফতাব উদ্দিনের বাড়ী যশোর-নাভারন। আমি এবং ইমদাদুল হক সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানার। সাতক্ষীরা থানা হাজতে ৭দিন থাকা অবস্থায় বাঙালী পুলিশদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দূর্বল মনে হয়েছে। যদিও তাদের সুযোগ ছিল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার, তা কিন্তু করেনি। এ সময় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে যুদ্ধও করেছে। যুদ্ধে মৃত পুলিশের লাশ আনতেও দেখেছি। ভেবেছি চাকুরীর মায়াতেই তারা এ কাজ করছে। এছাড়া দোদুল্য মনোভাব তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। দেশ স্বাধীন হবে কি হবেনা। সেই সময়ে সাতক্ষীরা থানার সাব-ইনসপেকটর সিদ্দিকুর রহমানকে স্বাধীনতা উত্তর পুলিশে উচ্চপদের পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। খুলনাতে দেখা হলে তিনি সহাস্যে হাত মেলাতে এতটুকু লজ্জা পাননি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তির পার্থক্য রক্ষা করা হয়নি। জাতির অগ্রগতির যা ছিল মূল অন্তরায়।

যশোর সেনা নিবাসে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া শারীরিক অত্যাচার হয়নি। তবে এখানে সে ভিন্ন ইতর প্রকৃতির নির্যাতন মেনে নিতে হয়েছে তা সভ্য সমাজে প্রকাশ করা যায়না। তাই মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ ভেবে ১৭ সেপ্টেম্বর '৭১

সন্ধ্যার পর পরিকল্পিতভাবে যশোর সেনা নিবাস থেকে চারজন পালিয়ে যাই। অনেক বিপদ ও ঝুঁকি নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর পূনরায় ভারত পৌছি। মেজর জলিল কৌশলগত কারণে আমাকে ভারতের অভ্যন্তরে না ঢোকার পরামর্শ দেন। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা পুনরায় জিজ্ঞাবাদের জন্য আটক করতে পারে মনে হয় এই সন্দেহে।

দেশের স্বধীনতার জন্য বাঙালীকে অনেক কিছু হারাতে হয়েছে। আজ রাজনীতিকদের মাঝে অনেকের মুখে দেশপ্রেমের কথা শুনে তাদের প্রতি কৃপা জন্মে। এরা দেশপ্রেমিক হলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান থাকবে কোথায়? ভরসা হলো, ইতিহাস মিথ্যে স্বাক্ষী দেয়না। যে মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে, সে তা পাঠ করতে পারেনা। কিন্তু শঙ্কা হলো আজ অন্ধের মত সবকিছুর বিরোধীতা করা হচ্ছে। যার অর্থই হলো রাষ্ট্রের জন্য ধ্বংসের পথ তৈরী করা। আজকের যুব সমাজ সেই ধ্বংসের পথ বেয়েই এগিয়ে চলেছে। জাতির প্রগতির জন্য এর অবসান ঘটানো দরকার। (তথ্যঃ মুজিবুর রহমান, ইমামবারী, ইমদাদুল হক)



রূপসার তীরে চরম অবহেলায় শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের কবর।



পাশে শহীদ মহিবউল্লা বীর বিক্রম এর কবর।

THE ROLE OF VALIENT NAVAL SECTOR IN THE LIBERATION WAR OF BANGLADESH

The activities of the Freedom Fighters, at the first stage were limited in the detection of the associates of the occupying army, destruction of the bridges, culverts and attacking the Pakistani troops on diverse routes. Though the land routes of the occupying army's were not absolutely safe, their waterways were quite safe and sound, After the swearing in of the acting Bangladesh Govt. on the 17th April '71, General M.A.G. Osmani was entrusted with the responsibilities of the Commander-in-Chief of the Freedom Fighting Forces. With a view to making the war extensive and forceful, Gen Osmani divided the whole of the war field into eleven sectors. Excluding the sector No. 10 all other sectors were rendered under the command of some much persons who were designated as Majors and joined the war dissenting from Pakistan Army. All the water-ways, coastal areas and the sea ports chalna and Chittagong comprised the Sector No. 10. It was then known as the Naval Sector.

The prime objective of the formation of this sector, was to disrupt the communication system of the occupying army through our water ways. The incentive to serve the purpose first came from 8 submariners. These submariners were in the Pakistani submarine "MNS MANGRO" which was in a dock yard near TOLON in France for the training of the submariners. Having finished the training when the Mangro was about to sail for Pakistan, the Bengali submariners unexpectedly came to learn about the genocied done by the Pakistani soldiers in Bangladesh in the mid-night of 25th March and on the following day (27th March) they also learnt about the declaration of

Liberation war from the "SHADHIN BANGLA BETER KENDRA" Through the BBC. The undavited submariners then and there decided to join the war of Liberation escaping from the Pakistan submarine. But there arese a problem that their legal documents of traveling i.e. Passports were locked under the care of the captain at the ship. It was a very difficult task to own the passports. But the young adventurous submariner Chowdhury & Badiul Alam took the risk for taking out the Passports. From the locker of the Captain. Having been successful in owning the passports they, along with seven other submariners started for India. After a very troublesome journey they, however, reached Delhi on the 10th April 71.

It was very difficult to resist the easy movement of the occupying in our water ways. Because, there were neither considerable naval persons nor any gun boat at the disposal of the Freedom Fighters. Under these circumstances, Gen. M.A.G. Osmani with consultation of Tajuddin Ahmed took the decision of forming a force of Naval Commandos. In response to his proposal the Indian Naval command sent two teams to select personnel for Naval Commandos from the different training camps of Freedom Fighters located at Asham, Tripura & West Bengal. They, however, selected 357 freedom fighters for the purpose & sent them for training to 'POLASHI' near the river Vagirathi in the district of Murshidabad. This is the very POLASHI where the bright sun of our independence was wer through the defeat of Nowbab Siraj-ud-Daulla to the British Rulers in 1757. A training camp was established for the training of the commandos on the bank of Vagirothi, at one end of the Historic war field, Polashi. The symbolic name of this camp was CAMP - "C-2-P."

The training began with the first batch of Naval Commandos consisting of the 8 submariners, 357 freedom fighters and 8 naval persons who escaped from Pakistan Navy. In the inaugural function of Naval Commando training at the monumental square of Polashi Indian Naval Commando Officer Lt. Cdr. G.M.Martish delivered a grave speech welcoming the Commandos in English. The English verson of his speech was interpreted by submariner A.W. Chowdhury. In consideration of the significance of ther role of Naval commandos they were then addressed as Suicidal squard." Inspired with the psychological influence of the monument of Polashi, the vast history of war field and above all, with patriotism the Naval Commandos that day signed on the suicidal bond.

How hard and tiresome that training was! The trainees had to undergo training eighteen hours per day. Un-armed combat, throwing of hand grandees, explosive demolition, use of Sten Gun & Limpet mine and swimming with the help of fins, were included in the items training It was, as if to finish a training of ten year in ten days.

Camp Commander Capt. M.N. Sumanth, training Commander Lt. Cdr. G.M. Martish Demolition Instruction Officer Lt. Samir Kumar Das, 12 Indian J.C.O.'s, and 8 Bengali submariners were the trainers of the Commandos. The training of the first batch of the Commandos ended on the 3rd August '71. Admiral Nanda, Brg. Sabeg shing of India, Gen. Osmani and Tajuddin Ahmed, the Prime Minister of Bangladesh, were present in the passing our ceremony of the first batch of the Naval Commandos. Commandos were now deployed to run operations at diverse ports of Chittagong, Chalna, Mongla, Chandpur and Narayangonj. At the advent of

crossing the border on Limpet Mine, a light gun for self defence, a pair of fins a nife were given to each of the Commandos a high frequency transistor was also given to each group with the instruction to listen to AKASH BANI, CALCUTTA every evening in order to have the signal of caution and to hit the enemy. They were told when you hear the song 'AMITOMAY SHUNEA CHILAM JATO GANTAR CHAINI KONO PROTIDAN' of great singer Sondha Mukho padhya. Then you must know that you are ordered to be ready for action. When you hear the song 'AMAR PUTUL AJKE PRATAM JABE SHASHUR BARI' then you must mean that you are asked to hit. At. 7P.M., 13th August '71 when the certain frequency was turned on there came the desired melody of the song from AKASH BANI, CALCUTTA. The Commandos got ready for action as they were directed. On the following day (15th August) the Commandos had the ultimate signal of hitting the enemy ships at different ports.

It was dark and deep night there was silence all around. The sentries were half asleep or dozing on the deck of ships or vessels. The current of rivers were in their usual flow. In such a moment of the nature each of the Commandos plunged into the rivers simultaneously fastening a LIMPET MINE with their chests, and the risk of their own lives, they stuck the MINES' with their targeted ships and then flownd away to safe distance. In the small hours of the 15th august the MINES began to burst destroying M.V. "AL-ABBAS, M.V. HORMUZ, M.V. BURMAJADE, M.V. SAPTADINGA, M.V. USS LIGHTENING, ORIENTAL BARGE NO. 6, M.V. 'ORAM', M.V. 'MAHTAB JABED', M.V. 'MORTOJA' M.V. 'ISSUEURK' and many other big and small ships gradually

sank in the river. Karnophuli. The 2nd & 3rd operations were run scatteredly throughout the whole area under sector No. 10. in September & October. These were run in all the small and big rivers and sea ports of the country.

The operations of the Naval Commandos were so effectively crushing that the Dainik "Purbadesh", Circulated by the Pak. Govt. was bound to flash news admitting the heavy loss done by the destructive operations of the commandos. The news of this operations were even published as head lines on the first pages of almost all distinguished news papers of the west. Such as with this, the struggling people of Bangladesh, specially the Freedom Fighters got indomitable inspiration for fighting with more sanguinity. They became sure of their success within a short time. On the contrary the morale of the barbarous hordes and their associates broke down. The war of liberation then took an extensive turn. The commandos were highly appreciated throughout the old for their unprecedented role in it the waterways then became quite dangerous for transportation.

In this context Major Rafique, Bir-Uttom, Commander, Sector No.1, remarked in his esteemed book 'A tale of Millions' that the activities of Freedom Fighters were in fact, disappointing and the world communities were not quite aware of our war of Liberation till June/July '71. But the operation "ZACKPOT" run by the Naval Commandos in the small hours of 15th August caused a heavy shake in the conscience of the world communities. Immediately after that there came a revolutionary change in our war of liberation. The Late Hero, Major Zalil (Commander, Sector No.9,) also admitted the unprecedented role of the Naval Commandos in his book "Shimahin Samar."

In the meantime, few other Naval soldiers escaped from Pakistan Navy and joined the war of liberation while fighting under different sector commanders. At that time the exiled Govt. of Bangladesh collected two tug-boats namely 'AJOYA' and 'AKHAYA' from the India Govt. on the 10th of November at Calcutta. They turned them into gun boats by setting 40/60 Buffer Guns and named them as "PADMA' and "PALASH".

Soon after the bombardment done by Pakistan in amritishar of India on 3rd Dec.'71, the Indian Govt. recognised Bangladesh and the total scene of the war changed then and there. Having formed allied Forces the Indian Army & the Freedom Fighters jointly attacked the Occupying forces. In the face of the fierce and irresistible attack of the Joint Forces the Pak. Troops began to retreat from almost all the places. Having heard the news of the retreat of pak-troops from Jessore to Khulna on the 6th December '71, the "PADMA" and "Palash" proceeded to Khulna from the port Holdia in Medinipur. They were then backed by "INS PANVAL" & "CHITRANGADA" gun boat of Indian Navy. all these 4 gun boats were under direct command of Commander. Sumanth. In this operation there were 41 Bangladeshi Naval Personnel, 10Naval Commandos & 6 Indian Sailors when at 12. A.M. on the 10th December '71 the gun boats "PADMA", & "PALASH" CHITRANGADA and "PANVEL" Stdadily reached near the shipyard of Khulna, there appeared three"Bombing Planes" high in the sky. As a Result of the bombardment M.V. PADMA and POLASH, were destroyed and sank in the river. Some of the naval personnel including naval commandos were either martned (shaheed) or seriously injured. All of those who escaped death jumped into the river RUPSHA. Within a few minutes the bombing fighters again



স্বাধীনতা উত্তর চট্টগ্রামে ৪জন ভারতীয় প্রশিক্ষকসহ একদল নৌ-কমাণ্ডো।

cameback and bombed on the Gun boat. At this time, the left hand of Ruhul Amin was blown off. Being seriously Ruhul Amin got down from the boat on the bank. as irony of fate there were already some Rajakers on the bank. As soon as the brutes saw Ruhul Amin they made a brush fire at his head. Six bullets of the Rajakers smashed his head.

Not only Ruhul Amin eight other Naval Personel and Naval Commando name Rafique; embraced martyrdom (Shahadat) that day.

In such a sanguinary was i.e. in exchange of lives and blood of Millions of shaheeds we achieved our long cherished Independence and through such expeditions and self sacrifice of the submariners & Naval Commandos started the origination of Bangladesh Navy

কমান্ডো বোরহানউদ্দিন আহ্‌মদ

এস. পি. ও জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১। নাম ঃ বোরহান উদ্দিন আহ্‌মদ

২। পিতার নাম ঃ প্রকৌশলী জনাব এরফান উদ্দিন আহ্‌মদ

৩। ভাইবোনদের মধ্যে কততম ঃ সবার বড়

৪। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ কলাকান্দা, পোষ্ট ঃ ছেঙ্গার চর বাজার, থানা ঃ মতলব, জেলা ঃ চাঁদপুর।

৫। ছাত্রজীবন ঃ স্কুল ঃ ফরিদপুর, জামালপুর, খুলনা, যশোর কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্কুলে অধ্যায়ন। তবে ছেঙ্গারচর হাই স্কুল চাঁদপুর থেকে এস, এস, সি পাশ। কলেজ ঃ ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা ও চাঁদপুর কলেজ, চাঁদপুর।

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৬। ২৫শে মার্চ '৭১ এর পূর্বে কি করিতেন ? ঃ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র।

৭। কি কারনে / পরিস্থিতিতে যুদ্ধে দিয়েছিলেন ঃ দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার ডাক ও আমার বাবার অনুপ্রেরনায় আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগদেই।

৮। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা ঃ চাঁদপুরের প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্ত নৌ-যুদ্ধে স্বক্রিয় অংশ গ্রহন।

৯। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের তারিখ ঃ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের মাঝামাঝী সময়।

১০। কোন ট্রানজিট ক্যাম্পে যোগনিয়েছিলেন ঃ বক্স নগর ক্যাম্পে, ত্রিপুরা।

১১। বর্তমান কর্মস্থল ঃ জনতা ব্যাংক, প্রথান কার্য্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

১২। যুদ্ধ শেষে কি করলেন ঃ শিক্ষা জীবনে ফিরে যাই। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৩। সন্তান সন্ততি ঃ ২ (দুই) ছেলে।

১৪। সামাজিক অবস্থান ঃ সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, জনতা ব্যাংক।

১৫। রাজনীতির সাথে জড়িত কি না ? ঃ সরাসরি রাজনীতির সহিত জড়িত নই, তবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী।

১৬। সামাজিক / মুক্তিযুদ্ধের সংগঠনের সাথে জড়িত কি না ? ঃ ১৯৬৬ সালে ছাত্রলীগের সদস্য পদ লাভ করি। বিভিন্ন সময় ছাত্রলীগ মহকুমা কমিটির বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। রাজনৈতিক কারনে ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭৬ সালে কারা বরন করি। তবে কোন বারই দোষী প্রমানিত হই নাই।

বর্তমানে বাংলাদেশ নৌ-কমান্ডো এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ-সচিব।

১৭। রাজনৈতিক ধ্যান ধারনা ঃ অবাধ গণতন্ত্র ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

১৮। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মূল্যায়ন ঃ সময় উপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত। জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।

১৯। যুদ্ধের স্মরনীয় ঘটনা ঃ ১৫ই আগষ্ট '৭১ রাতে চাঁদপুর সফল অপারেশন শেষে আমরা যখন ডাকাতিয়া নদী পেরিয়ে মেঘনার বুক বেয়ে বেয়ে চাঁদপুরের দক্ষিনে পৌছাই তখন ভোর। আমি বদিউল আলম, বীর উত্তম সহ কয়েকজন পাকবাহিনীর দোষর রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ি। পরে বিভিন্ন কলাকৌশল ও তাদেরকে ভয় দেখিয়ে আমরা নিরাপদে গাঁ ঢাকা দিতে সক্ষম হই। যখন পাকিস্তানী বেতার থেকে প্রচার করা হচ্ছিল যে চাঁদপুরের দলনেতা সহ কয়েকজন নৌ-কমান্ডো ধরা পড়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যে জিনিষটি আমার মনে সব চাইতে বেশী নাড়া দেয় তা হলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আমার পিতা জনাব এরফান উদ্দিন আহ্মদ তখন ওয়াপদার নির্বাহী প্রকৌশলী। কর্মস্থল দিনাজপুরে। মা আসিয়া বেগম আমাদের ভাইবোন সবাইকে নিয়ে চাঁদপুর শহরে বসবাস করেন। ২৫শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আমার শ্রদ্ধেয় বাবা পাকিস্তানীদের সহিত অসহযোগিতা আরম্ভ করে তার কর্মস্থল ত্যাগকরে কিছুই না এনে পায়ে হেটে দিনাজপুর থেকে গ্রামের বাড়ী চাঁদপুরের মতলবে এসে পৌছান। অপরদিকে আমার মাও ভাইবোন সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়ী মতলব চলে আসেন। আমি এপ্রিল '৭১ মাঝামাঝি সময় আমার বাবার অনুপ্রেরনায় ভারতের বক্স নগর ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীতে যোগদেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাড়ী যেয়ে যানতে পারলাম আমাকে ধরার জন্য আমার গ্রামের বাড়ী কলাকান্দায় রাজাকাররা এসে আমাকে না পেয়ে আমার বাবাকে মারার জন্য বাড়ীর বাহিরে নিয়ে যায় এবং বাড়ীতে ডাকাতি করে। আল্লাহ্তালার অশেষ রহমতে আমার বাবাকে ওরা মারতে সক্ষম হয় নাই, তবে তাকে হাত পিছনের দিকে দিয়ে এমনভাবে বাঁধেযে এতে করে আমার বাবা জ্ঞান হারায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেল আমাদের চাঁদপুর শহরের ও দিনাজপুরের দুটি বাসাও লুট হয়ে গেছে রাজাকার/পাকিস্তানীদের দোষরদের দ্বারা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার এই সব ঘটনা আজও যখন আমি একা থাকি তখন আমার মনকে নাড়া দেয়।

২০। স্বাধীনতার ঘোষনা কোনদিন আপনি শোনেন ঃ আমার স্মৃতিতে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই স্বাধীনতার ঘোষনা হয়ে আছে।

২১। কার আহ্বান/অনুপ্রেরনায় যুদ্ধে গিয়েছিলেন ঃ দেশ মাতৃকার জন্য আমার ভালবাসা আর দায়িত্ব বোধ ও বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ও আমার শ্রদ্ধেয় বাবা প্রকৌশলী জনাব এরফান উদ্দিন আহ্মদ এর অনুপ্রেরনায় আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম।

২২। বিজয়ের মুহুর্তের অনুভুতি কি ছিল? ঃ বিজয়ের আনন্দে স্বাধীন মাটিতে দাড়িয়ে শুধু আমার চোখদিয়ে আনন্দের অশ্রু ধারাই বইছিল। কেননা এ স্বাধীনতা কারো দয়ায় নয় এ স্বাধীনতা লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত আর ভাইয়ের প্রানের বিনিময়ে পাওয়া।

২৩। জামাত শিবিরের রাজনীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করুন ঃ চিহ্নিত অপরাধী ও মৌলবাদী ছাড়া যারা দেশ গড়ার কাজে আত্ম উৎসর্গে করবে তাদেরকে ক্ষমা করা যেতে পারে। জামাত পশ্চাদপদ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক।

২৪। পূর্ব এশিয়ার দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করুন ঃ সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জন শক্তিকে শ্রম শক্তি হিসাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে দেশ তার দারিদ্রতা ঘোচাতে সক্ষম হবে। আমরা সময়ের অপচয় করি।

২৫। দেশ সম্বন্ধে আজকের ভাবনা/অনুভুতি ঃ ধনী দরিদ্র সবাইকে নিয়ে দেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাক এবং গড়ে উঠুক। অশিক্ষা এবং দারিদ্রতা সমাজ অগ্রগতির বড় অন্তরায়।

২৬। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে আপনি কি করেন ঃ যাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং ঐ দিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেই।

২৭। দেশে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়িত না হওয়ার কিকি কারন বলে আপনি মনে করেন ? ঃ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি সমূহের অনৈক্য এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী গোষ্ঠী সমূহের নীল নকশার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কারগারে চার জাতীয় নেতা এবং কর্ণেল তাহের, জেনারেল মঞ্জুর, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধার হত্যা এবং সময় উপযোগী বলিষ্ট নেতৃত্বের অভাব। একাত্তরের পরাজিত শক্তি দেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি পক্ষান্তরে তারা আধিপত্তবাদীদের সহযোগিতায় স্বাধীনতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, স্বার্থান্বেষী মহলের সহযোগিতায়।

২৮। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট সম্বন্ধে কিছু বলুন ঃ সেদিন ছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ তথ্যমূলক পরীক্ষার দিন। কিন্তু আমাদের প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির কারনে আমাদের পরীক্ষা সম্ভব হলো না। সকালে মেজর ডালিম সহ ঘাতক চক্রের আরও কয়েক জন আমার হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক

হল) ঘেরাও করে এবং হাউজ টিউটর সহ আমাদেরকে মারার জন্য হলের মাঠে নিয়ে যায় কিন্তু পরে আল্লাহর রহমতে ওরা আমাদের আর মারতে সক্ষম না হয়ে ১/২ ঘন্টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে চলে যায়। ওদের ধারনা ছিল যদি কোন ধরনের বাঁধা আসে তা সার্জেন্ট জহুরুল হক হল থেকেই আসবে। সুযোগ পেয়ে আমরা দ্রুত হল ত্যাগ করি এবং বিভিন্ন হলের সহপাঠী ও বন্ধুদের খোজ খবর নেওয়ার জন্য চলে যাই। আমার সবচেয়ে বেশী নাড়াদেয় যখন দেখতে পেলাম বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক মানুষের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাশ ঘরে নিয়ে আসা হচ্ছে ঠেলা গাড়ীতে করে হোগলা পেচিয়ে। লাশ ঘরে গিয়ে দেখি বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর লাশ ওখানে এলো পাতড়ী পড়ে আছে। আর একটি বিষয় আজও আমাকে নাড়া দেয় তা হলো বিকালে যখন দেখতে পেলাম রোকেয়া হল ও সামসুন নাহার হলের গেটে তালা ঝুলছে। মেয়েরা সবাই হলের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, বাহির হওয়ার কোন পথ নেই কিন্তু হলের ভিতরে নাকি চুলাও জ্বলছে না । সারাদিন না খাওয়া মেয়েরা জানেনা হলের বাহিরে কি পরিস্থিতি। বারবার রেডিও থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। একদিকে জীবনের অনিশ্চয়তা অন্য দিকে বন্দীজীবনের জ্বালা। সে মুহুর্তে সুধু ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম "আমরা সারাদিন না খাওয়া খিদেয় প্রান যায়।" তাড়াতাড়ি করে পকেটে যা সম্বল ছিল তা দিয়েই কিছু পাউরুটি কিনে গেটের নীচ দিয়ে তাদের হাতে দিতেই ভিতর থেকে নিয়ে গেল। সেদিন আমার মনে হয়েছিল জাতি আজ যাকে হারালো, আজ না হলেও একদিন তার অভাব অনুভব করবে। কি দূর্ভাগ্য আমাদের।

২৯। প্রিয় নেতা কে ঃ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৩০। জীবনের সেরা অর্জন ঃ স্বাধীনতা অর্জন।

৩১। জীবনের সেরা পাওয়া ঃ মুক্তিযুদ্ধে আশ গ্রহন করতে পারা।

৩২। জীবনের সেরা ব্যর্থতা ঃ চিহ্নিত করিনি।

৩৩। সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কমান্ডো ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জন্ম ঃ বুরুন্দিয়া, পাকুন্দিয়া, জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ
সন ঃ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ ইং
এস, এস, সি ১৯৬৪ প্রথম বিভাগ, ১২শ স্থান
এইচ, এস, সি ১৯৬৬ প্রথম বিভাগ, ১৬শ স্থান
বি, এস, সি (অনার্স) ১৯৭০ প্রথম শ্রেণী ২য় স্থান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম, এস, সি রসায়ন, ১৯৭১ প্রথম শ্রেণী ২য় স্থান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম, এস ১৯৮২, খানজাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইশিকাওয়া, জাপান
ডি, এস, সি ১৯৮৫, তোহোকু বিশ্ববিদ্যালয়, সেনদাই, জাপান
বর্তমান ঃ প্রো-ভাইস চ্যাঞ্চেলর জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।
প্রাক্তন ঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭২-৭৭
প্রাক্তন ঃ সাধারণ সম্পাদক (২ বার), সহ-সভাপতি (১ বার), জা. বি. বি. শিক্ষক সমিতি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ে সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য।
ভাইস চেয়ারম্যান, জাঃ বিঃ বিঃ গভর্নিং বডি। (তিন টার্ম)
আজীবন সদস্য, বাংলা একাডেমী
নির্বাহী পরিচালক, স্প্রেড, বাংলাদেশ।
(Society for Promotion of Rural Education And development, SPREAD)
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমান্ডো এসোসিয়েশন।
পিতা- মরহুম মোঃ ওসমান গণি সর্দার ছেলে আলাউদ্দিন।

১৯৬৪ সালে স্থানীয় কটিয়াদী হাই স্কুল হতে এস, এস, সি পাশ করেন। একই সালে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হন।

৬২ সাল। কিশোরগঞ্জে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলনের কর্মী হিসাবে আলাউদ্দিনের ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ। ৬৪ হতে ৬৬ সাল পর্যন্ত কলেজ ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন জনাব আলাউদ্দিন। এ সময়ে আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান খান, এ কে এম শামসুল হক,

গোলাপ মিয়া প্রমুখের কথা স্মরণে আছ তাঁর। ছাত্রলীগ নেতাদের মাঝে আব্দুল হামিদ, মালং প্রমুখের কথা তিনি স্মরণ করতে পারেন ।

৬৬ সালে এসে ভর্তি হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ভাল না লাগায় তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে। ফজলুল হক হলে উঠেন। এরপর হতে ৭১ এর মার্চ পর্যন্ত ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে অবদান রাখেন।

৭১ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুর্যসেনা গ্রুপ গঠিত হয়। এ গ্রুপের অন্যতম নেতা ছিলেন মনিরুল হক ওরফে মার্শাল মনি। এ গ্রুপের উদ্যোগে ইকবাল হলে অস্ত্র ট্রেনিং দেয়া শুরু হয়। জনাব আলাউদ্দিন এ গ্রুপের সদস্য হয়ে ট্রেনিং এ অংশ নেন। এ সময়ে আরো যাঁদের কথা তাঁর মনে আছে তাঁরা হলেন ঃ ডঃ আনোয়ার হোসেন, ডঃ রেজাউল করিম, মেজর সাদেক, সারোয়ার খান, হাবিবউল্লাহ, ডঃ নুরুন্নবী প্রমুখ।

ডঃ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একবার রসায়ন বিভাগ হতে মলোটভ ককটেল বানানোর জন্য ক্যামিকেলস্ নিয়ে যাওয়া হয়। ডঃ আলাউদ্দিন এ কাজে জড়িত ছিলেন। এ মলোটভ মার্চে ঢাকার রাস্তায় বিভিন্ন সময়ে মারা হয়েছিল।

২৩শে মার্চ ডঃ আলাউদ্দিন বাড়ী যান পায়ে হেটে। ২৬শে মার্চ কোলকাতা বেতার হতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সংবাদ পান। ঢাকার সংবাদ শোনেন। এলাকাতে সাথে সাথে মুস্তাফিজুর রহমান (চুন্নু মিয়া), হামিদ প্রমুখের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। এরপর ঢাকা হতে হাজার হাজার লোক চলে আসতে থাকে গ্রামে। এলাকার জনগণকে সাথে নিয়ে তাঁদের সহযোগিতা করতে থাকেন আলাউদ্দিন।

মে মাসের দিকে ভারত রওয়ানা দেন আলাউদ্দিন ইতিপূর্বে প্রথমবার ভারত যাত্রা বাঁধাপ্রাপ্ত হন। আড়াই সিধা গ্রাম হতে নবীনগরের কাইতলা গ্রামে পৌছেন। পরে কসবাতে যান। ওখান হতে ভারত। আগরতলা এস টি হোটেলে দেখা পান আ স ম রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাহজাহান সিরাজ প্রমুখের। এঁরা সবাই ছিলেন ছাত্রলীগ ও বি এল এফ নেতা।

আলাউদ্দিনের সাথে সব সময়ই ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিসহ আরো দুইজন। তাদের সাথে সেনা অফিসার আছে শুনে আগরতলা হতে আলাউদ্দিন-মতিদের পাঠিয়ে দেয়া হল অন্যস্থানে। সেখানে গিয়ে এম আর সিদ্দিকি, জহুর আহমদ চৌধুরীর দেখা পান আলাউদ্দিন। এঁদের নাম তিনি আগে শুনেছেন। আওয়ামী লীগ নেতা। যুদ্ধের অন্যতম পরিচালক। তাঁরা ক্যাপ্টেন মতিকে অনেকক্ষন জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে ক্যাপ্টেন মতি সহ সবাইকে বি এস এফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে চারজনকে আলাদা ভাবে রাখা হন। মুলতঃ ক্যাপ্টেন মতিকে সন্দেহবশত গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ খবর জানতে পেরে আতংকিত হন জনাব আলাউদ্দিন। এর মাঝে ক্যাম্পে একদিন এলেন আবদুল কুদ্দুস মাখন। আলাউদ্দিন তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। মিজান চৌধুরীকেও সব জানান হল।

হঠাৎ ক্যাম্পে একদিন মেজর জিয়াউর রহমান এলেন। মতিকে গ্রেফতার করা হলেও তাঁকে ক্যাম্পে ঘুরতে দেয়া হত। ক্যাম্পে ঘুরাঘুরির সময় মেজর জিয়াকে দেখে মতি স্যালুট দেন। মেজর জিয়া চিনতে পারলেন মতিকে। আলাপ হয় দু'জনের মাঝে। ক্যাপ্টেন মতিকে সাথে করে নিয়ে যান মেজর জিয়া। সাথে মতির ভাইও যান মতির সাথে।

ক্যাম্পে থেকে যান আলাউদ্দিন ও আব্দুর রহিম। দু'একদিন পর জনাব মাখন আসেন ক্যাম্পে। তিনি এ দু'জনকে নিয়ে যান কর্ণেল রব এর কাছে। তিনি অফিসার হিসেবে আলাউদ্দিন ও রহিমকে রিক্রুট করেন। এর মাঝে চোখে ভাইরাস রোগ দেখা দেয় দু'জনের। ফলে বিলম্ব হয়ে যায় ট্রেনিংএ যেতে ।

একদিন দু'জন দেখা করেন কর্ণেল রব এর সাথে। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেন স্বাধীনতার পর তাঁদের কি হবে, তাঁরা সেনাবাহিনী ছেড়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে পারবেন কিনা? রব সাহেব উত্তরে স্পষ্ট কিছু বললেন না। সন্দেহ হল দু'জনের। সেনা বাহিনীর অফিসার হিসেবে যোগ দিলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে পারবেন না। তাঁরা জানিয়ে দিলেন– সেনাবাহিনীতে আর যোগ দিবেন না।

এরপর তাঁদের পাঠান হল নৌ-কমান্ডো ট্রেনিংএ। এভাবে আলাউদ্দিন নৌ-কমান্ডো হয়ে গেলেন। নৌ-কমান্ডো ট্রেনিং শেষে তিনি এলেন ১০ নং সেক্টরের অধীনে। তখন আগষ্টের মাঝামাঝি সময়।

নৌ-কমান্ডো হিসেবে আলাউদ্দিনের প্রথম অভিযান "অপারেশন জ্যাকপট।" বিশ্ববিখ্যাত এ অপারেশনে তিনি অংশ নেন মংলা পোর্টে। সেদিন বন্ধুদের সাথে ছয়টি জাহাজ ডোবান।

এরপর এ এস ভূইয়ার নেতৃত্বে মেঘনা ব্রীজ ধ্বংসের জন্য অভিযানে অংশ নেন।

কমান্ডো দেলোয়ার হোসেন

উপ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

দেলোয়ার হোসেন, পিতা মরহুম হাজী আব্দুল অদুদ ভূঞা, ফেনী সদর থানার ফাজিলপুরে ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার নয় সন্তানের মধ্যে প্রথম। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একজন উপ সচিব। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে চাকুরী লাভ করেন। স্কুলে দুরন্ত যুবক। ১৯৬১ সালে নিজ গ্রাম ফাজিলপুরে ডব্লিউ, বি, কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রেক পাশ করে কাউকে না জানিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে করাচী ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৭০ সালে ডিগ্রী নিয়ে তৎকালীন ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকুরীতে ঢোকেন। চাকুরী জীবনে ঢোকার পর জনাব দেলোয়ার প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাঙালিদের প্রতি পশ্চিমাদের ঘৃণা। সেদিন একান্ত খেয়াল বশে যুবক দেলোয়ার পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেও এক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ইসলাম এবং ভ্রাতৃত্বের কথা বললেও তারা দেশের পূর্ব অঞ্চলকে একটি উপনিবেশ হিসেবে মনে করতো। সর্বক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মাঝে বিরাট বৈষম্য দেখে ক্রমান্বয়ে তার মন বিদ্রোহী হতে থাকে। ইতিমধ্যে দেশের পূর্ব অংশে (তাঁর জন্মভূমির) মানুষ ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করলে তিনি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। '৭০ এর সাধারন নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলে অনেক স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে জনাব দেলোয়ার '৭১ এর ১লা ফেব্রুয়ারীতে ছুটি নিয়ে বাঙালির প্রথম জাতীয় সংসদ অবলোকন করার জন্য নিজ ভুমিতে চলে আসেন কিন্তু সকল আশা ভঙ্গ হয় ২৫শে মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকাসহ সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালি নিধন শুরু করে।

প্রতিভাবান, সমাজ সচেতন এবং দেশপ্রেমিক যুবক, আপন ভাই, চাচাত ভাই, চাচা ও অন্যান্য যুবকসহ ১৮ই এপ্রিল '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশে ভারতের পথে রওয়না দেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে একই তারিখে হরিনা ক্যাম্পে পৌছে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নাম লেখান। এই ক্যাম্পে সেসময় গেরিলা প্রশিক্ষন দান শুরু করেছেন (বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকরা সবে।) একমাস এখানে প্রশিক্ষন গ্রহন এবং মাঝে মধ্যে সীমান্তে নিয়মিত বাহিনীর পক্ষত্যাগকারী বাঙালী সৈনিকদের সাথে মিশে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। দিনে দিনে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং সাহস বাড়তে থাকে। তখন যুদ্ধ কি, তা না বুঝলেও বেশ ভালই লাগতো। যদিও ক্যাম্পে থাকা ও খাওয়ার প্রচুর

কষ্ট ছিল। ভারত সরকার তখনও পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেনি প্রত্যক্ষ করেন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে জমা হচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয় বি, এস, এফ এর সহযোগীতায় ক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে। যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী অপ্রতুল। বাঙালি সৈনিকরা যে সমস্ত অস্ত্র হাতে নিয়ে আসেন, তাই দিয়ে মাঝেমধ্যেই আক্রমন পরিচালিত হচ্ছিল। ছাত্র যুবক যারা যুদ্ধে এসেছিলেন, কেবল সহযোগীর ভূমিকা পালন করছিল দেলোয়ার হোসেন তখনও পর্যন্ত একই ভাবে চলছিলেন। জুন মাসের প্রথমে ক্যাম্পে উপস্থিত হন একদল পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা। তাঁরা উচ্চতর বিশেষ প্রশিক্ষন দানের জন্য যোদ্ধা নিয়োগের উদ্দেশে ক্যাম্পে এসেছিলেন। এই দলে মনোনীত হয়ে যুবক দেলোয়ার ও সামরিক ট্রাকে চেপে অজানার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে প্রথমে আগরতলা পৌছেন। সেখান থেকে ট্রাকে চেপে বকসনগর। তারপর ট্রেনে করে হাওড়া রেল ষ্টেশনে পৌছায়। ওখানে আরজও ৮৩ জন যুবক সহ পলাশী নৌ-প্রশিক্ষন ক্যাম্পে পৌছান। এখানে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের জানা সম্ভব হয়নি কিজন্য আনা হলো। ক্যাম্পে পৌছনোর পর বুঝতে পারেন যে ক্যাম্পে আনা হয়েছে এটি নৌ প্রশিক্ষন ক্যাম্প। পরদিন থেকে তাদেরও একই প্রশিক্ষন শুরু হয় অন্যান্য প্রশিক্ষনার্থীর সাথে। দুইমাস প্রশিক্ষন গ্রহনের পর দেলোয়ার হোসেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য। তখন তিনি একজন দুঃসাহসী নৌ-কমান্ডো। আত্মঘাতিদলের সদস্য।

১৫ই আগষ্ট, 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিকল্পনায় তাঁকে পাঠানো হয চট্রগ্রাম বন্দরের জন্য মনোনীত ৬০ জন কমান্ডোর একজন সদস্য হিসেবে। ১২ তারিখ তাঁদের ২০ জন কমান্ডোর দল এসে পৌছে চট্রগামের ফৌজদার হাটে। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মুখে তাঁরা এখানে এসে আটকা পড়েন। সঠিক সময়ে শহরে পৌছতে না পারায় তিনি প্রথম অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। পলাশী প্রশিক্ষন ক্যাম্পে ফিরে আসেন যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার ব্যথা নিয়ে। অক্টোবর মাসে পুনরায় তাঁকে একটি দল নিয়ে সন্দ্বীপ পাঠানো হয়। সন্দ্বীপ হতে ভোলা পর্যন্ত সকল বয়া ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তিনি সন্দ্বীপ ও অত্র এলাকায় যুদ্ধ করেছেন।

ডিসেম্বরের শুরুতেই সন্দ্বীপ শত্রুমুক্ত হলে তিনি সদলবলে প্রত্যাবর্তন করেন। ডিসেম্বরের ৮ তারিখ বিজয়ী যোদ্ধার বেশে তিনি ফেনীতে বাবা-মার কাছে ফিরে আসেন। ফেনী তখন শত্রুমুক্ত, তাই বিজয় অর্জন পর্যন্ত তিনি বাড়ীতে অবস্থান

করেন। ১৬ই ডিসেম্বর দখলদার বাহিনী সম্মিলিত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করলে কমান্ডো দেলোয়ার হোসেন ঢাকা চলে আসেন, দেশ গড়ান প্রত্যয় নিয়ে।
১০ই জানুয়ারী, বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি অস্ত্র স্বরন করে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাবার আহ্বান জানালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে পূর্বের চাকরীতে ফিরে যান। ১৯৭৩ সালে ক্যাডার (সিভিল) সার্ভিস পরীক্ষায় মনোনীত হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে উপ সচিব হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। স্পষ্টবাদী, সৎ, দায়িত্বশীল, পরিশ্রমী কর্মকর্তা। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন তাঁর জীবনে সেরা অর্জন বলে মনে করেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বাঙালি জাতিকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন নিয়ে তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। নয়মাসের যুদ্ধে দেশ স্বাধীন হওয়াটাকে ঠিক মনে করেন না। যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের চিহ্নিত সম্ভব হতো। তারফলে '৭৫ এর ১৫ আগষ্টের ট্রাজেডি এড়ানো যেতো।
তিনি সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নন। দেশে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ জাতির ভাগ্য বিড়ম্বনার কারন হিসেবে মনে করেন। পূর্ণ এবং অবাধ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তাঁর কাছে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঘটনা। আর মুক্তিযুদ্ধকালীন ফৌজদারহাটের বশীর মাষ্টারের স্ত্রীর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ তার কাছে স্মরনীয় ঘটনা হয়ে আছে। চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানের সময় তিনি এবং সহযোদ্ধাহস বশীর মাষ্টার ও ডাঃ ফয়েজ আহ্মেদ এর বাড়ীতে কয়েকদিনে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিদায় মুহুর্তে মাষ্টার সাহেবের স্ত্রীর স্নেহমাখা চাহনি এবং সজল চোখে সতর্কভাবে চলার পরামর্শ তিনি ভুলতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন সম্বন্ধে তাঁর জবাব "দেশের স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকে জাতির সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা স্থান পায়নি, তা থেকেই বুঝে নেয়া উচিত এদেশে মুক্তিযুদ্ধকে কতটা মূল্যায়ন করা হয়েছে।" এজন্য জাতির উদাসিনতা ও দায়িত্বহীনতা দায়ী বলে মনে করেন। তারপরও তিনি মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসসহ সকল জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে যোগদেন। একাত্তরের এই দুঃসাহসী যোদ্ধার প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর প্রিয় ব্যক্তিত্ব কৃষাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা।
ছয় সন্তানের জনক। চার ছেলে দুই মেয়ে। সকলে পাঠ্যরত। বড় ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল ছাত্র।
স্ত্রী একজন মুক্তিযোদ্ধার সহধর্মিনী হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করেন।

মোঃ শাহ্জাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম

জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

প্রশাসনিক ক্যাডারে যোগ দেন। এখন জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্রাম্মণবাড়িয়া জেলা নবীনগর থানার সাতমোরা গ্রামের জনাব আবদুর রাজ্জাক মাস্টারের ছেলে শাহজাহান। মেট্রিক পাশ করেন ১৯৬৫ সালে। এইচ এস সি তে উত্তীর্ণ হন ১৯৬৭ সালে। '৭১ সালে যুদ্ধের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

যুদ্ধ শুরু হলে শাহজাহান সিদ্দিকী ভারত যান। নৌ-কমান্ডো হিসেবে পলাশীর প্রান্তরে ভাগীরথী নদীতে ট্রেনিং নেন।

ট্রেনিং শেষে শাহজাহানসহ অনেক নৌ-কমান্ডোকে আগরতলা হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় আনা হয়। পাহাড়ঘেরা এক নৌ ট্র্যানজিট ক্যাম্পে আসেন শাহজাহান অন্যান্যদের সাথে। ট্রানজিট ক্যাম্পটি 'নিড ক্যাম্প' নামে পরিচিত ছিল।

এ ক্যাম্পে মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাঃ হায়দার, ভারতীয় নৌ বাহিনীর লেঃ কমান্ডার রায়, কমান্ডার সুমন্ত প্রমুখ সেনা নায়কদের সাথে পরিচিত হন শাহজাহান। এরা প্রায়ই ক্যাম্পে আসতেন। কমান্ডোদের খবরাখবর নিতেন। ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিংও আসতেন মাঝে মাঝে।

আগষ্ট মাসের ৫/৬ তারিখ হবে। একদিন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লেঃ দাশ এলেন ক্যাম্পে। ডেকে নেন শাহজাহানকে। দায়িত্ব দেয়া হলো দাউদকান্দি ফেরীঘাট অপারেশনের। যুদ্ধের দিক হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ঢাকার সাথে ময়নামতি সেনানিবাসের যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছিল প্রধানত এ ফেরী ঘাটের মাধ্যমে। চট্টগ্রাম হতে অস্ত্র গোলা বারুদ ঢাকায় যাচ্ছিল এদিক দিয়ে। এই ফেরীঘাটটি ধ্বংস করতে পারলে হানাদারদের চরম ক্ষতি হবে।

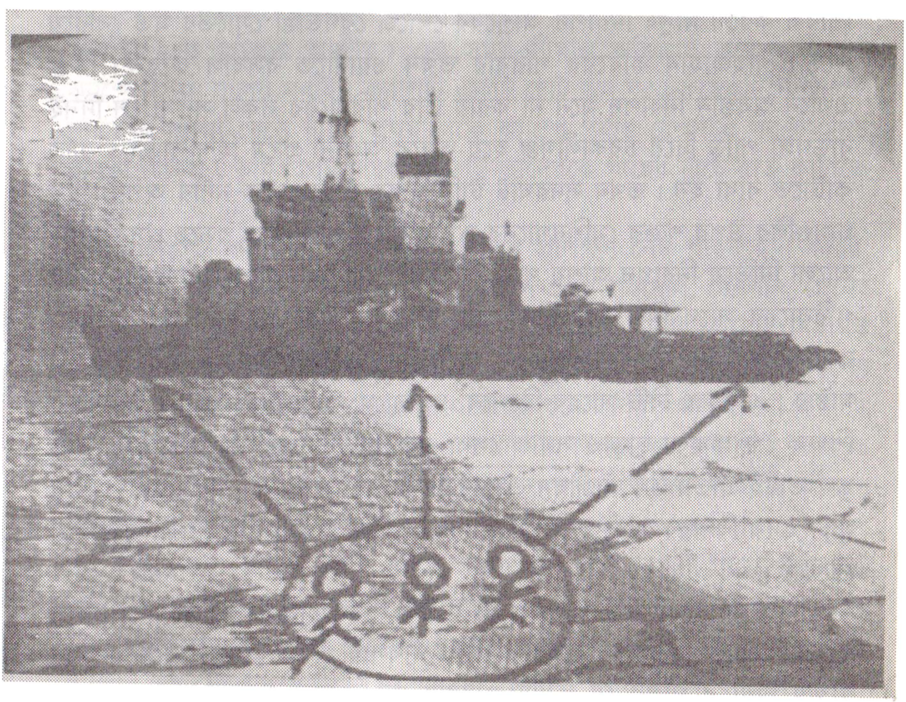
দাউদকান্দি ফেরী অপারেশনের দায়িত্ব বুঝে নেন শাহজাহান। অপারেশনটির প্রস্তুতির সময় ও আঘাত হানার সময় নির্ধারণ করবে হেডকোয়ার্টার। শাহজাহানকে একটি রেডিও সহ সংকেত জানিয়ে দেয়া হলো।

সিগন্যাল ও সময়ের ব্যাপারটি জানলেন শুধু শাহজাহান। দলের অন্য কেউ নয়। নিরাপত্তার খাতিরে এ ব্যবস্থা।

পুরো দলের জন্য অস্ত্র বরাদ্ধ ছিল ১ টি স্টেনগান, ১ টি রেডিও, প্রতি সদস্যের জন্য ১ টি করে লিমপেড মাইন, ১ জোড়া ফিন্স ও ১ টি করে কমান্ডো নাইফ।

আগস্টের ১১ কি ১২ তারিখ হবে। দলসহ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকেন তিনি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে ক্যাম্প হতে এনে কুমিল্লার কংশনগরের পূর্ব দিকে সীমান্তের কাছে নামিয়ে দেয় যোদ্ধাদের।

মধ্য আগষ্টে সীমান্ত হতে কিছু পথ পায়ে হেটে, কিছু পথ নৌকায় করে দাউদকান্দির বন্ধরামপুরে পৌছেন শাহজাহান। সাথে অস্ত্রসহ পুরো দল। তিনি নয়জন কমান্ডোসহ দাউদকান্দীতে ১৬ই আগষ্ট একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধোত্তর প্রশাসনিক ক্যাডারে যোগদেন। একজন সৎ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। সবসময় ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরন করেছেন। ১৯৯৫ সালে জেলা প্রশাসক হিসেবে প্রথমে এবং পরে ময়মনসিংহে দায়িত্ব পালন করছেন। অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী। তিন সন্তানের জনক শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতি একদিন উদ্ভাসিত হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।



মোঃ শাহজাহান কবির বীর প্রতীক ও মোঃ শামসুল কবির দুলাল

৭১ এর, ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ সারাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। যুবক শাহজাহান কবির তখন ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী। শাহজাহান কবির ১৯৭৫ সালে উক্ত কলেজ থেকে এম,কম পাশ করেন। ৬৯ এর অভূতপূর্ব ছাত্র ও গণ আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। রেসকোর্সে, ৭ মার্চে, বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভাষণ তাকে উদ্বেলিত করে। সেসময় প্রতিদিন অংশ নিতেন রাজপথের আন্দোলনে, মিছিলে। ২৬ শে মার্চ, শাহজাহান কবির ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পূর্বরাতের নরপিশাচদের হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই দৃশ্যের কথা মনে হলে আজও তিনি শিহরিত হন। তখন ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারি। শহরের সকল মানুষ গৃহবন্দী। ২৭ মার্চ দিনে কয়েক ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করলে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেগভাঙা স্রোতের মত বেরিয়ে পড়ে। শাহজাহান কবিরের পরিবার তখন ওয়ারীতে বসবাস করেন। কিন্তু এখানে অবস্থান নিরাপদ মনে না করায় তার পরিবারের সকল সদস্য সে দিনই বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে চরকালীগঞ্জ হয়ে অদূরে অজানা গ্রামে হিন্দু বাড়ীতে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হন। তখন সদরঘাট টার্মিনালের উপর থেকে নদীর অপর পারে গ্রামগুলির উপর শত্রুর মেশিনগানের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে। সব মানুষ আলো নিভিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুজে নিয়েছে। পরদিন সকালে শাহজাহান কবির পরিবারের সাথে নিজ গ্রাম চাঁদপুরের, দাসাদীর উদ্দেশ্যে হাটা শুরু করেন। কয়েকদিন অতি সন্তর্পনে একটানা হেটে নিজ গ্রামে পৌছেন। বাবা ইব্রাহিম মাষ্টার। এলাকায় বিটি সাহেব হিসেবে এক নামে পরিচিত। প্রবীন ও স্বনামধন্য শিক্ষক। শিক্ষকতা ছাড়াও সমাজ সেবা এবং দানশীল ব্যক্তি। সফরমালী হাই স্কুল তারই প্রতিষ্ঠিত। আজীবন এখানে শিক্ষকতা করেছেন। এই মহান ব্যক্তির মৃত্যু হৃদয় বিদারক এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে গৌরবজ্জ্বল করে রেখেছে।

বি,টি সাহেবের চার পুত্রের মাঝে তৃতীয় শাহজাহান কবির, কনিষ্ঠ শামসুল কবির। জ্যোষ্ঠপুত্র হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য বাঙালির যে কয়টি পরিবার গর্ব করতে পারে বি,টি সাহেবের

পরিবার তাদের অন্যতম। এপ্রিলের শুরু থেকে শাহজাহান কবির, তার ভাগিনা মমিনউল্লা, ছোট ভাই শামসুল কবির সহ এলাকার যুবকরা সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শহরত্যাগী মানুষের ঢল তখন গ্রামে। এদের আশ্রয় খাওয়া, নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারা। কিন্তু রাজধানীর বুকে দেখে আসা লক্ষ কোটি জনতার মনের আশা জাতির দীর্ঘ দিনের স্বপ্নতো কেবল নীড়হারা মানুষকে আশ্রয় দিয়ে পূরণ হবেনা। পরামর্শ করতে থাকেন পরস্পরের মাঝে। পাশের গ্রামে মোখলেসুর রহমান (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সদস্য) এলাকার যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ভারতে নিয়ে যেতেন, প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য। শাহজাহান কবির, মমিনউল্লাহ, শামসুল কবির তিনজন মোখলেসুর রহমানের নেতৃত্বে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে অনেক যুবকের সমন্বয়ে এক বিরাট দলের সাথে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কয়েকদিন গ্রামের পর গ্রাম পায়ে হেটে, অজানা, অচেনাপথ এবং মানুষের এক অদ্ভুত আতিথেয়তা লাভ করেছে, যা শাহজাহান কবিরের মনে দাগ কাটে। স্বার্থান্ধ শাসকদের নির্দেশ মানতে মানুষকে হত্যা করছে নির্দয়ভাবে। আর গ্রামের সরল সহজ মানুষগুলি কত সহজভাবে তাদের আপন করে নিয়েছে। কেহ-কাউকে না চিনলেও যেনো সকলেই এক আত্মার আত্মীয়। এক সময় সীমান্ত অতিক্রম করে হাতীমারা ক্যাম্পে উঠেন দলের সবাই। ক্যাম্পটি একটি ছোট স্কুল ঘর। কয়েকদিনে ক্যাম্পে সদস্যের সংখ্যা বেড়ে যায়। প্রথম দিকে ক্যাম্পে পর্যাপ্ত রেশন ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা ছিলনা। তাই প্রথম দিকে প্রায়শই তাদেরকে গাছের নীচে রাত কাটাতে হয়।

হাতীমারা ক্যাম্পেই প্রথম অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন শাহজাহান কবির, মমিনউল্লাহ, দুলাল এবং অন্য সাথীরা। এখানে ৩০৩ রাইফেল, ষ্টেনগান, গ্রেনেড ছোড়া, এল,এম,জি চালনা ট্রেনিংপান এবং মাঝে মাঝে তাদের নিয়মিত সৈনিকদের সাথে সীমান্তে যুদ্ধে পাঠানো হতো। মে মাসের শেষ দিকে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভের জন্য অন্যান্যের সাথে শাহজাহান কবির পলাশীর নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাটিতে এসে উপস্থিত হন। সাথী মমিনউল্লাহ ও ছোট ভাই শামসুল কবির দুলাল। দুইমাস প্রশিক্ষণ শেষে চাঁদপুর নৌ-অভিযানে চলে আসেন অকুতোভয় যোদ্ধা শাহজাহান কবির এবং বিশজন কমাণ্ডোর একটি দল।

আগষ্ট মাসে সম্পূর্ণ দলটি প্রথমে আশ্রয় গ্রহণ করে দাসাদী গ্রামে শাহজাহান কবির এর বাড়ীতে। ১৫ আগষ্ট অপারেশন শেষেও প্রায় সকল কমাণ্ডো পুনরায় এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চাঁদপুর বন্দরে শত্রু বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। হানাদাররা দলটিকে ধরার জন্য তৎপরতা চালায়।

১৭ আগষ্ট দুপুর বেলা ২০/২৫ জন শত্রু সৈন্য স্থানীয় রাজাকারদের সাথে নিয়ে বি,টি সাহেবের বাড়ীর চারদিকে ঘিরে ফেলে শাহাজাহান কবির সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলেন। পূর্বেই তার বাবা অন্যান্য কমাণ্ডোদের বিভিন্ন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। শত্রুরা দু'জনকেই বেঁধে প্রচন্ড অত্যাচার চালাতে থাকে, অন্যান্য কমাণ্ডোদের অবস্থান জানানোর জন্য। কিন্তু নিস্ফল হয় প্রচেষ্টা। ফলে সম্পূর্ণ বাড়ী লুট করে এবং শাহজাহান ও তাঁর বাবাকে বেঁধে নৌকাতে তুলে নেয়। শাহজাহানকে শক্ত করে বেঁধে রাখে নৌকার সাথে। স্বাধীনতার জন্য পিতা হয়েও পুত্রের উপর নির্মম অত্যাচর নিরবে মেনে নেন বি,টি সাহেব। কিন্তু শাহজাহান কবির নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পালানোর সুযোগ খুজতে থাকেন। নৌকা সামনে চলতে থাকে, মাঝে মধ্যে দাঁড়ায় লুটের জন্য। এই সময় বৃন্দাবন নামের একজন সুঠাম দেহী হিন্দু যুবককে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে ধরে নৌকাতে বেঁধে রাখে। নৌকার ছইয়ের মধ্যে বসে শাহজাহান দাঁত দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে হাতের রশি কেটে পায়ের বাঁধনও মুক্ত করে পালানোর অপেক্ষায় থাকেন। নৌকায় একজন পাকসেনা ও একজন রাজাকার তাঁদের পাহারায়। বাকীরা গ্রামে লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ এবং মেয়েদের সম্ভ্রম লুটে তৎপর।

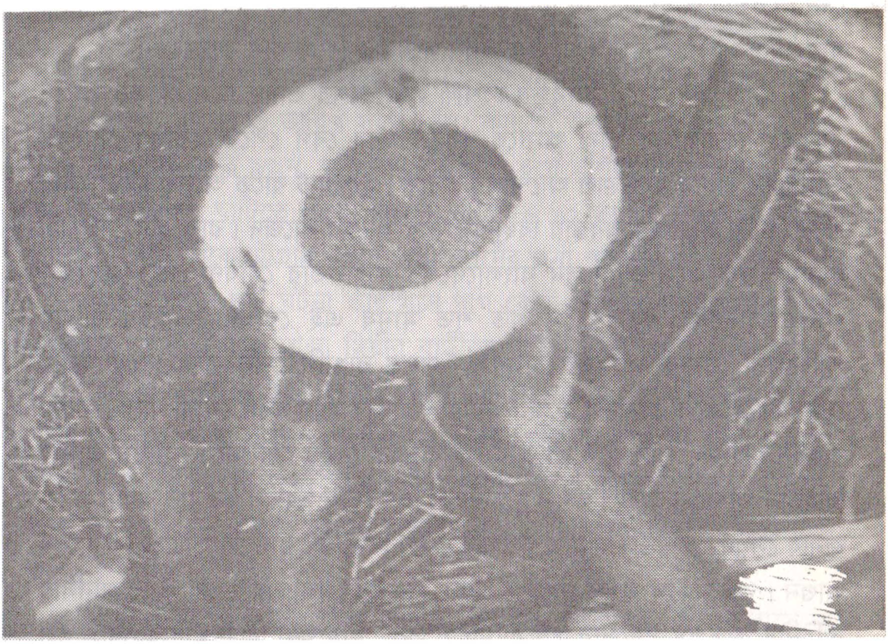
হানাদারদের নৌকাগুলি শাহজাহান, শিক্ষক ইব্রাহিম বিটি ও বৃন্দাবনকে নিয়ে গ্রামের অপর প্রান্তে ধনাঢ্য কামিনী লোদ এর বাড়ীর সন্নিকটে এসে থামে। নৌকার প্রহরী দু'জন লক্ষ করে পাটক্ষেতের অভ্যন্তরে ১টি নৌকায় প্রচুর সামগ্রীসহ যুবতী একটি মেয়ে লুকিয়ে আছে। শাহজাহান মেয়েটিকে চিনতে পারে হিন্দু মেয়ে ঝর্ণা, ২২/২৪ বৎসর বয়স। খানসেনাটি ঝর্ণার নৌকার সমগ্র মালামাল নিজেদের নৌকায় উঠিয়ে তার যখন অত্যাচার শুরু করে। শাহজাহান এবং বৃন্দাবন এই সুযোগ কাজে লাগায়। রাজাকারটিকে আচমকা ধাক্কাদিয়ে পানিতে ফেলে দিয়ে নিজেও নৌকা থেকে পানিতে লাফিয়ে ডুব দিয়ে অনেক দূরে যেয়ে ভেসে উঠেন। বেশ কিছুদুর যাওয়ার পরও গুলির শব্দ শুনতে পান। এর মাঝেই একটি নৌকা নিয়ে তড়িৎ পৌছে যান পাশ্ববর্তী কমাণ্ডোদের আশ্রয়স্থলে। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলে, তিনি পাশ্ববর্তী গ্রামে বোনের বাড়ীতে চলে যান। বোনকে সব জানিয়ে তাড়াতাড়ি প্রচার করতে বলেন যে, খান সেনারা শাহজাহান কবিরকে মেরে ফেলেছে। এই খবর সকলের কাছে জানাজানি হওয়ায় হানাদাররা নিশ্চিত হয় যে, তাদের শত্রু পালিয়ে ও জীবনে রক্ষা পায়নি। শাহজাহান কবির বোনের বাসা থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী খালার বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকেন। এখানে শাহজাহান তাঁর জীবনের চরম দুঃসংবাদটি শুনেন। তাঁর বাবাকে নির্মম অত্যাচারের পর গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শত

অত্যাচারের পরও তাঁর বাবা কমাণ্ডোদের অবস্থানের কথা জানাননি হানাদারদের। এমন পিতার জন্য সব মুক্তিযোদ্ধাই গর্ব করতে পারেন।

বাবার মৃত্যুর পরের দিন তিনি মামার বাড়ী যান। মামীকে সাথে নিয়ে বোরকা পরে বাবার লাশ দেখে ফিরে আসেন। দিন ১৮ আগষ্ট ১৯৭১।

১৯ আগষ্ট রাতে শাহজাহান সহ যোদ্ধাদের সাথে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নিরাপদে পৌছে যান পলাশী ক্যাম্পে। এরপর ও চাঁদপুরে অনেকগুলি দুঃসাহসিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তিনি। (যুদ্ধ অংশে বর্ণিত হয়েছে)।

বর্তমানে ঢাকাতে বসবাসরত। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ১৯৯৪ সালে পবিত্র হজব্রত পালন করেছেন। চার সন্তানের জনক। এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত। আজও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ মুক্তযোদ্ধা নৌ-কমাণ্ডো এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান।



কমাণ্ডোদের ব্যবহৃত ফিনস্ ও মাইন এর চিত্র

কমাণ্ডো সাজেদুল হক (চুন্নু)

বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন, ঢাকা

কোন কিছুর হিসাব মেলেনা। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতির উত্থান হলো কিন্তু সবার কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে হতাশা। চারিদিকে তাকালে, সামাজিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আমরা '৭১ এর আদর্শ থেকে সরে গেছি। আমার সব সময় মনে হয় দেশ' '৪৬-৪৭' সালের জায়গায় ফিরে গেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উস্কে দিয়ে জাতির ধ্বংস ডেকে আনা হয়েছে। যারা ব্যক্তি স্বার্থে স্বাধীনতা বিরোধীদের অবাধ সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, ক্ষমতায় বসিয়েছে তারা কখনও দেশপ্রেমিক হতে পারেনা। অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে জানালেন '৭১ র দুঃসাহসিক যোদ্ধা সাজেদুল হক। বাবা খানবাহাদুর আলিমউদ্দিন 'মহাত্মা গান্ধী'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। পেশায় আইনজীবী ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক ছিলেন। বৃটিশদের উপর ঘৃণায় খানবাহাদুর লিখতেন না। সাজেদ তখন সবেমাত্র বি,এ পাশ করেছেন।

৭ মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর বিশাল সমাবেশের ভাষণ শুনে জাতির সম্মুখে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক আসছে বুঝতে তাঁর বেগ পেতে হয়নি। সেসময় মাদারীপুর শহরে ও উত্তাল আন্দোলন চলছে। ২৫ মার্চ রাতে অনেক উদ্বেগ আর শংসয় নিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন সাজেদ। রাত ১টা, সহপাঠী হাবিবুল হক এসে জানালেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পুলিশ লাইনের ওয়ারলেসে শত শত মানুষ এই ঘোষণা শুনছে। ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা গণহত্যা চালাচ্ছে। সশস্ত্র বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছে বলে জানানো হচ্ছে। ওয়ারলেসে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, সকল বাঙালি সৈনিক, পুলিশ, ই.পি.আর কে ব্যারাক ছেড়ে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তখন মাদারীপুর এস,ডি,ও ছিলেন বর্তমান স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব সৈয়দ রেজাউল হায়াত। উপস্থিত যুবকদের রক্তে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে পরদিন ২৬ মার্চ এলাকার যুবক এবং আনসার বাহিনীর কতিপয় সদস্যের সহযোগিতায় ৩০৩ রাইফেল নিয়ে মাদারীপুর গার্লস হাইস্কুল মাঠে এবং নাজিমউদ্দিন কলেজের মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। ২৬০ জন

যুবকের প্রশিক্ষণ এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেন ষ্টুয়ার্ড মুজিব (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী)। উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১৮ এপ্রিল ২৬০ জন যুবকের সম্পূর্ণ দল নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে মাদারীপুর ত্যাগ করেন। সাজেদুল হক এই দলের অন্যতম সদস্য। আরও ছিলেন মাহবুব আহম্মদ মিলন, শাহাবুদ্দিন ভুইয়া, সাইদুর রহমান, আবুল বাশার, আলী আহমদ, আব্দুল গফুর, হাফিজুর রহমান, আব্দুর রহিম, সত্যেন বিশ্বাস, বিধান বিশ্বাস, এস, কে, স্বর্ণকার, আবিউর রহমান, অলিউর রহমান ও হাবিবুল হক প্রমুখ। ২৬ এপ্রিল চাঁদপুর হয়ে ফেনীর বেলুনীয়া সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের কাঠালিয়া পৌঁছেন। তখনও এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ক্যাম্প গড়ে ওঠেনি।

এরপর ৫মে থেকে এখানে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২১ মে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য অম্লিনগর স্থানান্তর করা হয়। তখন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২০০। জুন মাসের ৩ তারিখ সাবেগ সিং ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে ১৫/২০ জন যুবককে বাছাই করে ৯জুন, দলটিকে কলকাতা হয়ে মুর্শিদাবাদের পলাশী নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাটিতে নিয়ে আসেন এমাসের ১০ তারিখ। এখানে দু'মাস প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে চট্টগ্রাম বন্দরে অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়।

এই অভিযানে দুটি ঘটনা তাঁর মনে দাগ কেটে রেখেছে। চট্টগ্রামের পথে ইছাখালি গ্রামে কমাণ্ডো রাজা মিয়ার বাড়ীতে তার মায়ের সাথে দেখা করতে গেলে রাজার আওয়াজ শুনে মা ঘর থেকে বেরিয়ে রাজাকে বুকে জড়িয়ে মাথায় গায়ে হাত বোলাতে থাকেন। সাথে সাজেদের পরিচয় জেনে মা খুশিতে এবং ভয়ে সাজেদের মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন যেনো তাদের আশা পূর্ণ হয়। রাজার 'মা' ছিলেন অন্ধ। একজন অন্ধমায়ের এই দোয়া সাজেদকে অনুপ্রেরিত করে।

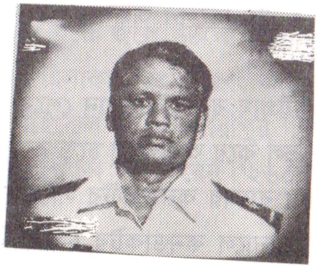
চট্টগ্রাম বন্দর অভিযান শেষে ভারতে ফেরার জন্য সাজেদ শুভপুর বাসে না চড়ে ভুল করে অন্যবাসে চড়ে বসেন। যে বাসটির গন্তব্যস্থল ছিল ফৌজদার হাট পর্যন্ত। বাসের কনডাকটর সাজেদকে গন্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে শুভপুরের কথা জানালে কনডাকটর চমকে উঠে। সে চুপ থেকে যুবক সাজেদের নিকট হতে টিকেটের পয়সা নেয়া থেকে বিরত থাকে। অল্পক্ষণে পাশের সিটে বসে

ফিস ফিসিয়ে বলে ভয় নেই, আমার দু'টি ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সাজেদের সাথে আরও একজন বন্ধু ছিলেন। কনডাকটর নির্দেশ দিল, বাস ফৌজদার পৌছলে তারা দু'জন যেনো সিট থেকে নেমে নীচে বসে থাকেন। যাতে বাহির থেকে না দেখা যায়। কনডাকটর ফৌজদার হাট এসে তার পরিচিত ওস্তাদ (ড্রাইভার) এর নিকট দু'বন্ধুকে সাথী করে দেন। সাজেদ মনে করেন সকল পর্যায়ের জনগণের সহযোগিতা ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতোনা।

৩রা অক্টোবর '৭১ শেখ আবু নাসের, সাজেদুল হক, মাহবুব আহমদ ও আব্দুল গফুর কে দিল্লী নিয়ে যান ভিন্ন একটি মিশনে পাঠানোর জন্য। দিল্লীতে তাদের তিনজনকে অভ্যর্থনা জানান বিশিষ্ট শিল্পপতি মনুভাই বিমানী। যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন। দিল্লীতে বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিক, কুটনীতিক, সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে অত্যন্ত গর্বের সাথে তিনজন কমাণ্ডোকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় যে, তারা বাংলাদেশের বন্দরে জাহাজ ডুবিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এই তিনজনকে দিল্লীতে নেয়া হয়েছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে নিউইয়র্কে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্য শাহ আজিজ ও মাহমুদ আলীকে হত্যার জন্য তারা তখন বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করছিল। ভারতীয় পাসপোর্টে তাদের নিউইয়র্ক পাঠানোর ব্যবস্থা চূড়ান্ত হলেও শেষ মুহূর্তে এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। ২রা ডিসেম্বর, তাঁদেরকে কলিকাতা ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে ডঃ সরওয়ার মোর্শেদ এর সাথে এলগ্রিন রোডে নেতাজী সুভাষ বোসের বাড়ীতে ইনফরমেশন ব্যাংকে সহযোগী হিসেবে তথ্য সংগ্রহে লিপ্ত থাকেন। এখানে বিশিষ্ট লেখিকা গৌরী আয়ূবের সাহচর্যে মাতৃস্নেহ লাভ করেন। যা তার স্মৃতিতে আম্লান হয়ে আছে।



আঃ ওয়াহেদ চৌঃ বীর উত্তম



'৭১ পাকা হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলে ফ্রান্সে অবস্থানরত পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর বাঙালি নাবিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বপক্ষ ত্যা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের তালিকা ঃ-

ক্রমিক	নাম, ঠিকানা পাক নেভী নাম্বার	মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব অবস্থান	মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা	বর্তমান অবস্থান/ঠিকানা
১	গাজী মোঃ রহমতউল্লা দাদু বীর প্রতীক ৪০, বি, কে, রায় রোড শেখপাড়া, খুলনা। ফোনঃ ২৪৬২৮ (খুলনা) ৩২৩১৬৮, ৯০০২১৭৫(ঢাকা) নেভী নং-৬৬১১৩	চীফ রেডিও আটিফিসার হিসাবে সাবমেরিনে উচ্চতর প্রশিক্ষণে ফ্রান্সে পাক-যুদ্ধ জাহাজ ম্যান-গ্রোতে নিয়োজিত ছিলেন। নৌ-যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগে পরিকল্পনাকারী।	নৌ-কমাণ্ডো ঘাটি সি-২ পি -এর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা। অক্টোবর '৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ রনাঙ্গনে অসংখ্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ১৭ই ডিসেম্বর খুলনা সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন।	১৯৭৫ সালে লেফটেন্যান্ট হিসাবে নৌ-বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বরিশাল, রাজশাহী ও সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলে জি,এম, হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চিংড়ি চাষ ও বিদেশে রপ্তানী ব্যবসা করছেন।
২	সৈয়দ মোঃ মোশারফ হোসেন (শরিয়তপুর) নেভী নং ৬৩২৯৯ ৭/১৮০, রূপনগর কলনী (টিনশেড), মীরপুর, ঢাকা।	ইঞ্জিন রুম আটিফিসার হিসাবে ফ্রান্সে সাবমেরিনের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণে রত ছিলেন। সি-২ পি ক্যাম্পে প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।	নভেম্বর মাসে মাদারীপুর এলাকায় স্থল বাহনীতে নেতৃত্ব দেন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত যুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখেন।	১৯৭২ সালে নৌ-বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর 'জাসদ' থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। এখন অবসর জীবন যাপন করছেন।

৩	আমিন উল্লাহ শেখ, বীর বীক্রম, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর নং-৬৫৩৯১ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	ইলেকট্রিক্যাল আর্টিফিসার হিসেবে সাবমেরীনে প্রশি-ক্ষণরত ছিলেন।	সি-২পি ক্যাম্পের প্রশিক্ষক ছিলেন অক্টোবর '৭১ থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত চাঁদপুর নদীবন্দরে যুদ্ধে অংশ নেন।	১৯৭৩ সালে নৌ-বাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন। লেঃ হিসেবে অবসর গ্রহন করেন।
৪	আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, বীর উত্তম, বীর বিক্রম, নেয়াখালী নং-৬৪৫১২ নৌ-বাহিনী অফিসার্স কোয়ার্টার, বনানী, ঢাকা।	রেডিও অপারেটর হিসাবে ম্যানগ্রোতে প্রশিক্ষণরত ছিলেন।	১৫ আগষ্ট '৭১ অপারেশন জ্যাকপটে চট্টগ্রাম বন্দরে যুদ্ধে অংশ নেন। এরপর তাঁর অবস্থান অজ্ঞাত। ফ্রান্স থেকে সপক্ষ ত্যাগে সাহসী ভূমিকা রাখেন।	নৌ-বাহিনী থেকে কমোডর হিসেবে ১৯৯৭ সালের ১লা জানুয়ারি অবসর গ্রহণ করেন। ফোনঃ ৮৮২৭৪১-৪৫
৫	বদিউল আলম, বীর উত্তম গাইবান্ধা। নং ৬৪০৫১২ ৪৪, পলাশনগর, মীরপুর-১১, ঢাকা।	ম্যানগ্রোতে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক। নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষক এবং ফ্রান্স থেকে অবস্থান পরিবর্তনে সাহসী ভূমিকা রাখেন।	১৫ আগষ্ট '৭১ চাঁদপুর, অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত মংলা বন্দরে অসংখ্য নৌ-যুদ্ধে দুঃসাহ-সীকতার সাথে নেতৃত্ব দেন এবং নিজেও অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।	১৯৭৪ সালে নৌ-বাহিনী থেকে অবসর গ্রহনের পর বর্তমানে জনতা ব্যাংক প্রধান কর্যালয়ে সিনিয়র অফিসার হিসাবে চাকুরী রত আছেন।

৬	মোঃ আহসানউল্লাহ, বীর প্রতীক ফেনী। (ঠিকানা এবং অবস্থান জানা যায়নি) নং ৬৮৪৪৪	ম্যানগ্রোতে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক। নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষক এবং ফ্রান্স থেকে অবস্থান পরিবর্তনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী।	১৫ আগষ্ট '৭১ মংলা বন্দরে নৌ-যুদ্ধে দুঃসাহসী-কতার সাথে অংশ গ্রহণ করেন। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ ধ্বংসের জন্য একাধিক অভিযানচালিয়ে বিফল হন।	যুদ্ধোত্তর চাকুরীতে যোগ দেননি। এরপর ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করেন।(বর্তমানে নিজ গ্রামে অবস্থান করছেন)
৭	শহীদ আব্দুর রকীব মিয়া, বীর বিক্রম। গ্রাম- সোলাপোতা, টাংগাইল। নং-৬৫০২৪৩	ফ্রান্সে সাবমেরীনে ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক। নৌ-কমাণ্ডো ক্যাম্পে প্রশিক্ষক। সপক্ষত্যাগে দুঃসাহসী ভূমিকা রাখেন প্রত্যুতপন্ন জ্ঞানের অধিকারী	'৭১এ অক্টোবর মাসে ফুলছড়ি ঘাটে কমাণ্ডো সমন্বয়ে চলন্ত জাহাজে মাইন লাগাতে জাহাজের প্রপেলারের আঘাতে শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শহীদের লাশ উদ্ধার সম্ভব হয়নি।	অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেওয়া হয়নি কেন এ প্রশ্ন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে রয়ে গেছে।
৮	আবিদুর রহমান, বীর বিক্রম, ৩৪ গিরিশ দাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা নং ৬৬০৪৯	সাবমেরীন সাপ্লাই এণ্ড সেক্রেটারীয়েট বিভাগে এ,বি। পলাশীতে নৌ-যুদ্ধের প্রশিক্ষক।	১৫ আগষ্ট '৭১ নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এবং অক্টোবর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেক যুদ্ধে সাহসীকতার সাথে নেতৃত্ব দেন।	যুদ্ধোত্তর চাকুরীতে যোগ দেননি। বর্তমানে নিজস্ব ব্যবসায়ে নিয়োজিত।

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-কমাণ্ডো বাহিনী বা প্রধান সেনাপতির স্পেশাল বাহিনীর তালিকা যা সি-২ ক্যাম্প পলাশী, ভারতে তৈরী '৭১ সালে।

নৌ-কঃ নাম্বার	নাম/পিতার নাম ও ঠিকানা	যুদ্ধস্থান/বর্তমান ঠিকানা
০০০১	মীর মোশতাক আহমেদ পিতা– মীর এশরাক আলি গ্রাম- সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা।	সিলেট এলাকা, ব্যবসায়ী, ১২৪ ইসকাটন গার্ডেন, ঢাকা। ফোনঃ ৮৩৩৩৯০
০০০২	আব্দুল কাদের পিতা– আঃ মোত্তালিব গ্রাম-দেবনগর, সাতক্ষীরা।	মংলা বন্দর, ব্যবস্থাপক জনতা ব্যাংক, সাতক্ষীরা। ফোনঃ
০০০৩	গাজী মোহাম্মদ আমিন পিতা– গাজী ফয়জুল রহমান গ্রাম-পাণ্ডুরিয়া, গোপালগঞ্জ।	চাঁদপুর, ব্যবসায়ী,যশোর শহর, যশোর।
০০০৪	আবদুর রহিম পিতা–এম,এ কুদ্দুস গ্রাম-কামরাঙ্গির চর, লালবাগ, ঢাকা।	নারায়নগঞ্জ,ব্যবসায়ী, লালবাগ, ঢাকা। (প্রাক্তন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য) ফোনঃ
০০০৫	মোক্তার আলী পিতা– হাতেম আলী সরদার গ্রাম-সুগন্ধিয়া, ঝালকাঠি।	মংলা,কৃষি বিভাগ, রাজশাহীতে চাকুরীরত। কোতোয়ালী থানা, রাজশাহী।
০০০৬	যোয়াদুর রসুল বাবু পিতা– জি,এম,এ, লতিফ হাজী মহসীন রোড, খুলনা।	মংলা বন্দর, ব্যবসায়ী ও মুক্তি-যোদ্ধা সংসদের কমাণ্ডার, খুলনা। ফোনঃ
০০০৭	অরুন কুমার ভট্টাচার্য্য পিতা– সুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য ১১৩, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সড়ক যশোর।	চাঁদপুর, সিনিয়র উকিল সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা। ফোনঃ

০০০৮	শেখ আঃ সেলিম পিতা– শেখ এ, ওয়াহাব গ্রাম-সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।	মংলাবন্দর, ব্যবসায়ী, সাতক্ষীরা শহর।
০০০৯	রফিকুল ইসলাম বাবলা পিতা– আঃ হোসেন মোল্লা গ্রাম-ঘলঘলিয়া, ভাতশালা সাতক্ষীরা।	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে চট্টগ্রামে বসবাস করছেন।
০০১০	মোঃ আলফাজ উদ্দিন পিতা– ওয়াজিউর রহমান গ্রাম- নেবাখালী, সাতক্ষীরা।	মংলা, কপিলমুনি, সিনিয়র স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (যুদ্ধাহত) সিভিল সার্জন অফিস, খুলনা।
০০১১	ইমাম বারী পিতা– আতিয়ার রহমান গ্রাম- কাটিয়া, সাতক্ষীরা।	ব্যবসায়ী, মংলাযুদ্ধে লেখক-সহ শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হন।
০০১২	আব্দুস সাত্তার পিতা– সামছুদ্দিন বিশ্বাস নতুন উপশহর, যশোর।	যুদ্ধাহত, মুঃ যোঃ কল্যাণ ট্রাস্টে ঢাকা চাকুরী করেন। আশাশুনি যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হন।
০০১৩	আলী আশরাফ শিকদার পিতা–ওয়াজেদ আলি শিকদার গ্রাম-সোনাখালী, বাগের হাট।	মংলাবন্দর, পুলিশ অফিসার।
০০১৪	অরুনকান্তি মুখার্জি পিতা–কালিপদ মুখার্জি গ্রাম-সুন্দরপুর, বাগের হাট।	মংলা বন্দর যুদ্ধে অংশ নেন।
০০১৫	বজলুর রহমান পিতা–মোঃ কাশেম আলি গ্রাম- গোদাঘাটা, সাতক্ষীরা।	আশাশুনি স্থলযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানে এন,এস, আই, এর কর্মকর্তা, ঢাকা।
০০১৬	X প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০০১৭	আবুল হোসেন পিতা– হাবিবুল্লা মণ্ডল গ্রাম–তালুয়াচাদপুর, নোয়াখালী।	চট্টগ্রাম বন্দর, কৃষিজীবী

০০১৮	শহীদ সিরাজুল ইসলাম পিতা– আকতার আলি সরদার গ্রাম-কাটিয়া, সাতক্ষীরা।	মংলাযুদ্ধে শহীদ (লেখকসহ মংলা বন্দরে শত্রুর হাতে বন্দী হন।
০০১৯	শওকত আলী পিতা–সামদার বিশ্বাস গ্রাম-নওদাগ্রাম, ঝিনাইদহ।	চট্টগ্রাম বন্দর অভিযান, নৌ-বাহিনীতে চাকুরীরত, চট্টগ্রাম।
০০২০	মোঃ কুদ্দুস পিতা–তোফজ্জেল হোসেন গ্রাম-সমাদ্দর খালী বাগের হাট।	মংলাবন্দর সকল যুদ্ধে অংশ নেন। পুলিশ কর্মকর্তা, জয়পুরহাট।
০০২১	আঃ গফুর পিতা– এ, গনি মণ্ডল গ্রাম-পাঁচবারিয়া, যশোর।	মংলাবন্দর, শিক্ষক, বাগআচড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
০০২২	আজিজুল আলম পিতা– সমিরউদ্দিন শেখ গ্রাম-কালিগ্রাম, রাজশাহী	হীরণ পয়েন্ট, ডি,ডি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।
০০২৩	গোলাম মোস্তফা পিতা– আজিজুর রহমান মোল্লা গ্রাম-চরদাগা, শরিয়তপুর	মংলাবন্দর, ব্যবসায়ী
০০২৪	আলী হোসেন, পিতা-কালামিয়া গ্রাম-বুগা, ঝিনাইদহ	মংলা, শিক্ষক, চট্টগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়।
০০২৫	মেজর অবঃ কাজী এমদাদুল হক পিতা–কাজী আহমেদ হোসেন গ্রাম-চৌগাছা, ঝিনাইদহ	চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জ, মেঃ জেঃ মঞ্জুর হত্যা মামলায় গ্রেপ্তারকৃত, ঢাকা জেলে।
০০২৬	মনসুর আহমেদ মাঝি পিতা– পবন আলি মাঝি গ্রাম-ভাইহারা, বাগেরহাট	মংলাবন্দর, বেকার

০০২৭	সুবোধ বিশ্বাস পিতা ব্রজমোহন বিশ্বাস গ্রাম- মিশারাপুর, ঝিনাইদহ	মংলাবন্দর, পূর্ত বিভাগে চাকুরীরত, ঝিনাইদহ।
০০২৮	আঃ হক পিতা– ডাঃ আব্দুল মালেক গ্রাম- পীরগাছা, ঝিনাইদহ	চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দর, শিক্ষক পীরগাছা উচ্চ বিদ্যালয়।
০০২৯	হুমায়ূন কবির পিতা– এম, মজিদ সরকার গ্রাম- বেতিল, পাবনা।	হীরন পয়েন্ট
০০৩০	শেখ রুহুল আমিন পিতা– শেখ জয়নাল আবেদীন গ্রাম-বেতিল, পাবনা	চট্টগ্রাম বন্দর
০০৩১	হাসান নূর পিতা– এম,এ, ওয়াদুদ। গ্রাম-পথের তলা, পাবনা	দাউদকান্দি, ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, পাবনা।
০০৩২	সৈয়দ আবুল বাশার পিতা– সৈয়দ মোহাম্মদ আলী গ্রাম-বেতিল, পাবনা।	বরিশাল নদীবন্দর, রাজনীতি-বিদ, বরিশাল।
০০৩৩	ফজলুল হক পিতা– এম,এ, রাজ্জাক গ্রাম-ককিলকাঠি, রাজশাহী	চট্টগ্রাম বন্দর, ইঞ্জিনিয়ার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
০০৩৪	বিশ্বনাথ পালিত পিতা– সুরেন্দ্র নাথ পালিত গ্রাম-ঘলঘলিয়া, ভাতশালা, সাতক্ষীরা	মংলা, বেকার, (সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলে চাকুরী করতেন।)
০০৩৫	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	

০০৩৬	মোঃ জবেদ আলী পিতা– আদর আলি সরকার গ্রাম-কালিয়ানী, সাতক্ষীরা।	মংলাবন্দর, সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস লিঃ সাতক্ষীরা, চাকরীরত।
০০৩৭	এবাদুল ইসলাম পিতা– বাসতুল্লা সরকার গ্রাম-কুলিয়া, সাতক্ষীরা	মংলা বন্দর, সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলে চাকুরীরত।
০০৩৮	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০০৩৯	হাফিজুদ্দিন পিতা– আমজাদ আলি মোড়ল গ্রাম- জুসখোলা, সাতক্ষীরা	মংলাবন্দর, বর্তমানে নিজ-গ্রামে।
০০৪০	রুহুল আমিন পিতা–জামাত আলি মণ্ডল গ্রাম-চৌগাছা, ঝিনাইদহ	মংলা, ব্যবসায়ী, চৌগাছা।
০০৪১	মনীন্দ্র নাথ বিশ্বাস পিতা– কালিচন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম- বাশতলী, সাতক্ষীরা	মংলা, বর্তমানে ভারতের (বশিরহাটে) বসবাসকারী।
০০৪২	সামসুল হক পিতা– এ, আজিজ গ্রাম-এনায়েতপুর, পাবনা।	নৌ-বাহিনীর চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত। ঢাকাতে বসবাস করেন।
০০৪৩	আলমগীর শিকদার পিতা– আবু সাফর শিকদার গ্রাম-টিটা, কাশিয়ানী	চট্টগ্রাম, সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত
০০৪৪	মতিউর রহমান বীর প্রতীক পিতা– আব্দুল আলি গ্রাম-সাতঘরিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ ফোনঃ পলমল গার্মেন্টস, উত্তরা ৮৯৪৭৯৮, ৮৯৩২৮৪	সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে চাকুরীরত। কাঁচপুর ফেরী ডোবানোর পূর্বে রেকী করতে রাজাকার (মন্ত্রী আঃ মতিনের) হাতে বন্দী হন। স্থানীয় হোটেল মালিক কর্মচারী পরিচয় দিয়ে ছাড়িয়ে নেন।

০০৪৫	রইস উদ্দিন পিতা– নওশের আলি সরদার গ্রাম- গদাইপুর, সাতক্ষীরা।	মংলাবন্দর, স্কুল শিক্ষক
০০৪৬	আমজাদ হোসেন পিতা– জাফর আলি সরদার গ্রাম-পারুলিয়া, সাতক্ষীরা।	সিলেট, বিদেশে চাকুরীরত
০০৪৭	বশির আহমদ পিতা–এম রইসউদ্দিন গ্রাম-শিকরমারী, রাজশাহী	১০ ডিসেম্বর পদ্মা জাহাজে আহত হন। মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। (নিজগ্রাম)
০০৪৮	নাইমুল ইসলাম পিতা– আফতাবউদ্দিন গ্রাম- নমষঙ্কর বাটী, রাজশাহী	
০০৪৯	জি,এম, গফফার কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	হীরন পয়েন্ট, মংলা। (নিজগ্রাম)
০০৫০	জহিরুল হক পিতা–সলিমউদ্দিন ফকির হাজী মহসীন সড়ক, খুলনা।	মংলা এবং আশাশুনি যুদ্ধে আহত, মানবেতর অবস্থায় জীবন যাপন করছেন।
০০৫১	আব্দুল হাকিম পিতা-নাজিরউদ্দিন গ্রাম-বেতিল, পাবনা	চট্টগ্রাম বন্দর, নৌ-বাহিনীর চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন।
০০৫২	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	
০০৫৩	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	
০০৫৪	শহীদ আফতাব উদ্দিন পিতা–নুরুদ্দিন মন্ডল গ্রাম-কাশিয়াডাঙ্গা, যশোর	লেখকের সাথে মংলাযুদ্ধে বন্দী এবং শহীদ হন।
০০৫৫	মুজিবুর রহমান পিতা ওয়াহেদ আলি মন্ডল গ্রাম-কাশিয়াডাঙ্গা, যশোর	লেখকসহ মংলাযুদ্ধে শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার ফোনঃ ২০০২০

০০৫৬	ওসমান গনি পিতা–আব্বাসউদ্দিন মালিক গ্রাম-বারিনদীয়া, কোট চাঁদপুর।	চট্টগ্রাম, অডিট অফিসার সোনালী ব্যাংক, ঢাকা।
০০৫৭	অভিমুন্য মণ্ডল পিতা– সাহাদেব মন্ডল গ্রাম-সাবুখালী, বাগেরহাট	মংলা বন্দর,বেকার।
০০৫৮	এমদাদুল হক পিতা– আঃ কাশেম সরদার গ্রাম-কুলিয়া, সাতক্ষীরা	লেখকসহ মংলাযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী হন। বেকার।
০০৫৯	মনীন্দ্র নাথ মণ্ডল পিতা–দুলালচন্দ্র মন্ডল গ্রাম-বীনের পোতা, সাতক্ষীরা	মংলা বন্দর, ভারতে বসবাস করছেন।
০০৬০	খলিলুর রহমান পিতা আয়েজউদ্দিন বিশ্বাস গ্রাম-ভাতশালা, সাতক্ষীরা	লেখক/ব্যবসায়ী/মংলাযুদ্ধে শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হন। ফোনঃ ৮৬৮০৪১
০০৬১	সামসুল আলম পিতা– শেখ এম, সামাদ গ্রাম-জয়দিয়া, কোটচাঁদপুর	মংলা যুদ্ধ
০০৬২	আব্দুল হামিদ পিতা– সোলায়মান সরকার গ্রাম-ভিমেরডাঙ্গী, রাজশাহী।	মংলাযুদ্ধ, ব্যবসায়ী।
০০৬৩	শেখ মহসীন আলী পিতা–শেখ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ গ্রাম-দোলখোলা, খুলনা।	উকিল/ঠিকাদার/মংলাযুদ্ধে লেখকসহ ৬জন ধরা পড়লে ও তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ হন।
০০৬৪	ফজলুল হক চৌধুরী পিতা– কামরুজ্জামান চৌধুরী গ্রাম-ফাদগীপাড়া, রাজশাহী	ভারতে বসবাস করেন।

০০৬৫	অনিল কুমার মন্ডল পিতা– রামচন্দ্র মন্ডল গ্রাম-কুলিয়া, সাতক্ষীরা	ভারতে বসবাস করেন।
০০৬৬	মালেক সোবহান পিতা– নূর মোহাম্মদ গ্রাম- মোরালীপুর, রাজশাহী	বেকার
০০৬৭	শহীদ খবিরুজ্জামান বীরবিক্রম পিতা– মৌঃ এ, জব্বার গ্রাম-বাগমারা, ফরিদপুর	টেকেরহাট গানবোট ডুবাতে শহীদ হন। সহদর খিলগাও নিউ ডিগ্রী মডেল কলেজের অধ্যক্ষ।
০০৬৮	সামসুল হক চাকলাদার পিতা মোজাম্মেল হক চাকলাদার গ্রাম-পুরাতন কসবা, যশোর	মংলাবন্দর, বেসামরিক কর্মচারী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ঢাকা।
০০৬৯	আমিনুর রহমান খসরু পিতা–এম,এম, কাশেম হাজী মেহের আলী রোড, খুলনা	মংলাবন্দর, ব্যবসায়ী, ঢাকা।
০০৭০	সাজেদুল হক চুন্নু পিতা– আলিমুদ্দিন আহমেদ গ্রাম-নতুন শহর মাদারীপুর	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ জুট করপোরেশনের কর্মকর্তা। ফোনঃ ৮০১৭১৫
০০৭১	হাবিবুল হক খোকন পিতা– সাইদুদ্দিন আহমেদ গ্রাম-নতুন শহর মাদারীপুর	নারায়ণগঞ্জ বন্দর, ডিপো ম্যানেজার, কোকাকোলা, বগুড়া। ফোনঃ ৮০২১১৯
০০৭২	ডাঃ মরহুম শাহআলম বীরউত্তম পিতা– আলি আহমেদ চৌধুরী গ্রাম-করমুল্লাপুর, নোয়াখালি	১৯৮৮ সালে ক্যান্সারে মৃত্যু-বরণ করেন।
০০৭৩	ফকরুল ইসলাম পিতা– এম,এ, শহীদ গ্রাম-লাতুয়া, সিলেট	সিলেটযুদ্ধ, এন, জি, ও, তে কর্মরত। সিলেট

০০৭৪	আবুল হাশেম (মৃত) পিতা– আঃ রহমান হাজী গ্রাম- সাবরামপুর, কালকিনী	১৯৮৩ সালে জন্ডিসে মৃত্যু বরণ করেন। সহদর অধ্যাপক আসাদুজ্জামান নায়েম, ঢাকা।
০০৭৫	হাফিজুর রহমান পিতা– এম, দলিলউদ্দিন গ্রাম-বদরপাশা, মাদারীপুর।	প্রধান অফিস সহকারী, রাজৈর কলেজ, খবিরুজ্জামানের সাথে টেকেরহাট যুদ্ধে ছিলেন।
০০৭৬	আলী আহমদ পিতা– ইসমাইল ফকির গ্রাম-সরমঙ্গল, মাদারীপুর	ভৈরব ব্রীজ অপারেশনে অংশ নেন। এন, জি, ও, তে চাকুরী করেন। (গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা)
০০৭৭	সত্যেন বিশ্বাস পিতা– জনার্দ্ধন বিশ্বাস গ্রাম-ধরমরিয়া বাড়ী মকসেদপুর, শরিয়তপুর।	প্রচণ্ড হার্টের অসুখে আক্রান্ত। সুচিকিৎসা নাহলে একালে মৃতু বরণ করবেন।
০০৭৮	বিধান বিশ্বাস পিতা– কুঞ্জ বিহারী বিশ্বাস গ্রাম-মহাতলী, শরিয়তপুর	ম্যাজিষ্ট্রেট, সিলেট বিভাগীয় কমিশনার অফিস, ভৈরব ব্রীজ ধ্বংসে নেতৃত্ব দেন।
০০৭৯	শাহাবউদ্দিন ভূঁইয়া পিতা– হানিফ ভুইয়া গ্রাম-নতুন শহর, মাদারীপুর	ভৈরব ব্রীজ ধ্বংসে অংশ নেন। ব্যবসায়ী, মাদারীপুর।
০০৮০	সাইদুর রহমান পিতা– মজিদ মিয়া নতুন শহর, মাদারীপুর।	ব্যবসায়ী, ঢাকা (মন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরীর জামাতা)।
০০৮১	এস,কে, স্বর্ণকার পিতা– রাজেন্দ্র স্বর্ণকার গ্রাম-চরমুগুরিয়া, ফরিদপুর	বেকার
০০৮২	মাহবুব আহমেদ মিলন পিতা–কাজীমউদ্দিন আহমেদ নতুন শহর, মাদারীপুর	প্রক্তন বি,এন,পি দলীয় সাংসদ। দিল্লী মিশনে অংশ নেন। ফোনঃ ৩২৪৩১৭

००৮৩	গফুর খাঁন পিতা– এ, সাত্তার খান গ্রাম-চরমুগুরিয়া, মাদারীপুর	নৌ-বাহিনীর চাকরী ছেড়ে ভারতে চলে যান। জিয়া হত্যায় অভিযুক্ত করা হয়।
००৮৪	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
००৮৫	আবিউর রহমান পিতা– মজিবুর রহমান গ্রাম-শেরগ্রাম, শরিয়তপুর	কর্ণফুলি পেপার মিলে চাকুরীরত, চট্টগ্রাম।
००৮৬	এ বাশার পিতা– আইয়ুব আলি সরদার গ্রাম-ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান ভেদরগঞ্জ।
००৮৭	মরহুম গোলাম রব্বানী পিতা–মুন্সি নূর মহম্মদ গ্রাম-ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর।	১৯৮৯ সালে টি,বি, অসুখে মৃত্যু বরণ করেন।
००৮৮	এম,এ, রহিম পিতা– আলি বকস্ বেপারী গ্রাম-কুড়ালতলী, শরিয়তপুর।	হার্ডিঞ্জ ব্রীজ ধ্বংস, শ্রমিক নেতা ইউ,এম,সি, জুট মিলস, নরসিংদী।
००৮৯	অলিউর হাওলাদার পিতা– মদন আলি হাওলাদার গ্রাম-গৈজ্যা, শরিয়তপুর	নারায়ণগঞ্জ, হোটেল ব্যবসায়ী, মাতুয়াইল, ঢাকা।
००৯०	আনোয়ার হোসেন পিতা– হামিদ মিয়া গ্রাম-মাতুয়াইল, ঢাকা।	নারায়ণগঞ্জ যুদ্ধে অংশ নেন। বেকার।
००৯১	এনামুল হক পিতা– বজলুল হক গ্রাম-জয়নগর, ঢাকা।	ভৈরব যুদ্ধে এস,এ, ভুইয়া ও ডঃ আলাউদ্দিনের সাথে অংশ নেন।
००৯২	এ,টি,এম বশির আহম্মদ পিতা– তমিজউদ্দিন আহমদ গ্রাম- হামসাদী, বৈদ্যের বাজার ঢাকা।	দলিল লেখক, সোনার গাঁও। নারায়ণগঞ্জ ও কাচপুর যুদ্ধে অংশ নেন।

০০৯৩	হেদায়েত উল্লাহ পিতা– নূর মহাম্মদ গ্রাম- মীর হাজিরবাগ, ঢাকা।	নারায়ণগঞ্জ ও কাচপুর যুদ্ধে অংশ নেন। ফোনঃ ২৮১৫৬৭
০০৯৪	এম, শহিদ উল্লাহ পিতা– এ, হাই মিয়া গ্রাম- মাতুয়াইল, ঢাকা।	নারায়ণগঞ্জ যুদ্ধে অংশ নেন। বেকার
০০৯৫	আজহার হোসেন পিতা– আব্দুর রশীদ গ্রাম- মাতুয়াইল, ঢাকা।	নারায়ণগঞ্জ যুদ্ধে অংশ নেন।
০০৯৬	তোফাজ্জল হোসেন পিতা– আনসার আলী গ্রাম- তারাবো, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ যুদ্ধ, বেকার
০০৯৭	এস,এম, খলিল উল্লাহ পিতা– এ, গনি মোল্লা গ্রাম-কাঁচারীকান্দি, নরসিংদী	কৃষি বিভাগে চাকুরীরত খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
০০৯৮	এ, কাদের পিতা– মনির হোসেন প্রধান গ্রাম- পুরানো বাউসিয়া গজারিয়া, ঢাকা।	গোয়ালন্দঘাট অভিযানে অংশ নেন। বিদেশে চাকুরীরত।
০০৯৯	এ, হাশেম পিতা– শরবত আলি গ্রাম- রূপপুর, ময়মনসিংহ	কৃষিজীবি
০১০০	এ, খালেক পিতা– হোসেন আলি সরদার গ্রাম- মিবশাপুর, কসবা, কুমিল্লা	কৃষিজীবি
০১০১	ফজলুল হক ভুইয়া পিতা– একেন আলি ভুইয়া গ্রাম-কোড্ডা, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	ফুলছড়িঘাটে শহীদ আঃ রকিব মিয়ার সাথে অংশ নেন। ঠেলাগাড়ী চালক।

০১০২	আরজ মিয়া পিতা– এম,এ আজিজ গ্রাম-বাহাদুরপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	কৃষিজীবি
০১০৩	মনসুর আহমেদ রাঙ্গামাটি।	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ। রাঙ্গামাটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার
০১০৪	এম, এ, ওয়াদুদ পিতা– মৌঃ আতাহার আলি গ্রাম-চালিতাবুনিয়া, বাগেরহাট	মংলাবন্দর, চাকুরীজীবি
০১০৫	এস, এম, মুজিবুর রহমান পিতা–হাজী কুরবান আলি গ্রাম-নকীপুর, সাতক্ষীরা।	শ্যামনগর থানা কমাণ্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
০১০৬	এস, এম, এ, রহিম পিতা– জিন্নাত আলি সরকার গ্রাম-লক্ষ্মীপুর, সাতক্ষীরা।	দলিল লেখক, কালিগঞ্জ থানা।
০১০৭	কে,এম,এ, রহিম পিতা– মানিকুল্লা মোল্লা গ্রাম-মহিষপুরশ্রীউল্লা, সাতক্ষীরা।	ভৈরবযুদ্ধে অংশ নেন। অবস্থান জানা নাই।
০১০৮	নুরুল ইসলাম পিতা– ফজলুল করিম সরদার গ্রাম– পাতাখালি, সাতক্ষীরা।	মংলাবন্দর, সুন্দরবন টেক্স-টাইল মিলে চাকুরীরত।
০১০৯	শেখ শাহাদত হোসেন পিতা– শেখ কেরামত আলি গ্রাম-চৌগাছা, তালা,সাতক্ষীরা।	জানা নাই
০১১০	ডাঃ শেখ মাহফুজুল হক পিতা– শেখ নূর আলি মাষ্টার গ্রাম- নকীপুর, সাতক্ষীরা।	হীরন পয়েন্ট ও মংলা যুদ্ধ, পুলিশ বিভাগের মেডিকেল অফিসার এবং নাহার ক্লিনিক এর মালিক, খুলনা।

০১১১	এম, শাহ আলম, পিতা–মোবারকআলি হাওলাদার গ্রাম- ঢুলিগাতি, বাগেরহাট।	মংলাবন্দর। বেকার কৃষিজীবি।
০১১২	শেখ মোহর আলী পিতা– শওকত আলি গ্রাম- হায়বাতপুর, সাতক্ষীরা।	মংলা বন্দর, দলিল লেখক, কলারোয়া আদালত।
০১১৩	হারুন-অর-রশীদ পিতা–আহমেদ ইসলাম শিকদার গ্রাম-রাজাপুর, বরিশাল	হিসাব রক্ষক, বাংলাদেশ রাইফেলস সদর দপ্তর পীলখানা, ঢাক। ফোনঃ ৮৬৬৬৭২
০১১৪	রবীন্দ্র নাথ মন্ডল পিতা– দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল গ্রাম- খালিশা বুনিয়া, সাতক্ষীরা।	বেকার, কৃষিজীবি
০১১৫	জি, এ, আঃ রহিম পিতা– জি, এম সফিউদ্দিন গ্রাম- নবীপুর, সাতক্ষীরা।	মংলা, খুলনা, মোয়াজ্জিন, মিটফোর্ড হাসপাতাল মসজিদ, ঢাকা। সাহসীযোদ্ধা
০১১৬	সুশীল কুমার মন্ডল পিতা– দূর্গাপদ মন্ডল গ্রাম-জোড় সিং, খুলনা।	মংলাবন্দর, কৃষিজীবি/চিংড়ি চাষ করেন।
০১১৭	জি,এম, মুস্তাফিজুর রহমান পিতা– জি,এম, মোস্তফা মূসা গ্রাম-পাতাখালি, সাতক্ষীরা।	মংলা, নৌ-বাহিনীতে চাকরীরত, চট্টগ্রাম।
০১১৮	আবু নেসার সিদ্দিকী পিতা– হারুন অর রশিদ গ্রাম- পাতাখালী, সাতক্ষীরা	সিলেট, বেকার/কৃষিজীবি
০১১৯	মোঃ শমশের আলী পিতা– খোশলাল সরদার গ্রাম-মিরগীডাঙ্গা, সাতক্ষীরা	আশাশুনি, যুদ্ধাহত/আনসার এডজুটেন্ট, জয়দেবপুর।

০১২০	প্রফুল্ল কুমার মিস্ত্রী পিতা– আনন্দ মিস্ত্রী গ্রাম-দীগরাজ, বাগেরহাট।	মংলা, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বাগেরহাট কর্মকর্তা।
০১২১	রামপ্রসাদ সরকার পিতা– সতীশ চন্দ্র সরকার গ্রাম-গবীন্দ কাঠী, সাতক্ষীরা।	মংলাযুদ্ধ, বেকার/কৃষিজীবি
০১২২	আতাহার উদ্দিন তালুকদার পিতা– আফসারউদ্দিন গ্রাম-বট কাজল, পটুয়াখালী।	মংলাযুদ্ধ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিউবো পটুয়াখালি
০১২৩	আবুল ফয়েজ, পিতা– মৌঃ এ, মজিদ গ্রাম- সাতমুড়া, নবীনগর	সিলেটযুদ্ধ, জানা নাই।
০১২৪	শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম পিতা– আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার গ্রাম- সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	দাউদকান্দী ফেরীঘাট, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
০১২৫	আঃ সাত্তার পিতা–মহব্বত আলি তালুকদার গ্রাম-নকীপুর, সাতক্ষীরা।	ভারতে বসবাসকারী
০১২৬	আব্দুল ওয়াহিদ পিতা– সিরাজ আলি গ্রাম-চান্দ্রা, কুমিল্লা।	চাঁদপুরযুদ্ধে অংশ নেন। জানা নাই।
০১২৭	আবু তাহের পিতা– মুখলেসুর রহমান গ্রাম-ভোগাবেটিপুর, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম ও কাঁচপুর যুদ্ধে অংশ নেন। আমেরিকায় বসবাস-কারী। সাহসীযোদ্ধা
০১২৮	শফিউল্লাহ, পিতা– আব্দুর রব পাটওয়ারী গ্রাম-চরহাজারী, ফেনী।	কৃষিজীবি

০১২৯	এ, এইচ, এম জিলানী চৌধুরী পিতা– বুদরুস আলম গ্রাম-মুবারক কুনা, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম যুদ্ধে অংশ নেন। ব্যবস্থাপক, কৃষি ব্যাংক, ছাগলনাইয়া, ফেনী।
০১৩০	আবুল বাশার পিতা– মোখলেসুর রহমান গ্রাম-প্রাগালপুর, চট্টগ্রাম।	প্রকৌশলী, বিদেশে অবস্থান করছেন।
০১৩১	সালেহ আহমেদ পিতা– আলি ইউসুফ ই,পি,আর গ্রাম-প্রাগালপুর, চট্টগ্রাম।	বাংলাদেশ রাইফেলস্ এ চাকুরীরত।
০১৩২	শেখ আঃ কাদের পিতা– শেখ মোঃ ইব্রাহিম গ্রাম- নকীপুর, সাতক্ষীরা।	মাষ্টার/হীরন পয়েন্ট ও লাল-শীরা যুদ্ধে অংশ নেন।
০১৩৩	মোহাম্মদ আলী পিতা– এ, রাজ্জাক মোল্লা গ্রাম-মাজার দিয়া, নগরকান্দা	মাষ্টার, কোকো–২ রহমান নেভিগেশন, সদরঘাট। বাথুন্ডা ব্রীজ অপারেশন।
০১৩৪	এম,এ, কাশেম পিতা– গোলাম নবী ফকির গ্রাম-খারাবাদ, শরীয়তপুর।	প্রকৌশলী/চাকুরীরত
০১৩৫	নুরুল ইসলাম পিতা– গহর আলি মোল্লা গ্রাম-নকীপুর, সাতক্ষীরা।	লালশিরা অভিযানে অংশ নেন। সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলে চাকরী করছেন।
০১৩৬	দিলীপ কুমার রায় পিতা– মনীন্দ্র নাথ রায় গ্রাম-লস্কর, খুলনা	কৃষিজীবি
০১৩৭	গবীন্দ কুমার সানা পিতা– রতনচন্দ্র সানা গ্রাম-শীবহাটি(আসম্পূর্ণ)	জানা যায় নাই
০১৩৮	শফিক আহমেদ পিতা– রইসউদ্দিন আহমেদ গ্রাম- ধুলিহার, সাতক্ষীরা	মংলা যুদ্ধে অংশ নেন। ব্যবসায়ী/ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর কমান্ডার।

০১৩৯	জয়নাল আবেদীন (মৃত) পিতা– শাহজাউদ্দিন সরদার গ্রাম-দোহার, সাতক্ষীরা।	যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে মৃত্যু বরণ করেন।
০১৪০	শাহজাহান আলম পিতা– পাচু সরদার গ্রাম-দোহার, সাতক্ষীরা।	কৃষিজীবি
০১৪১	রমেন্দ্র নাথ সরকার পিতা– বালিকৃষ্ণ সরকার	মংলা বন্দর সকল যুদ্ধে অংশ নেন। কৃষিজীবি।
০১৪২	সামসুর রহমান পিতা– হায়দার আলি সরদার গ্রাম-সাতপাকিয়া, সাতক্ষীরা।	শিক্ষক
০১৪৩	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০১৪৪	শহীদ রফিকুল ইসলাম পিতা– মৌঃ জালালউদ্দিন গ্রাম-রাধেশ্বর, কুমিল্লা।	১০ ডিসেম্বর খুলনায় পদ্মা জাহাজে বোমায় শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তাকে কোন খেতাব প্রদান করা হয় নাই।
০১৪৫	এম,এ, বশীর পিতা– মোঃ সামসুল হক গ্রাম-ধুম, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম যুদ্ধে অংশ নেন।
০১৪৬	মাহবুবুল আলম পিতা– রহিমউল্লাহ গ্রাম-মেহেরপুর, চট্টগ্রাম।	
০১৪৭	আব্দুর রশীদ পিতা– আব্দুল ওয়াহাব গ্রাম-নিকুঞ্জপুর, নোয়াখালী।	
০১৪৮	মাজহার উল্লা বীর উত্তম পিতা– মৌঃ আলি আযম গ্রাম-বালুকিয়া, চট্টগ্রাম	সক্রিয়ভাবে নিজে কোনো যুদ্ধে অংশ নেন নাই।

০১৪৯	বশীর উল্লাহ পিতা– হাজি বাদশা মিয়া গ্রাম-উত্তর আন্ধারমানিক, ছাগলনাইয়া, ফেনী।	চট্টগ্রাম যুদ্ধে অংশ নেন।জানা যায় নাই।
১৫০	সেলিম বাঙ্গালী পিতা– ইয়াকুব আলি গ্রাম- মায়নি, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম যুদ্ধে অংশ নেন। হতাশায় অপ্রকিস্থ হয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার চাকরী হারান।
০১৫১	তৌহিদুল আনোয়ার পিতা–এ,এম,এম শফিকুর রহমান গ্রাম-জগতপুর, ফেনী।	জানা যায় নাই।
০১৫২	জামাল উল্লাহ পিতা– মোঃ সাফাউল্লাহ গ্রাম-মালিয়াইশ, চট্টগ্রাম।	কৃষিজীবি
০১৫৩	খুরশিদ আলম বীর প্রতীক পিতা– মোঃ শাদত আলী পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম অপারেশনে অপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।
০১৫৪	অনিল বরণ রায় পিতা– মনোরঞ্জন রায় ৮৫/বি চট্টেশ্বরী রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম। (বই প্রকাশের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং বহু ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থ আদায় করেছেন। বই প্রকাশ হয়নি।	অক্টোবর মাসে সন্দ্বীপযান। বই ছাপার কথা বলে। নৌ-কমাণ্ডোদের ২০০ ফটো এবং স্মৃতিচারণ মূলক লেখা দুবছর পূর্বে আমার থেকে নিয়ে আটকিয়ে রেখেছে। যেজন্য বইয়ে তাঁদের ফটো ছাপা সম্ভব হলোনা।
০১৫৫	এমদাদ হোসেন মতিন পিতা– শফিউল্লাহ গ্রাম-পশ্চিম মিঠানালা, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। ব্যবসায়ী, ঢাকা। ফোন ঃ ৮৪১৪৩৬

০১৫৬	বদিউল আলম শাহ পিতা– বজলু আহমদ শাহ ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। ব্যবসায়ী, নাজিরহাট।
০১৫৭	দেলোয়ার হোসেন পিতা– হাজি আঃ ওয়াদুদ ভুঁইয়া গ্রাম-ফাজিলপুর, ফেনী।	উপ সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর এবং সন্দ্বীপ অভিযানে অংশ নেন।
০১৫৮	ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ পিতা– ওসমান গনি সরকার গ্রাম-বুরুদিয়া, কটিয়াদী কিশোরগঞ্জ।	প্রো-ভিসি, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, মংলা ও ভৈরব অপারেশনে অংশ নেন। ফোনঃ ০৬২২৫/৯৭৩
০১৫৯	রশিদ আহ্মেদ পিতা– গুনু মিয়া সরকার নরানগিরী, চট্টগ্রাম।	আগষ্ট মাসে, চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে ২০ জন কমাণ্ডোর সমন্বয়ক ছিলেন। এই দলটি চট্টগ্রাম পৌছতে ব্যর্থ হয়।
০১৬০	মারফত আলী পিতা– ফারিজউদ্দিন গ্রাম- লালিমাসুয়াখাল, মতলব চাদপুর।	বর্তমানে কৃষিজীবি। বাহাদুরাবাদ ঘাট যুদ্ধে অংশ নেন। (আহসানউল্লা হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিন বয় ছিলেন।
০১৬১	এম,এ, আজিজ পিতা– আলেক খান গ্রাম-বিসন্দি, চাঁদপুর।	চাঁদপুর যুদ্ধে অংশ নেন। দলিল লেখক, চাঁদপুর।
০১৬২	তোফায়েল আহমেদ পিতা– ফজলুল হক গ্রাম-পশ্চিম লক্ষিপুর, লক্ষীপুর।	জানা নাই।
০১৬৩	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	

০১৬৪	নজরুল ইসলাম পিতা– ইয়াকুব আলি গ্রাম- খিলমোহর, চাদপুর	চাঁদপুর পরিবার পরিকল্পনা অফিসের কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের লীডার।
০১৬৫	আমীর হোসেন পিতা– চাঁদ বক্স গ্রাম-পদিয়ানা, চাঁদপুর।	
০১৬৬	এ, মালেক পিতা– আফতাবউদ্দিন গ্রাম- বরুনা পাড়া, লৌহজং ঢাকা।	কৃষিজীবি
০১৬৭	সিরাজুল ইসলাম পিতা– মফিজউদ্দিন বেপারী গ্রাম-মাঝিগাছা, কুমিল্লা।	মংলাযুদ্ধে অংশ নেন। ব্যবসায়ী
০১৬৮	শহীদ হোসেন (মৃত) পিতা– আলতাফ হোসেন গ্রাম-সান্দ্রা পামচাই, চাঁদপুর।	মহাখালি কলেরা পাসপাতালের ষ্টোরে কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৯৬ সালে লিভার ক্যান্সারে মৃতু বরণ করেন।
০১৬৯	এম, শাহজুদ্দিন পিতা– এ গনি প্রধান গ্রাম- হাইদনকান্দি, কুমিল্লা।	চাঁদপুর অপারেশনে অংশ নেন। কৃষিজীবি
০১৭০	সৈয়দ আকরম পিতা– এম,এ করিম গ্রাম-নটিঙ্গি, কুমিল্লা।	জানা নাই
০১৭১	ফজলুল কবির পিতা– এন, নূর মোহাম্মদ গ্রাম-জয়নগর, চাঁদপুর।	পুলিশ পরিদর্শক, বাহুবল, সিলেট। বিগত সরকার তাকে দীর্ঘদিন সাসপেন্ড অবস্থায় রাখে। দুঃসাহসী যোদ্ধা।

০১৭২	মোরশেদ আলম পিতা– সামাদ সরকার গ্রাম-সুন্দলপুর, দাউদকান্দি কুমিল্লা।	দাউদকান্দী অপারেশনে অংশ নেন। ব্যবসায়ী
০১৭৩	এ, হুসেন পিতা– এম,এ বারিক গ্রাম-রাজা মেহের, কুমিল্লা।	কৃষিজীবি
০১৭৪	সামসুদ্দিন আহমেদ সামু মৃত পিতা– মাহবুবর রহমান গ্রাম-হাজী মেসম রোড, চাঁদপুর	রেসকো গার্মেন্টস্, ঢাকায় চাকরীরত অবস্থায় লিভার সিরোসিসে মৃত্যু বরণ করেন।
০১৭৫	এ, কাদের পিতা– এ, সোবহান গ্রাম-কংশনগর, কুমিল্লা।	শিক্ষকতায় নিয়োজিত
০১৭৬	এম,এ, মজিদ পিতা– ইসহাক হাওলাদার গ্রাম-বাটামারা, মুলাদী, বরিশাল	প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান বামপন্থী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।
০১৭৭	মাহমুদ আলম পিতা– আব্দুল হক চৌধুরী গ্রাম-উলানিয়া, কুমিল্লা	শিক্ষকতায় নিয়োজিত।
০১৭৮	শহীদ এ, সামাদ পিতা– এম, এ, গফফার গ্রাম-দাউদকান্দি, কুমিল্লা	তাঁর কোন অবিভাবক নেই। ফুলছড়ি ঘাটে জাহাজে মাইন লাগাতে, আঃ রকিব মিয়ার সাথে শহীদ হন। শহীদের তালিকায় তাঁর নাম নেই।
০১৭৯	এ, সামাদ পিতা– ইসরাইল তালুকদার গ্রাম-স্বর্ণঘোষ, পালং শরিয়তপুর	শিক্ষক, সরকারী স্কুল, চট্টগ্রাম।

০১৮০	আজিজ হোসেন পিতা মীর এ, মান্নান গ্রাম-ঘড়িসার, শরিয়তপুর	বিভিন্ন স্থলযুদ্ধে অংশ নেন। স্টুডিও ব্যবসায় নিয়োজিত।
০১৮১	এ, তাহের খন্দকার পিতা নুরুল হক খন্দকার গ্রাম-নিকুঞ্জরা, ফাজিলপুর নোয়াখালি।	ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা। কাওরান বাজার। ফোনঃ ৮১০৫৯৬
০১৮২	মনিরুল ইসলাম পিতা- মোঃ এ, মান্নান গ্রাম- বাজগোদা, চাঁদপুর।	বিদেশে চাকুরীরত
০১৮৩	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০১৮৪	এ, হাশেম, পিতা- সুন্দর আলী গ্রাম-সামল্লাসুর, কুমিল্লা।	
০১৮৫	মোজাম্মেল হক পিতা- এ,কে,এম, ফজলুল হক গ্রাম-পান্টি, কুমিল্লা।	চাকুরীজীবি
০১৮৬	এ, হাকিম পিতা- ইয়াকুব আলি মোল্লা গ্রাম- এখলাসপুর, চাঁদপুর।	চাকুরীজীবি
০১৮৭	আলাউদ্দিন ফজলু পিতা- এম,এ, কাদের গ্রাম- চরকুমারিয়া, দাউদকান্দি	বেকারী, ব্যবসায়ী
০১৮৮	জহুরুল ইসলাম পিতা- নূর মোহাম্মদ তালুকদার গ্রাম-সফরমালি, চাঁদপুর।	প্রিন্সিপাল অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা। ফোনঃ
০১৮৯	জয়নাল আবেদীন পিতা- আব্বাস আলি গ্রাম-স্বরস্বতীরচর, কুমিল্লা।	টেলিগ্রাফ ও টেলিগ্রাম বোর্ডে চাকুরীরত। গুলশান একসচেঞ্জ ঢাকা।

০১৯০	খন্দকার রুহুল আমিন পিতা–কফিলউদ্দিন খন্দকার গ্রাম-শীবপুর, কুমিল্লা।	চাঁদপুর যুদ্ধে অংশ নেন।
০১৯১	বাচ্চু মিয়া পাটওয়ারী পিতা– সামসুল হক পাটওয়ারী গ্রাম- বাখরপুর, চাঁদপুর।	ডেমরা থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমাণ্ডার।
০১৯২	এনামুল হক পিতা–এম, জমিরউদ্দিন খলিফা গ্রাম-বাহেরচর, কুমিল্লা।	সামরিক বাহিনীতে কর্মরত। আশুগঞ্জ ও মেঘনা ব্রীজ অপারেশনে অংশ নেন।
০১৯৩	শফিকুল ইসলাম পিতা– মোজাফফর প্রধান গ্রাম-চরলক্ষিপুর, চাঁদপুর।	কৃষিজীবি। মেঘালয় ক্যাম্পে মাইন প্রস্তুতে রত ছিলেন।
০১৯৪	এম,এ, রাজ্জাক পিতা– ইয়াকুব আলি বেপারী গ্রাম-দাশাদী, সফরমালি চাঁদপুর।	নৌ-বাহিনীতে চাকুরীরত। চট্টগ্রাম।
০১৯৫	মনীর হোসেন পিতা– করিম বকস্ বাকাউল গ্রাম-লটরদী, মতলব, কুমিল্লা।	সেনা বাহিনীর চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরী করছেন। ফোনঃ ৬০৪৮৩৬
০১৯৬	মেসবাউদ্দিন চৌধুরী পিতা– মমতাজউদ্দিন চৌধুরী গ্রাম-খলিলাবাদ, কুমিল্লা।	বিদেশে চাকুরীরত
০১৯৭	এম, মহিবউল্লাহ পিতা– এ, করিম গ্রাম-সাউথ মেখাল, চট্টগ্রাম।	শিক্ষক, চট্টগ্রাম যুদ্ধে অংশ নেন।

০১৯৮	কামাল আহ্‌মেদ পিতা– মৌঃ সৈয়দ আহমদ গ্রাম- অসিমপুর, চাঁদপুর।	প্রকৌশলী, বিদেশে চাকুরীরত।
০১৯৯	শওকত হোসেন পিতা– বন্দে আলি পাটওয়ারী গ্রাম-অসিমপুর, চাঁদপুর।	জানা নাই।
০২০০	বেল্লাল হোসেন মৃধা পিতা–আলহাজ্ব গোলাম হোসেন গ্রাম-আলীমাবাদ, মূলাদী বরিশাল।	মাদ্রাসা শিক্ষক, মুলাদী বরিশাল।
০২০১	আমিনুল হক পিতা– এম,এ, তাজেল মিয়া গ্রাম-এখলাসপুর, চাঁদপুর।	
০২০২	মোরশেদ আলম পিতা– নায়েব আলি ভুইয়া গ্রাম-মানিক কান্দি, কুমিল্লা।	কৃষিজীবি
০২০৩	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	
০২০৪	শাহজাহান কবির বীর প্রতীক পিতা– শহীদ মোঃ ইব্রাহিম ১৩/এফ, পূর্ব মাদারটেক শরীফবাগ, ঢাকা।	চাঁদপুর যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হন। বর্তমানে ব্যবসায়ী, ঢাকা। ফোনঃ ৪১৫৮৭৫
০২০৫	শামসুল কবির পিতা– শহীদ মোঃ ইব্রাহিম গ্রাম-দাশাদী, চাঁদপুর।	ঐ সহদর। চাদপুর যুদ্ধে অংশ নেন।
০২০৬	এম,এ, কামাল মৃত পিতা– হাজী সুলতান আহমেদ গ্রাম-উত্তর মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।	প্রকৌশলী, বিদেশে অবস্থান করছেন। চট্টগ্রাম যুদ্ধে অংশ নেন। সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন

০২০৭	এ, মন্নাফ পিতা– এ, হাশেম পাটওয়ারী গ্রাম-দায়রা, চাঁদপুর	চাঁদপুর যুদ্ধে অংশ নেন। ব্যবসায়ী
০২০৮	জি,এম, আইয়ুব পিতা– এস, সাধু গাজী গ্রাম-ভোজগাঁও, লৌহজং/মুন্সিগঞ্জ	বিদেশে চাকুরীরত।
০২০৯	মহিউদ্দিন আহমেদ পিতা– এ, মজিদ গ্রাম-চরভৈরব, শরিয়তপুর।	সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত ১৮, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ঢাকা সেনানিবাস।
০২১০	ইঞ্জিঃ মাহবুবুর রহমান পিতা–কেরামত আলি পাটওয়ারী গ্রাম-চাঁদপুর, ধানুয়া, চাঁদপুর।	আই, ডব্লিউ, টি-এর নির্বাহী প্রকৌশলী। ফোনঃ ৪১৭৪৫৩
০২১১	শফিকুর রহমান পিতা– জামালউদিন মিয়া গ্রাম-ছিরকাচাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর	চাকুরিজীবি। চাঁদপুর যুদ্ধে কমাণ্ডোদের উদ্ধারের জন্য নৌকায় ছিলেন। কিন্তু কমাণ্ডোদের ফেলে চলে যান।
০২১২	লুৎফুর রহমান পিতা– এম, নূর খান গ্রাম- ছিরকা, চাঁদপুর	অফিসার, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি।
০২১৩	এস,এ, মজুমদার পিতা– করিম বকস্ মজুমদার গ্রাম-উচাঙ্গা, চাঁদপুর।	বেসামরিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, চট্টগ্রাম। সিলেট যুদ্ধে যান।
০২১৪	আশরাফুল হক পিতা– আসগর আলি গ্রাম-বনশোভা, কুমিল্লা।	পুলিশ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।

০২১৫	এ, হাশেম পিতা– এম আলি মিয়া গ্রাম-শোন্দ্রম, কুমিল্লা।	ফুলছড়ি ঘাটে চলন্ত জাহাজে মাইন লাগাতে আঃ রকীব মিয়ার সাথে শহীদ হন।
০২১৬	ইলিয়াস খন্দকার পিতা– মৌঃ ইসহাক খন্দকার গ্রাম-দৌলৎপুর/ফাজিলপুর, ফেনী।	বিদেশে চাকুরীরত। চট্টগ্রাম যুদ্ধে অংশ নেন।
০২১৭	এ,হাশেম চৌধুরী মৃত(লুঙ্গি মিয়া), পিতা– এ, মজিদ চৌধুরী গ্রাম-বনশোভা, কুমিল্লা।	তার মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন আছে। তদন্ত প্রয়োজন।
০২১৮	শান্তি মিয়া সরকার পিতা– আবিদ মিয়া সরকার গ্রমা-খলিলাবাদ, কুমিল্লা।	যুদ্ধ কালীন শত্রুবাহিনীর হাতে বন্দী হন। সাথে কোনো অস্ত্র না পাওয়ায় শত্রুরা শারিরিক নির্যাতন করে ছেড়ে দেয়।
০২১৯	আমির হোসেন বীর প্রতীক পিতা– দলিলুর রহমান গ্রাম-নৈরাজপুর, ফেনী। বর্তমানে কুয়েত নৌ-বাহিনীতে চাকুরী করছেন।	চট্টগ্রাম বন্দরে বহি সমুদ্রে জাহাজ ডোবাতে জ্ঞান হারিয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হন। বিচারে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। অকস্মাত স্বাধীন হওয়ায় জীবনে রক্ষা পান। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন।
০২২০	কে, এম, মান্নান পিতা– আমজাদ আলি প্রধান গ্রাম-পাইকাস্তা, চাঁদপুর।	চাঁদপুর যুদ্ধে অংশ নেন। (বর্তমানে পাগল)
০২২১	খুরশিদ আলম পিতা– সৈয়দ আলি সরকার গ্রাম-সিংগুলা, চাঁদপুর।	চাকুরিজীবি।
০২২২	খায়রুল আনাম পিতা– মাষ্টার সাইদুর রহমান গ্রাম-কিশোরনগর, কুমিল্লা।	শিক্ষক

০২২৩	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০২২৪	নুরুল ইসলাম পিতা– মোঃ আহমেদ আলি গ্রাম-মহিচাল, চাঁদপুর।	কৃষিজীবি
০২২৫	আরব আলী পিতা– আশু সরকার গ্রাম-ইক্কাখালি, কুমিল্লা।	কৃষিজীবি, ড্রাইভার ছিল। মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ভূমিহীন কৃষক।
০২২৬	শহীদ সিদ্দিকুর রহমান পিতা– বন্দে আলি পাটওয়ারী গ্রাম-কালিন্দী/ফসরমালি, চাঁদপুর।	যুদ্ধকালীন মারাত্মক আহত হন। স্বাধীনতার পরদিন নিজের বাড়ীতে রাজাকাররা গুলি করে হত্যা করে।
০২২৭	আব্দুল জলিল পিতা– শেখ রজ্জব গ্রাম-ভাড়ারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	
০২২৮	জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী পিতা– এ, হক চৌধুরী গ্রাম-আন্ধার মানিক ছাগলনাইয়া, ফেনী।	যুদ্ধাহত। বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।
০২২৯	আবুল হোসেন পিতা– আহমেদউল্লা গাজী গ্রাম-দাশাদী, চাঁদপুর	পানিউন্নয়ন বোর্ডে চাকুরিরত। মহাখালি।
০২৩০	মতিউর রহমান বীর উত্তম পিতা– জয়নুদ্দিন ডাক্তার গ্রাম- রঘুনাথপুর, কুমিল্লা।	স্বাধীনতা উত্তর তিনি গাইবান্ধা চলে যান, তারপর কোন খোজ পাওয়া যায়নি। তার কবরস্থান কোথায় তাও উদ্ধার সম্ভব হয়নি। খেতাব পদক, কল্যান ট্রাস্টে পড়ে আছে। তদন্ত প্রয়োজন।

০২৩১	শাহ আলম পিতা– এ, খালেক সরকার গ্রাম-খলিলাবাদ, কুমিল্লা।	বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ে চাকুরিরত।
০২৩২	আব্দুর রহমান পিতা– এম, এ, আজিজ গ্রাম-রঘুনাথপুর, কুমিল্লা।	চাঁদপুরযুদ্ধে অংশ নেন।
০২৩৩	সিকান্দার আলী পিতা– সামসুল হক খান গ্রাম-ছোট মারাধন, চাঁদপুর।	জানা নাই
০২৩৪	দীন ইসলাম পিতা– আজিজুর রহমান গ্রাম-পশ্চিম দেওভোঁগ, নারায়ণগঞ্জ।	
০২৩৫	আঃ রহিম পিতা– মোঃ হাফিজউদ্দিন গ্রাম-মামাইরকান্দী, মুন্সীগঞ্জ।	
০২৩৬	আবুল হোসেন পিতা– নূর মিয়া মল্লিক গ্রাম-মল্লিককান্দি, শরিয়তপুর।	নারায়নগঞ্জ যুদ্ধে অংশ নেন।
০২৩৭	আবুল কাশেম পিতা– আব্দুস সামাদ গ্রাম-উঃ টাটুয়া, চাঁদপুর	বেকার এবং মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।
০২৩৮	নূর মোহম্মদ পিতা– আশরাফ আলী গ্রাম- গৌরীপাশা, বরিশাল।	
০২৩৯	সিরাজ উদ্দিন পিতা– মোসলেহউদ্দিন সাতবাড়িয়া, চাঁদপুর।	১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর এর প্রথম সপ্তায় সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন।

০২৪০	বাদশা মিয়া পিতা– দুদ মিয়া সরকার গ্রাম-পদ্মার পাড়, চাঁদপুর।	
০২৪১	লুৎফর রহমান পিতা-মুখলেসুর রহমান গ্রাম-নৈরাজপুর, ফেনী।	
০২৪২	দলিল উদ্দিন হাওলাদার পিতা– আফাজউদ্দিন হাওলাদার গ্রাম-সূজাসার, মাদারীপুর।	রিক্সাচালক। গণস্বাস্থ্য থেকে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।
০২৪৩	হাবিবুর রহমান পিতা– লুতফুল কবির গ্রাম-চান্দ্রা, কুমিল্লা।	সিলেট প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী ৪৯, উত্তর বাসাবো ফোনঃ ৯৩৩০২১২
০২৪৪	ওয়াহিদুল ইসলাম পিতা–আব্দুল মতিন প্রধান গ্রাম-পূর্ব রোজরগাঁও, কুমিল্লা।	চাকুরীজীবি
০২৪৫	মোস্তাক আহমদ (মৃত) পিতা– সৈয়দ আলি ফকির গ্রাম-সিঙ্গোলা, কুমিল্লা।	১৯৭৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র -কন্যাসহ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।
০২৪৬	নুরুল হক পিতা– কাজী মাহবুব হোসেন গ্রাম-মেরিন বাট, শরিয়তপুর।	
০২৪৭	বোরহান উদ্দিন আহ্মেদ পিতা এরফানউদ্দিন আহ্মেদ গ্রাম-কালাকান্দা, চাঁদপুর।	এস. পি. ও. জনতা ব্যাংক, চাদপুর বন্দরে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ নেন। সাহসী যোদ্ধা।
০২৪৮	নজরুল ইসলাম পিতা মোঃ ইউনুস আলি গ্রাম-পদ্মারপাড়/মতলব, চাঁদপুর	

০২৪৯	সেলিম উল্লাহ খাঁন পিতা– মোঃ আলম খান গ্রাম-হাইমচর, চাঁদপুর। ৬/৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া ঢাকা।	ব্যবসায়ী। চাঁদপুর বন্দরে দিনের বেলা সালাউদ্দিন বীর উত্তম এবং শাহজাহান কবির বীর প্রতীকসহ লোরেম জাহাজ ডোবান। সাহসীযোদ্ধা
০২৫০	আলী আজম পিতা– সেকেন্দার আলী গ্রাম-কলঘরা (অসমাপ্ত)	জানা নাই
০২৫১	আবু মূসা চৌধুরী পিতা– সুলতান আহমেদ গ্রাম-হাইদচাকিয়া, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।	অসুস্থ্য অবস্থায় আমেরিকায় চিকিৎসাধীন। চট্টগ্রাম বন্দর, কাঁচপুর ফেরীঘাট যুদ্ধে অংশ নেন। ফোনঃ ৫০০৩৩৬
০২৫২	নূরুল ইসলাম চৌধুরী পিতা–ডাঃ আলি নিয়াজ চৌধুরী গ্রাম-গইজহাট, ফেনী।	যমুনা অয়েল কোম্পানীতে চাকুরীরত। সিলেট
০২৫৩	এ, হুসেন পিতা– ইসহাক সরদার গ্রাম-সাতপাকিয়া, সাতক্ষীরা।	ব্যবসায়ী। মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন।
০২৫৪	মরহুম সালাউদ্দিন আহ্মেদ বীরোত্তম পিতা– সৈয়দউদ্দিন আহমেদ গ্রাম-দাশাদী, চাঁদপুর। ফোনঃ ৮৬৬৬৭২ –২০৫ –১০৩	মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ইপিআর-এ চাকরী করতেন। ২৫ ডিসেম্বর মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম-এর সাথে চট্টগ্রামে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। চাঁদপুর এ লোরেন জাহাজ ডোবান। ১৯৯৪ সালে বিডিআর এর ডিএডি হিসাবে লিভার সিরোসিসে মৃত্যু বরণ করেন। বিডিআর পীলখানায় মরহুমকে কবরস্থ করা হয়।

০২৫৫	আনোয়ার মিয়া পিতা– থাড়ুমিয়া গ্রাম-দক্ষিণ মিখাল, চট্টগ্রাম।	বিদেশে চাকরীরত
০২৫৬	নূরুল হক পিতা– মৌঃ সামসুল হক গ্রাম-চাঁদগাও, চট্টগ্রাম।	ব্যক্তি মালিকানাধীন ওয়েল ট্যাংকারে চাকুরী করেন।
০২৫৭	হেলাল উদ্দিন আহমদ পিতা– নুরুল ইসলাম গ্রাম-সোনাপুর, ফেনী।	
০২৫৮	খুরশিদ আলম পিতা– ওয়ালিউল্লা মিয়া গ্রাম-শাহীপাড়া, কুমিল্লা।	ব্যবসায়ী দাউদকান্দী
০২৫৯	মনোজ কুমার দত্ত পিতা– ধীরেন্দ্র কুমার দত্ত গ্রাম-ধুম, চট্টগ্রাম।	ঔষধ ব্যবসায়ী। মূসা চৌধুরী এবং তিনি গ্রীক জাহাজ এ্যাভলুস ডোবান। চট্টগ্রাম বহ্নি নোঙর এবং কাঁচপুর ফেরীঘাট অভিযানে অংশ নেন। দুঃসাহসী যোদ্ধা।
০২৬০	এস,এন,মাওলা, বীর প্রতীক পিতা– ডাঃ এন,এম,মাওলা গ্রাম-দাক্ষিণ রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য জেলা।	চট্টগ্রাম বহ্নিনোঙরে জাহাজ ডোবাতে জ্ঞান হারিয়ে শত্রুর হাতে বন্দী এবং বিচারে মৃতুদন্ড দেয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্ত হন। পরে ঢাকা বিমান বন্দরে যাত্রীবাহী বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।
০২৬১	আফাজ উদ্দিন পিতা– আম্বর আলী গ্রাম-কৃষ্ণপুর, স্বরস্বতী।	(অসম্পূর্ণ ঠিকানা)

০২৬২	জসিমউদ্দিন পিতা-মুলকাতুর রহমান গ্রাম-পশ্চিম বশিকপুর, ফেনী।	বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা। ঢাকার পাশ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ করেন। ফোনঃ ৮৬৪৪৯৪
০২৬৩	আঃ মালেক পিতা– ডাঙ্গর শেখ গ্রাম-বানতলী, মুন্সিগঞ্জ।	আখাউড়া ব্যবসা করেন। মংলা এবং চাঁদপুর যুদ্ধে অংশ নেন।
০২৬৪	রুহুল আমিন পিতা– খলিলুর রহমান গ্রাম–ভূষণ বেন, চাঁদপুর।	আখাউড়ায় ব্যবসা করছেন।
০২৬৫	শফিকুর রহমান পিতা– সরুমিয়া গ্রাম-গবিন্দপুর, কুমিল্লা।	
০২৬৬	এ, কাদের পিতা– কালা মিয়া গ্রাম- সৌনরাঙ, কুমিল্লা।	
০২৬৭	নুরুল ইসলাম চৌধুরী পিতা– এম,এ চৌধুরী গ্রাম-উত্তর মূসাদিয়া, চট্টগ্রাম।	তেল কোম্পানীতে চাকুরী করছেন।
০২৬৮	এনাম উদ্দিন পিতা– রহিম উল্লা গ্রাম-জামালপুর, চট্টগ্রাম।	
০২৬৯	মোয়াজ্জেম হোসেন পিতা– জমিরউদ্দিন আহমেদ গ্রাম- পোড়াকান্দি, কুমিল্লা।	
০২৭০	সাদিক হোসেন পিতা–সিকান্দার আহমেদ ভুইয়া গ্রাম-জগতপুর, ফেনী।	চাকুরীজীবি

০২৭১	মজিবুল হক পিতা– মাহবুবর রহমান গ্রাম-লাঙ্গলমুড়া, ফেনী।	
০২৭২	মাহবুবুল আলম পিতা– সৈয়দ সামসুল হক গ্রাম-পাঁচিজোড়, চট্টগ্রাম।	
০২৭৩	বিজয় কৃষ্ণ সরকার পিতা– কালিপদ সরকার গ্রাম-মহশ্বেরপাশা, খুলনা।	
০২৭৪	গিয়াস উদ্দিন পিতা– নুরুল হক গ্রাম-দক্ষিণ সুন্দরপুর, চট্টগ্রাম।	
০২৭৫	কামরুল হুদা পিতা– খুরশীদ আলী গ্রাম-লন অফিসপাড়া যশোর টাউন।	অধ্যাপক সরকারী সিটি কলেজ যশোর। ফরিদপুর এলাকায় যুদ্ধে অংশ নেন।
০২৭৬	এ, হাশেম পিতা– এ, জব্বার গ্রাম-ঢালাই, চট্টগ্রাম।	
০২৭৭	এ, রশিদ পিতা– এ, আজিজ গ্রাম-কদরতলি, শরিয়তপুর।	
০২৭৮	জয়নাল আবেদীন পিতা– নাদেরুজ্জামান গ্রাম-পরাগলপুর, চট্টগ্রাম।	ব্যবসায়ী। চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। বর্তমানে ইটালীতে।
০২৭৯	আবু বক্কর সিদ্দিক পিতা– এ বাশার ৯৬৬ শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৫০৪১৩০	ব্যবসায়ী। চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। চট্টগ্রাম অপারেশনে যথেষ্ট সাহসিক-তার পরিচয় দেন।

০২৮০	সিরাজদৌলা পিতা– আহমেদ সোবহান মিস্ত্রী গ্রাম-পাদুয়া, চট্টগ্রাম।	
০২৮১	ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক পিতা– মনির আহমদ চৌধুরী ১৯ মেহেদীবাগ, চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ২২৭১৬৭	ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম দ্বিতীয় অভিযানে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
০২৮২	আবু বক্কর পিতা– এ, সাত্তার গ্রাম-নয়াগ্রাম, বিয়ানীবাজার, সিলেট	চাকুরিজীবি
০২৮৩	নুরুল গণি পিতা– ইলিয়াস মাষ্টার গ্রাম- মহম্মদাবাদ/বরকুশাল চট্টগ্রাম।	চাকুরিজীবি/চট্টগ্রাম অভিযানে অংশ নেন।
০২৮৪	নুরুল ইসলাম পিতা– এফ করিম সরকার গ্রাম-পুরাকান্দি, কুমিল্লা।	
০২৮৫	মহিউদ্দিন পিতা– মনসুর আহমদ গ্রাম-পশ্চিম ইশাখালি, চট্টগ্রাম।	আলমাস সিনেমা হলের সুপার ভাইজার, চট্টগ্রাম।
০২৮৬	সিরাজুল ইসলাম পিতা– গনি মিয়া প্রধান গ্রাম-আমিরাবাদ, কুমিল্লা।	যুদ্ধাহত এক পা নাই। মানবেতর জীবন যাপন করছেন।
০২৮৭	গোলাম কুদ্দুস পিতা– নুরুল হুদা মজুমদার গ্রাম-জগতপুর, ফেনী।	চাকুরিজীবি বাংলাদেশ ক্যালকুলেটর মতিঝিল, ঢাকা।

০২৮৮	সেলিমউল্লাহ ভুইয়া পিতা– আবদুল্লা ভূইয়া গ্রাম- লাঙ্গলঘুরা, ফেনী।	
০২৮৯	আলমগীর হোসেন পিতা– জালালউদ্দিন জামাদার গ্রাম-লক্ষিগঞ্জ, মাদারীপুর	সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা
০২৯০	শহীদ মোহম্মদ হোসেন ফরিদ বীর প্রতীক পিতা– আহমেদ মিয়া চট্টগ্রাম। (রেকর্ডে ফরিদপুরের ঠিকানা লিখিত)	চেইন ম্যান, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করতেন। বহ্নিনোঙরে জাহাজ ডোবাতে শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হলে, শত্রুরা ম্যানহোলের অভ্যন্তরে অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে পিছনে চাপ দিয়ে মেরুদন্ড ভেঙ্গে নির্মম ভাবে হত্যা করে।
০২৯১	ওবায়দুল হক পিতা– মোজাফফর আহ্মেদ গ্রাম-জামালপুর, জোরারগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	
০২৯২	খায়রুল বাশার পিতা– সালেহ আহমদ গ্রাম-রাঙ্গামাটি, ফটিকছড়ি পার্বত্য চট্টগ্রাম।	বিদেশে চাকুরীরত
০২৯৩	শফিউল এনাম পিতা– সুলতান আহমেদ ফরহাবাদ, নুর আলিমিয়া হাট চট্টগ্রাম	

০২৯৪	এম, ওয়াহিদ মিয়া পিতা– আয়েনউদ্দিন গ্রাম-হিত্তনিপাড়া, বড়ভাসালিয়া, চট্টগ্রাম।	
০২৯৫	এম, লোকমান পিতা– এম, ইসহাক গ্রাম-পূর্ব ঢালাই, কাটিরহাট চট্টগ্রাম।	
০২৯৬	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০২৯৭	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০২৯৮	মমিনউল্লা পাটওয়ারী বীর প্রতীক পিতা–মেহের উল্লাহ গ্রাম-মৈশাদী, চাঁদপুর।	পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা। চাঁদপুর অভিযানে সমন্বয়কারী ছিলেন।
০২৯৯	রেজাউল করিম পিতা– বজলুল করিম গ্রাম-পাঁচ বাড়িয়া, নোয়াখালী।	শিক্ষক। মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন।
০৩০০	এ, কাশেম পিতা– সোনা মিয়া গ্রাম-অভিরামপুর, ফেনী।	
০৩০১	এফ, করিম পিতা– মেছের আলি প্রধান গ্রাম-নলসর, চাঁদপুর।	
০৩০২	এমদাদুল হক পিতা– ওয়ালিউল্লাহ গ্রাম-ডিত্তটি, সোনাইমুড়া, ফেনী	চাকুরিজীবি। বি. সি. আই. সি মতিঝিল, ঢাকা।
০৩০৩	খোরশেদ আলম পিতা– শহীদ কালা মিয়া গ্রাম-রসুলপুর, রামগঞ্জ, নোয়াখালী।	পুত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ায় বাবাকে হানাদার বাহিনী ক্যাম্পে ধরে নিয়ে নির্যাতন এবং হত্যা করে। বাড়ীঘর জালিয়ে দেয়।

০৩০৪	রফিকউল্লাহ ভুইয়া পিতা– এ, মান্নান ভুইয়া গ্রাম-খলিসপাড়া, চাটখিল নোয়াখালী।	চাকুরিজীবি
০৩০৫	এম, ইসহাক ভুইয়া পিতা– মন্টু মিয়া গ্রাম-কুঞ্জশ্রীপুর, কুমিল্লা।	চাকুরিজীবি
০৩০৬	মোশারফ হোসেন পিতা– মজিবুল হক গ্রাম-মজিদপুর, ফেনী।	চাকুরিজীবি
০৩০৭	এম,সেলিম ভুইয়া পিতা– ওয়ালিউল্লা ভূইয়া গ্রাম-নিয়াজপুর, মিরেরপাড়া বেগমগঞ্জ।	ব্যবস্থাপক জনতা ব্যাংক, দক্ষিণঘাম শাখা উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা। বরিশাল যুদ্ধে অংশ নেন। ফোনঃ ৮৯৪৪৪৫
০৩০৮	মজিবুল হক পিতা– এ, আজিজ গ্রাম-পরী নিয়ামত, রামগঞ্জ, নোয়াখালী।	কৃষিজীবি
০৩০৯	এস,এস, মোস্তফা পিতা– আহমেদউল্লা মাষ্টার গ্রাম-চাঁটখিল, নোয়াখালী।	চাকুরিজীবি
০৩১০	আবুল বাশার পিতা– এ, হাকিম গ্রাম-লালপুর, চৌমুহনী নোয়াখালী	যুদ্ধোত্তর মৃত্যুবরণ করেন।
০৩১১	আবুল বাশার, পিতা– এ, বক্কর সিদ্দিক গ্রাম-কালিকাপুর, চৌমুহনী ফেনী।	

০৩১২	এম সাবির উল্লাহ পিতা– করিম বকস্ ১১ আগামাসী লেন, ঢাকা	ব্যবসায়ী
০৩১৩	ডি,কে, ভৌমিক পিতা– ফনি মোহন ভৌমিক গ্রাম-বিজবাঘ, চৌমুহনী।	বর্তমানে ভারতে বসবাস করছেন।
০৩১৪	আলী হোসেন পিতা – এ রশিদ ভুঁইয়া গ্রাম-ওমরপুর, রামগঞ্জ, নোয়াখালী।	
০৩১৫	এ, কাদের পিতা– এ, মালেক গ্রাম-শিমরাইল, কুমিল্লা।	জুতা কারখানার মালিক ১১ আগামাসি লেন, ঢাকা।
০৩১৬	এ, রাজ্জাক পিতা– এম সালাম গ্রাম-করিমপুর, সোনাপুর নোয়াখালী।	
০৩১৭	আতিকুর রহমান পিতা– মজিবুর রহমান গ্রাম- শ্রীপুর, সোনাপুর নোয়াখালী।	
০৩১৮	কামাল উদ্দিন পিতা-নাদির হোসেন গ্রাম-কামালপুর, মতলব, চাঁদপুর।	
০৩১৯	দেওয়ান শাহ্জাহান পিতা– ইয়াকুব হোসেন গ্রাম- মাসরা, বৈদ্যেরকুল মুন্সিগঞ্জ।	

০৩২০	হাবিবউল্লা বাহার পিতা– সামসুল হক বাহার গ্রাম-নলচর চন্দনপুর, হোমনা, কুমিল্লা।	সর্দার, সোয়ারীঘাট, ঢাকা।
০৩২১	এ, মতিন পিতা– আহমদ উল্লা বেপারী গ্রাম- বিষ্ণুপুর, বাতরা লক্ষীপুর।	
০৩২২	ফারুক আহমেদ, পিতা– এ, আজিজ গ্রাম-চরিপাড়া, ভাগ্যকুল মুন্সিগঞ্জ।	বর্তমানে আমেরিকায় চাকরীরত। আরিচাঘাট অভিযানে অংশ নেন।
০৩২৩	হাবিবুর রহমান পিতা– এ, রউফ গ্রাম-রঘুনাথপুর, কাশিপুর, কুমিল্লা।	
০৩২৪	চৌধুরী আমির আলী পিতা– সুজন মিয়া চৌধুরী গ্রাম-মাথাভাঙ্গা, ছয়ফুল্লাকান্দী কুমিল্লা।	পশ্চিম জার্মানীতে চাকুরিরত
০৩২৫	আবুল হোসেন দেওয়ান পিতা– দেওয়ান আলি গ্রাম-নিচিন্তপুর, নাথের পেটুয়া কুমিল্লা।	কৃষিজীবি
০৩২৬	এ, খালেক পিতা– শের মিয়া মোল্লা গ্রাম-পাটলিয়াকান্দি, হোমনা কুমিল্লা।	কৃষিজীবি

০৩২৭	দারু মিয়া পিতা– চাঁদ মিয়া গ্রাম-সামন্তগর, নবীনগর, কুমিল্লা।	কৃষিজীবি
০৩২৮	এ, ওয়াহাব, পিতা– নাজির আহমেদ গ্রাম-কালিয়াপুর, চৌমুহনী, নোয়াখালী	
০৩২৯	এনামুল হক পিতা– এম বাশার চৌধুরী গ্রাম-দুর্গাপুর, কারিয়াবাজার ফজলপুর, ফেনী।	
০৩৩০	নুরুল আলম পিতা– এ, করিম চৌধুরী গ্রাম-শিতলপুর, সীতাকুন্ডু চট্টগ্রাম।	
০৩৩১	প্রফুল্ল কুমার দাশ পিতা– দীনবন্ধুদাশ গ্রাম-জয়নগর, আবুয়ারহাট চট্টগ্রাম।	
০৩৩২	নূর হোসেন পিতা– মকবুল আহমেদ গ্রাম-ধুম, মহাজিরহাট, চট্টগ্রাম।	কৃষিজীবি
০৩৩৩	এমদাদুল হক পিতা ওবায়দুল হক গ্রাম-আম্বিয়া, মিরশ্বরাই চট্টগ্রাম।	

০৩৩৪	জয়নাল আবেদীন চৌধুরী পিতা– আজিজুর রহমান চৌধুরী গ্রাম-ইছাখালী, আবুরহাট চট্টগ্রাম।	
০৩৩৫	কে, এম, শাহ্ আলম পিতা– এ, রহমান শুকানী গ্রাম-কুচিমোড়া, সন্দ্বীপ।	
০৩৩৬	এম, হোসেন পিতা– মৌঃ ইয়াকুব গ্রাম-হারামিয়া, সন্দ্বীপ।	
০৩৩৭	রেজাউল করিম চৌধুরী পিতা– মজিদুল হক চৌধূরী গ্রাম-বামন চন্দন, মিরশ্বরাই চট্টগ্রাম।	
০৩৩৮	এম, ফুলকান পিতা– এম, মূসা, চৌধুরী গ্রাম-হারামিয়া, সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম।	
০৩৩৯	খায়রুল আলম পিতা-মুজিবুল হক গ্রাম-দূর্গাহাটা, ভুমাইনচান্দা মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।	
০৩৪০	ইউসুফ শিকদার গ্রাম-সাতঘরিয়া, সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম।	
০৩৪১	মহিউদ্দিন পিতা– মকবুল আহমদ গ্রাম-জালিয়াল, সোনাপুর নোয়াখালী।	

০৩৪২	এম, কামাল পিতা– এ, হাশেম গ্রাম-তুলাতলি, সীতাকুন্ডু চট্টগ্রাম	বিটিসি, ঢাকা কারখানায় সরবরাহ বিভাগে কর্মরত।
০৩৪৩	এ, হক, পিতা– নাদিরুজ্জামান গ্রাম-কাচিয়াপুর,পি,এম, বাজার, সন্দ্বীপ।	০৩৪৩ থেকে কোনো কমাণ্ডো যুদ্ধে অংশ নেন নাই। দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়।
০৩৪৪	ফয়সুল আলম পিতা– সালামতউল্লাহ গ্রাম-কাচিয়াপুর, পি,এম, বাজার সন্দ্বীপ। (বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন নামও ব্যবহার করে)	ভারতে বসবাস করে। মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আগমন করে কমাণ্ডোদের বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করে অর্থ আদায় করে। তার বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় অভিযোগ দেয়া আছে।
০৩৪৫	এম, এ, বাশার পিতা– ইদ্রিস মিয়া গ্রাম-কাচিয়াপুর, সন্দ্বীপ	
০৩৪৬	জহুর আহমেদ পিতা– বাদশা মিয়া গ্রাম-রসুনগিরী, চট্টগ্রাম।	
০৩৪৭	এম, হুসেন ভুইয়া পিতা– সুলতান আহমদ গ্রাম-উত্তর আম্বিয়া, মিরশ্বরাই চট্টগ্রাম।	
০৩৪৮	নূর নব্বী, পিতা– জহুরুল হক গ্রাম-বলিয়াদি, মিরশ্বরাই চট্টগ্রাম।	

০৩৪৯	এ, খায়ের, পিতা– সরু ভুইয়া গ্রাম- জামারুতারপুর জোরারগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	
০৩৫০	জবল হুসেন, পিতা– এ, হক গ্রাম-হাঁটকান্দি, কাজিরহাট চট্টগ্রাম।	
০৩৫১	আহমেদুর রহমান পিতা– নূর মহম্মদ গ্রাম-গুনমা চন্দর, দরগারহাট চট্টগ্রাম।	
০৩৫২	বিজয় কৃষ্ণ দাশ পিতা– প্রকাশ চন্দ্র দাশ গ্রাম-নাইয়ারপুর, মহাজনহাট, চট্টগ্রাম।	পুলিশে কর্মকর্তা।
০৩৫৩	এম, ইউনুস, পিতা– নূর মহম্মদ গ্রাম-পাতাকুট, আজমপুর জোরারগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	
০৩৫৪	এম, ইকবাল, পিতা– এম, গ্রাম-সাহাপুর, জোরারগঞ্জ চট্টগ্রাম।	
০৩৫৫	মানিক চন্দ্র দাশ পিতা–বিপিন চন্দ্র দাশ গ্রাম-মাগাদিয়া, আবু তোরাব চট্টগ্রাম।	
০৩৫৬	মাহমুদুল হক, পিতা– এ, হক গ্রাম-হরনি, পটিয়া টাউন নোয়াখালী।	

০৩৫৭	শাহ্‌জাহান, পিতা–মনির আহমেদ গ্রাম-বিয়াখালি, দুর্গাহাট চট্টগ্রাম।	ষ্টোর কীপার রাংগুনিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।
০৩৫৮	গোপাল চন্দ্র দাশ পিতা-পানিয়ানন্দ দাশ গ্রাম-হান্দিগ্রাম, সুতা কামালদহ চট্টগ্রাম।	পুলিশের কনষ্টেবল
০৩৫৯	খয়বর আলি, পিতা– নেসারউদ্দিন গ্রাম-নোয়াবোস, পাঞ্চগাছিয়া কুড়িগ্রাম।	ড্রাইভার, বিডিআরএস লালমনীরহাট
০৩৬০	এন, এম, এলাহী পিতা– আশরাফুল আলম গ্রাম-মৌলাপাড়া, কুড়িগ্রাম।	
০৩৬১	শশী ভূষণ রায় পিতা– জপরাম রায় গ্রাম-সোমনাপাড়া, নাজিমখান, কুড়িগ্রাম।	
০৩৬২	নরেন্দ্র নাথ পিতা– নন্দ কুমার রায় গ্রাম-দূর্গাপুর, চান্দিজাম কুড়িগ্রাম।	
০৩৬৩	রুহুল আমিন গ্রাম-তারাপুর, সুন্দরগঞ্জ, রংপুর	
০৩৬৪	নওশের আলী পিতা– হানিফউদ্দিন গ্রাম-সতীঝার, পাঁচগাছি, কুড়িগ্রাম।	

০৩৬৫	হুসেন আলি পিতা-সফেতউল্লাহ গ্রাম-চর সতীঝার, কুড়িগ্রাম।	
০৩৬৬	কামাল উদ্দিন পিতা- আব্দুস সোবহান গ্রাম-সিংপাড়া, পঞ্চগ্রাম দিনাজপুর।	
০৩৬৭	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০৩৬৮	ফনিন্দ্র নাথ ব্রাহ্মন পিতা- বিশ্বনাথ ব্রাহ্মন গ্রাম-সিদ্ধান্ত মালতী বাড়ী আলীপুর, রংপুর।	
০৩৬৯	নুরুল আলম পিতা- সৈয়দ আলি মাষ্টার গ্রাম-সারাই, হারাগাছ, রংপুর।	
০৩৭০	কাজিম আলি পিতা- কাছু মাহমুদ গ্রাম-কাচিয়াচর, পাঁচগাছি, কুড়িগ্রাম।	
০৩৭১	এ, খালেক পিতা- কপিলউদ্দিন গ্রাম-ভক্তিপুর, রানীপুকুর মিঠাপুকুর, রংপুর।	
০৩৭২	মজিবুর রহমান পিতা- এ, কাদের গ্রাম-ছোট মহেশপুর, নবাবগঞ্জ দিনাজপুর।	
০৩৭৩	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	

০৩৭৪	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	
০৩৭৫	জয়াব আলি পিতা– জহিরউদ্দিন গ্রাম-ঢালা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	
০৩৭৬	মোকসেদ আলী পিতা– আবেদ আলী গ্রাম-ব্যাংতাড়াই, কাউনিয়া কুড়িগ্রাম।	
০৩৭৭	একরামুল হক পিতা– নাজিমউদ্দিন মন্ডল গ্রাম-শালকুড়িয়া, নবাবগঞ্জ দিনাজপুর।	
০৩৭৮	জিন্নাতুল আলম পিতা– আশরাফুল আলম গ্রাম-লাঙ্গলমুরা, পীরগঞ্জ দিনাজপুর।	
০৩৭৯	হাবিবুর রহমান পিতা– মহিউদ্দিন গ্রাম-পাকুসিয়া, বাহাদুরিয়া নবাবগঞ্জ।	
০৩৮০	নাজিমুদ্দিন, পিতা–কালু বেপারী গ্রাম–শ্যামাগ্রাম, নবীনগর কুমিল্লা।	
০৩৮১	মমিন উদ্দিন, পিতা– বসিউদ্দিন গ্রাম-সাফাই, হারাগাছ, কুড়িগ্রাম।	
০৩৮২	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	

০৩৮৩	তোফাজ্জল হোসেন পিতা– সিরাবউদ্দিন গ্রাম-গরুহারা, পাঁচগাছি কুড়িগ্রাম।	
০৩৮৪	আকবর আলি পিতা– সিরাজউদ্দিন গ্রাম-গরুহারা, পাঁচগাছি কুড়িগ্রাম।	
০৩৮৫	জাভেদ আলি পিতা– খেতাব মন্ডল গ্রাম-যাত্রাপুর সাহনান্দা উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	
০৩৮৬	বদরুল আলম পিতা– বখতিয়ার আলি গ্রাম-মূলঘর, ফকিরহাট বাগেরহাট।	
০৩৮৭	ফরহাদ আলি পিতা– শওকত আলি গ্রাম-গড়াইখালি, খুলনা।	
০৩৮৮	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ	
০৩৮৯	সৈয়দ রেজওয়ান পিতা– সৈয়দ আব্দুল গনি গ্রাম-সৈয়দ মহল্লা, বাগের হাট।	
০৩৯০	নজুরুল হুদা, পিতা–সুবদল শেখ গ্রাম-মির্জাপুর লেন, খুলনা।	
০৩৯১	আব্দুর রহমান পিতা– লেহাজউদ্দিন গ্রাম-তালিব, সিংগাইর ইরটাপুর, ঢাকা।	

০৩৯২	কামরুল আলম পিতা– বখতিয়ার আলি গ্রাম-মুলঘর, বাগের হাট।	
০৩৯৩	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০৩৯৪	আবুস সালাম পিতা– সফিরউদ্দিন মন্ডল গ্রাম-চরকি, নবাবগঞ্জ বিরামপুর।	
০৩৯৫	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ।	
০৩৯৬	ইকিয়াসুর রহমান পিতা– এহসানউদ্দিন গ্রাম-ছোট মহেশপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	
০৩৯৭	মোঃ টুকু, পিতা–সৈয়দ মতলেব গ্রাম- সৈয়দমহল্লা, বাগের হাট।	
০৩৯৮	ফিরোজ আলি পিতা– শওকত আলি গ্রাম-গাড়ইখালি, খুলনা।	সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলে চাকুরীরত।
০৩৯৯	সিরাজুল ইসলাম পিতা– মোঃ রশিদ গ্রাম-কবুতরখোলা, ভাগ্যকুল মুন্সিগঞ্জ	
০৪০০	নির্মল বিজয় বালা পিতা– অনাদি নাথবালা গ্রাম-টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।	শিক্ষকতা করেন।
০৪০১	জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস পিতা– সুধীর চন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম- টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।	

০৪০২	রবীণ চন্দ্র বালা পিতা– বিন্দু বিহারী বালা গ্রাম-টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।	
০৪০৩	আব্দুল বারী পিতা– রেকর্ডে নাই গ্রাম-বাজেরগাতি, গোপালগঞ্জ।	
০৪০৪	শ্যামল চন্দ্র মন্ডল পিতা– উপেন্দ্র নাথ মন্ডল গ্রাম-কালনা, বাজেরগাতি গোপালগঞ্জ	
০৪০৫	কেশব লাল বালা পিতা– রেকর্ডে নাই গ্রাম-ধুলগ্রাম, কালকিনি শরিয়তপুর।	
০৪০৬	আলাউদ্দিন খান পিতা– কাশেম খান গ্রাম-বালিহাটি, দাওখালি, ভাঙ্গা শরিয়তপুর।	
০৪০৭	পঞ্চানন সরকার পিতা– নগেন্দ্রনাথ সরকার গ্রাম-আলগী, ভাঙ্গা শরিয়তপুর।	
০৪০৮	ইয়ার আলি পিতা– এম,আর,এ, মুন্সি গ্রাম-সোতরা, মোকসেদপুর শরিয়তপুর।	
০৪০৯	নিখিল চন্দ্র বৈরাগী পিতা– রসিকলাল বৈরাগী গ্রাম-কালিগ্রাম, মোকসেদপুর শরিয়তপুর।	

০৪১০	চিন্ময়কান্তি মন্ডল পিতা- চৌধুরীনাথ মণ্ডল গ্রাম-ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ।	
০৪১১	নিজামুল হক পিতা- তালিকায় নাই গ্রাম-বন্ধনবাড়িয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।	
০৪১২	এম,এ, হোসেন, পিতা- তালিকায় নাই গ্রাম-নিয়ামতপুর, লক্ষিপুর পালং, শরিয়তপুর।	
০৪১৩	এ, মজিদ মিয়া পিতা- এ, জব্বার মিয়া গ্রাম-সুবেদারকান্দী, আঙ্গারিয়া, পালং, শরিয়তপুর।	
০৪১৪	আলি আজম গ্রাম-মহেশপুর, ভেদরগঞ্জ মাদারীপুর।	
০৪১৫	হাবিবুর রহমান পিতা- কাইমুদ্দিন গ্রাম-এলায়েল, পাণ্ডুরিয়া	
০৪১৬	মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী পিতা- এম,এস,এ, সিদ্দিকী গ্রাম-মোলামেরডাঙ্গি থানা-সদরপুর, ফরিদপুর	ভেটরনারী সার্জন। সরকারী পশু হাসপাতল, ফরিদপুর।
০৪১৭	মোতাহার হোসেন শেখ পিতা- দাগ মাতবর গ্রাম-মোলামের ডাঙ্গি, সদরপুর, ফরিদপুর।	

০৪১৮	মোশারফ হোসেন পিতা– মেসের আলি গ্রাম-আমীরাবাদ, সদরপুর ফরিদপুর।	
০৪১৯	সামসুল হক পিতা– আদিলউদ্দিন মিয়া গ্রাম-আকুলিয়ারচর, সদরপুর, ফরিদপুর।	
০৪২০	খলিলুর রহমান পিতা– এ, মালেক মোল্লা গ্রাম-নাছিরপুর, সদরপুর ফরিদপুর।	
০৪২১	মোয়াজ্জেম হোসেন পিতা– আফসারউদ্দিন গ্রাম-মলমেরডাঙ্গি, সদরপুর ফরিদপুর।	
০৪২২	ডাঃ কে, এম, রায়হান পিতা– চাঁদ ফকির গ্রাম-উত্তর আলমনগর চর ভদ্রাসন, ফরিদপুর।	কবিরাজ, গ্রীন সুপার মার্কেট দোতলা।
০৪২৩	শেখ সুলতান পিতা– শেখ হাফিজ গ্রাম-গুহালক্ষিপুর ফরিদপুর শহর।	
০৪২৪	সুশীল কুমার রায়, পিতা– গ্রাম সোনাইপুরী, নরিয়া বাজার ফরিদপুর।	স্কুল শিক্ষক
০৪২৫	নিরঞ্জন কুমার মন্ডুল, পিতা– গ্রাম-বিজয়নগর, চামুন্ডীনগর বালিয়াকান্দী, ফরিদপুর।	

০৪২৬	সূর্যকান্ত মিরবার, পিতা– গ্রাম-বোলপুর, বাগেরহাট।	
০৪২৭	দুলাল কুমার দাস পিতা– রাধাকান্ত দাশ গ্রাম-পিরোজপুর টাউন পিরোজপুর।	
০৪২৮	এম, রব্বান আলী পিতা– হানিফউদ্দিন মোল্লা গ্রাম-মৌকুড়ি, পাংশা রাজবাড়ী।	
০৪২৯	রফিকুল ইসলাম, পিতা–কামালউদ্দিন গ্রাম-কাচারিপাড়া, পাংশা রাজবাড়ী।	
০৪৩০	রুকুজ্জামান পিতা– সৈয়দ আলী গ্রাম-কাচারিপাড়া, পাংশা রাজবাড়ী।	
০৪৩১	গোলাম রহমান, পিতা– গ্রাম-কাচারিপাড়া, পাংশা রাজবাড়ী।	
০৪৩২	তজিমউদ্দিন আহমেদ পিতা– তারুমন্ডল গ্রাম-নবকৃষ্ণপুর, পাংশা।	
০৪৩৩	এ, রব গ্রাম-মাটি ভাঙ্গা, নাজিরপুর পিরোজপুর।	

০৪৩৪	নির্মল কুমার ঢালি পিতা–বিজয় বিহারী ঢালি গ্রাম–মাটিভাঙ্গা, নাজিরপুর পিরোজপুর।	
০৪৩৫	নাসির হায়দার, (মরহুম) পিতা– এ, সামাদ গ্রাম-মহম্মদপুর, নাজিরপুর	সহকারী সচিব (স্বাস্থ্যমন্ত্রণা-লয়) হিসাবে চাকুরী কালীন সময়ে ১৯৯৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
০৪৩৬	সমীর রঞ্জন দত্ত পিতা– সুধাময়ীদত্ত গ্রাম-মগাদিয়া, আবুতোরার চট্টগ্রাম।	
০৪৩৭	ইয়ার আলী, গ্রাম-চরমাটিভাঙ্গা, নাজিরপুর পিরোজপুর।	
০৪৩৮	এ, হক, পিতা– সিরাজুলহক গ্রাম-চরমাটিভাঙ্গা, নাজিরপুর, পিরোজপুর	
০৪৩৯	নুরুল ইসলাম পিতা– ইমামউদ্দিন আহমেদ গ্রাম-চরমাটিভাঙ্গা, নাজিরপুর, পিরোজপুর।	
০৪৪০	স্বপন কুমার মন্ডল পিতা– নরেন্দ্রনাথ মন্ডল গ্রাম-মাথাভাঙ্গা, নাজিরপুর পিরোজপুর	

০৪৪১	জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম-মদন বানিয়ারি, নাজিরপুর পিরোজপুর।	ম্যাজিস্ট্রেট, লক্ষিপুর আদালত।
০৪৪২	ইদ্রিস আলী পিতা– কাশেম আলি গ্রাম-বারাইবুনিয়া, নাজিরপুর পিরোজপুর।	আয়কর বিভাগ, খুলনায় চাকরীরত।
০৪৪৩	মোশাররফ হোসেন গ্রাম-মাদুলিহারা, হোগলাবুনিয়া নাজিরহাট, পিরোজপুর।	
০৪৪৪	এ, রশিদ পিতা– আসগর আলি মিয়া গ্রাম-কির্ত্তিপাশা, ঝালকাঠি।	শ্রম কল্যাণ দপ্তর বান্দর বনে চাকরীরত।
০৪৪৫	আমজাদ হোসেন পিতা– এলামুদ্দিন মিয়া গ্রাম-কির্ত্তিপাশা, ঝালকাঠি	ব্যবসায়ী
০৪৪৬	নিকুঞ্জলাল বারই পিতা– রজনীকান্ত বারই গ্রাম-সিমুলিয়া, ঝালকাঠি	প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক।
০৪৪৭	অমল চন্দ্র নট্ট পিতা– নারায়ন চন্দ্র নট্ট গ্রাম-কাঠপট্টি, ঝালকাঠি	ব্যবসায়ী
০৪৪৮	মজিবুর রহমান পিতা– কাজী লালুউদ্দিন গ্রাম-বোয়ালিয়া, বাগেরহাট	
০৪৪৯	ইয়াকুব আলী পিতা– আইয়ুব আলী গ্রাম-কুমার গাহা, লেসাগঞ্জ হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।	নিখোজ, অনেক চেষ্টা করেও বর্তমান অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হয়নি। নদী ভাঙ্গনে গ্রাম থেকে চলে যান।

০৪৫০	এম, সি, মজুমদার পিতা- আর,সি, মজুমদার গ্রাম-কালীবাড়ী, মোড়লগঞ্জ বাগেরহাট।	
০৪৫১	এস,কে মন্ডল, নিকুঞ্জ বিহারী গ্রাম-কালীবাড়ী, বাগেরহাট।	
০৪৫২	গোপিনাথ তালুকদার, পিতা-X গ্রাম-কালীবাড়ী, বাগেরহাট	
০৪৫৩	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০৪৫৪	মীর সাইদুজ্জামান, আমজাদ গ্রাম-দোহারপাড়া, পাবনা।	
০৪৫৫	সামসুল আলম, পিতা- X গ্রাম-সোহাসঢাল, বরিশাল।	
০৪৫৬	মোজাম্মেল হক, পিতা- X গ্রাম-মহেশপুর, বরিশাল।	
০৪৫৭	পি, কে হাওলাদার, পিতা- X গ্রাম-রাজাপুর, ঝালকাঠি	
০৪৫৮	নরেন্দ্রনাথ মন্ডল পিতা- উপেন্দ্রনাথ মন্ডল গ্রাম-জগদীশপুর, ঝালকাঠি	
০৪৫৯	দিলিপ কুমার মিত্র পিতা- কৃষ্ণকান্ত মিত্র গ্রাম-শতদেশকাঠি, ঝালকাটি।	
০৪৬০	অতুল কৃষ্ণ মিত্র পিতা-সুরেন্দ্রনাথ মিত্র গ্রাম-কাটপট্টি, ঝালকাঠি।	ব্যবসায়ী
০৪৬১	নিরঞ্জন বিশ্বাস পিতা- ভাগ্যরাম বিশ্বাস গ্রাম-জগদীশপুর, ঝালকাঠি।	

০৪৬২	এম বারেক, পিতা– এ, ওয়াহেদ গ্রাম-গোয়াতন, ঝালকাঠি।	
০৪৬৩	তপন কুমার মুখার্জি পিতা– শান্তিরঞ্জন মুখার্জি গ্রাম-কীর্ত্তিপাশা, ঝালকাঠি।	
০৪৬৪	দিলীপ কুমার দেবনাথ, পিতা– গ্রাম-নিয়ামতি, বাকেরগঞ্জ	
০৪৬৫	বাহার উল্লাহ, পিতা–খোদাবক্স গ্রাম-রামচন্দ্রপুর, কুড়িগ্রাম।	
০৪৬৬	গোলাম হোসেন পিতা– গান্দলা বেপারী গ্রাম-রামপুর, কুড়িগ্রাম	
০৪৬৭	মাহবুবুর রহমান পিতা– করিম বক্স গ্রাম-রামপুর, কুড়িগ্রাম।	
০৪৬৮	এন্তাজ আলী পিতা– নাদের বক্স গ্রাম-রামপুর, কুড়িগ্রাম।	
০৪৬৯	আবু বক্কর সিদ্দিক পিতা– আবু সাত্তার গ্রাম-হরিনাথপুর, পলাশবাড়ী রংপুর।	
০৪৭০	আশরাফুল আজাদ পিতা– আজিমউদ্দিন গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম।	
০৪৭১	গোলাম মোস্তফা গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম	
০৪৭২	আমিনুল ইসলাম গ্রাম-রামপুরা, গবিন্দপুর।	

০৪৭৩	সাইদুর রহমান গ্রাম-রামপুরা, গবিন্দপুর	
০৪৭৪	সামসুল হক গ্রাম-রামপুরা, গবিন্দপুর	
০৪৭৫	আব্দুল আজিজ গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম	
০৪৭৬	হারুন-অর-রশিদ গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম	স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত।
০৪৭৭	রফিকুল ইসলাম গ্রাম-বারিনাথপুর, কুড়িগ্রাম।	
০৪৭৮	ফয়জুর রহমান গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম	
০৪৭৯	জিন্নাত আলী, পিতা- X গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম।	
০৪৮০	মহম্মদ আলী গ্রাম- রামপুরা, কুড়িগ্রাম	
০৪৮১	বজলুর রহমান, পিতা- X গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম।	
০৪৮২	রফিকুল ইসলাম, পিতা- X গ্রাম-রামপুরা, কড়িগ্রাম	
০৪৮৩	জসিমউদ্দিন, পিতা- X গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম	
০৪৮৪	বিনয় কুমার, পিতা- X গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম	
০৪৮৫	এ, মজিদ, পিতা- ওমর আলি গ্রাম-ফরিদপুর, পলাশবাড়ী কুড়িগ্রাম।	
০৪৮৬	মাহবুবুর রহমান, পিতা- X গ্রাম-রংপুর, কুড়িগ্রাম।	

০৪৮৭	শরিফউদ্দিন, পিতা– X গ্রাম-রংপুর, গবিন্দগঞ্জ কুড়িগ্রাম।	
০৪৮৮	ইউনুস মিয়া গ্রাম-মহম্মদপুর, চাঁদপুর।	
০৪৮৯	সামসুল হুদা গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম।	
০৪৯০	জুয়েল মিয়া গ্রাম-হরিয়ানলাম, কুড়িগ্রাম।	
০৪৯১	এ, গফফার গ্রাম-হসিয়াতপুর, পলাশবাড়ী।	
০৪৯২	এম, আর, সিদ্দিকী গ্রাম ফুলবাড়ী, পার্বতীপুর।	
০৪৯৩	ফজলুল হোসেন গ্রাম-মুন্সিপাড়া, রংপুর শহর।	
০৪৯৪	মকবুল হোসেন গ্রাম-রামপুরা, কুড়িগ্রাম।	
০৪৯৫	এন, বনী, পিতা– এম, হারুন গ্রাম-হরিনাথপুর, গবিন্দগঞ্জ কুড়িগ্রাম।	
০৪৯৬	প্রশিক্ষণ গ্রহনে ব্যর্থ	
০৪৯৭	কবির মিয়া, পিতা– বজলু গ্রাম-বারীকান্দি, কুমিল্লা।	
০৪৯৮	আব্দুল মান্নান, পিতা– সুলতান গ্রাম-চর বাড্ডা, কুমিল্লা।	

০৪৯৯	মোকসেদুর রহমান গ্রাম-বারীকান্দি, কুমিল্লা।	
৬৫৪৫ ৫	এম, হোসেন বীর প্রতীক গ্রাম-বারীকান্দি, কুমিল্লা।	কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে দপ্তর পরিচালক। অবসর প্রাপ্ত
৬৬০৫ ৯	জালাল উদ্দিন বীর উত্তম পিতা– মরহুম ইসমাইল মোল্লা মীরপাড়া মোড়, মাগুরা সদর, মাগুরা।	পলাশ জাহাজ ১০ ডিসেম্বর খুলনায় আক্রান্ত হলে তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ হন। অবসর প্রাপ্ত নৌ-কর্মকর্তা
৬৪০৫০৮	নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক পরবটিয়া, পাবনা।	নৌ-বাহিনীতে কর্মরত।
৬৪০৩৪২	এ, হাকিম বীর প্রতীক গ্রাম-কানসারা, চাঁদপুর।	চাঁদপুর যুদ্ধে অংশ নেন।
৬৬০৩০৬	কে, ইউ, আহম্মদ গ্রাম-দারীচর ঢাকা।	অবসরপ্রাপ্ত নৌ-কর্মকর্তা
৬৬০৩০৫	এস, এ, ভূইয়া গ্রাম- দারীরচর, ঢাকা।	লেঃ কমাণ্ডার, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী।
৬৭০১৩৪	এ, মালেক বীর বীক্রম গ্রাম- চায়ল, কুমিল্লা।	নৌ-বাহিনীতে কর্মরত
৬৬০৬০৬	এম, এফ, হক গ্রাম- তুলাতলি, কুমিল্লা	অবসরপ্রাপ্ত নৌ-কর্মকর্তা।

পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর যে সকল বাঙালি সদস্য পদ্মা ও পলাশ জাহাজে মিত্র ও কমান্ডো বাহিনীর সাথে খুলনা অভিযানে অংশ নেন।

১। আতাউল হক
২। এম, এ, কুদ্দুছ
৩। শহীদ রুহুল আমিন বীর শ্রেষ্ঠ
৪। আফজাল মিয়া বীর উত্তম
৫। গোলাম মাওলা বীর উত্তম
৬। মহিবউল্লা বীর বিক্রম
৭। এম, এইচ, মোল্লা বীর বিক্রম
৮। শহীদ ফরিদ উদ্দিন
৯। শহীদ আক্তার উদ্দিন বীর বিক্রম
১০। শহীদ মোঃ দৌলত বীর বিক্রম
১১। এ, তাহের-১
১২। এ, তাহের-২
১৩। মমতাজউদ্দিন
১৪। এম,এ, কে আজাদ
১৫। মোঃ ইছহাক
১৬। আঃ মোত্তালেব
১৭। এ, আর, খান
১৮। এম, এন, মোস্তফা
১৯। কামালউদ্দিন
২০। শহীদ এম এ মালেক
২১। এ, মতিন
২২। আঃ হাই
২৩। আমির হোসেন
২৪। এম, এন, হুদা
২৫। এম, এস হক
২৬। দীন মোহাম্মদ
২৭। মোঃ আবুল কালাম
২৮। আলতাফ হোসেন
২৯। মোঃ ইসমাইল
৩০। এফ, ইউ, খন্দকার
৩১। সিরাজদৌল্লা
৩২। নজরুল ইসলাম বি.পি
৩৩। এ, রউফ
৩৪। শহীদ এস, এম, রহমান
৩৫। শহীদ এম, হক
৩৬। শহীদ এ, আর, ভুইয়া
৩৭। শহীদ এস, এম রহমান
৩৮। এস, এ, মজুমদার
৩৯। এ, এ সরকার
৪০। রফিকউল্লাহ
৪১। বি জাকের

শহীদ নৌ-কমান্ডো তালিকা

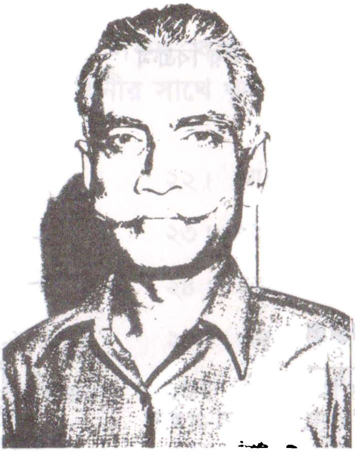
১।	শহীদ আব্দুল রকিব মিয়া বীর বিক্রম	–ফুলছড়ি ঘাট
২।	শহীদ আফতাব উদ্দিন	– মংলা বন্দর
৩।	শহীদ সিরাজুল ইসলাম	– মংলা বন্দর
৪।	শহীদ রফিকুল ইসলাম	– পলাশ জাহাজ, খুলনা
৫।	শহীদ সিদ্দিকুর রহমান	– নিজ বাড়ীতে
৬।	শহীদ আবুল হাসেম	– ফুলছড়ি ঘাট
৭।	শহীদ আব্দুস সামাদ	– ফুলছড়ি ঘাট
৮।	শহীদ খবিরুজ্জামান	– টেকের হাট
৯।	শহীদ মোহাম্মদ হোসেন, বীর প্রতীক	– চট্টগ্রাম

আহত নৌ-কমাণ্ডো তালিকা

১। বশির উদ্দিন আহমদ
২। জহুরুল হক
৩। আলফাজ উদ্দিন
৪। শমশের আলী
৫। শামসুদ্দিন সামু মৃত
৬। মানিক চন্দ্র
৭। আঃ সাত্তার
৮। সিরাজুল ইসলাম
৯। আবু মুসা চৌধুরী
১০। জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
১১। মতিউর রহমান, বীর প্রতীক
১২। আমির হোসেন
১৩। গোলাম রব্বানী

স্বাধীনতা উত্তর যারা মৃত্যু বরণ করেছেন

১। ডাঃ মোঃ শাহ্ আলম বীর উত্তম
২। এস, এ, মাওলা বীর প্রতীক
৩। সালাউদ্দিন আহম্মেদ, বীর উত্তম
৪। মোস্তাক হোসেন
৫। আবুল কাশেম চৌধুরী
৬। নাসির হায়দার
৭। গোলাম রব্বানী
৮। আঃ হাশেম
৯। শহীদ হোসেন
১০। সামসদ্দিন সামু
১১। জয়নাল আবেদীন
১২। কামাল





মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী ও মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেকটরের সেকটর কমাণ্ডার মোঃ রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম



শহীদ ইব্রাহিম মাষ্টার বি.টি। কমাণ্ডোদের নিজগৃহে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে হানাদার কর্তৃক শহীদ হন।





'৭১ এ নৌ-যোদ্ধাদের সহযোগী পিতা ও কন্যা মাষ্টার অব্দুর রশিদ খান ও হাসনা বানুখান।



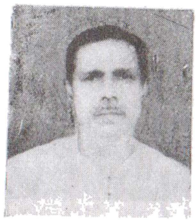


নুরুল হক

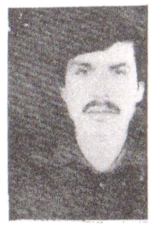
খুলনা অঞ্চলে কয়েকজন দুঃসাহসী স্থল বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধা খিজির আলী বীর বিক্রম, শাহজাহান মাষ্টার, শেখ ওয়াহিদুজ্জামান, শেখ কামরুজ্জামান টুকু, মাহবুবুল আলম হিরন, মোঃ বাবর আলী, হুমায়ূন কবীর বালু, শেখ আব্দুল কাইয়ুম।



মোঃ খিজির আলী



মোঃ শাজাহান আলী মাষ্টার



শেখ ওয়াহিদুজ্জ



মোঃ বাবর আলী



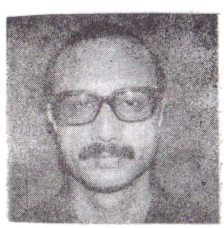
হুমায়ুন কবীর বালু



শেখ আব্দুল কাইয়ুম



শেখ কামরুজ্জামান টুকু



মাহবুবুল আলম হিরণ

C E R T I F I C A T E.

The naval Commando SAZEDUL HAQUE S/O LATE MVI. ALIM - UDDIN AHMED Village MADARIPUR P.O. MADARIPUR P.S. MADARIPUR Dist. FARIDPUR was detailed on a Top Secret mission which was not known to all. As such he was away from Camp from 26th Sep. to 2nd December, 1971.

His absence from the camp for the above period will be considered as on duty.

HQ D Sector
Dacca
Jan 72.

H.Q. D A SECTOR

(N C MITRA)
Maj
BM

C E R T I F I C A T E.

This is to certify that SAZEDUL HAQUE S/O Late Mvi Alimuddin Ahmed village MADARIPUR, P.O. MADARIPUR DIST. FARIDPUR has been Naval Commando Guirrilla voluntar. I detail -ed him for a number of most dangerious tasks calling for courage and determination of the highest order. This young man along with MEHBOOB and GHAFOOR also of MADARIPUR carried out all the tasks successfully. Due to ships sunk by these freedom fighter and elimination of top collaborators by these brave boys, the top ranks of the enemy lost their nerves and realization of freedom was brought nearer.

In my openion their contribution to the freedom struggle is of such a nature that it has no price. No amount of reward can be an appropriate compensation for the risk and deep devotion shown by these young man.

I feel proud of having selected them and will remain so as long as I live.

Date

16 Dec 1971.

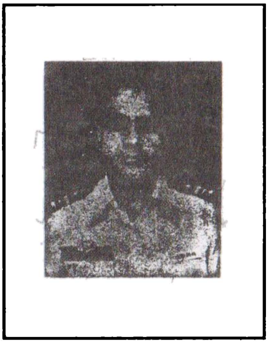
Shabeg Singh

(SHABEG SINGH)
Brig
Comdr
HQ DELTA SECTOR

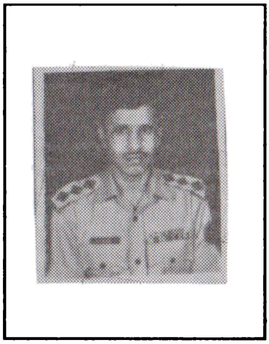
(Brig Beg of Agartala)

Brig
Comdr
HQ DELTA SECTOR

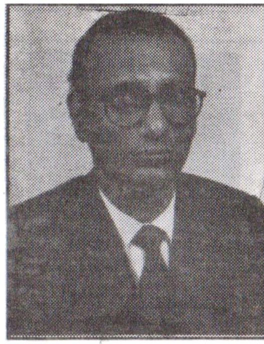
নৌ- কমাণ্ডোদের অভিযান কত ঝুকিপূর্ণ ছিল এ দু'টি সার্টিফিকেট তার প্রমাণ বহন করে।



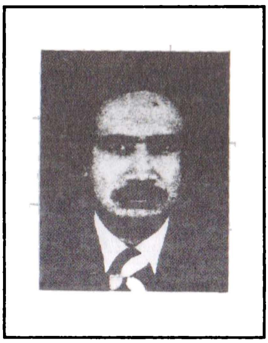
লেঃ কঃ জালালউদ্দিন আহমেদ
বীর উত্তম



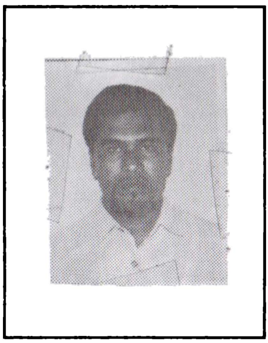
সালাউদ্দিন আহমেদ
বীর উত্তম



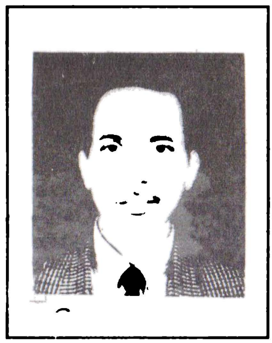
মমিনউল্লাহ্ পাটওয়ারী
বীর উত্তম



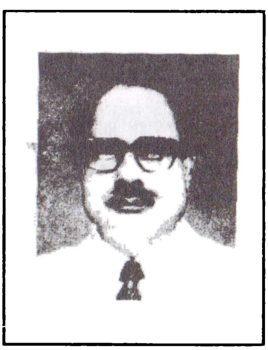
ডঃ শাহ্ আলম বীর উত্তম



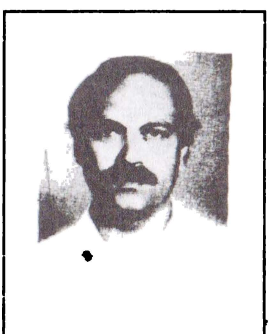
শাহজাহান কবির বীর প্রতীক



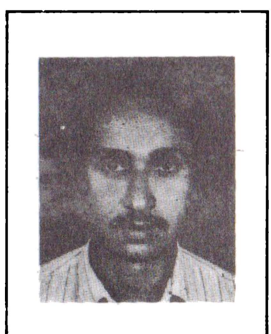
শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম



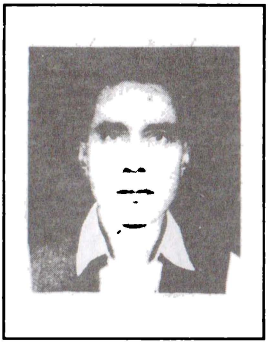
মাযহারউল্লাহ্ বীর উত্তম



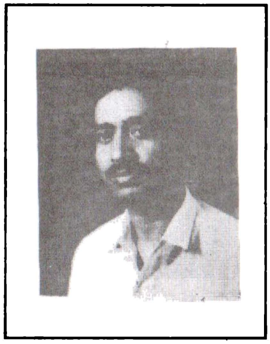
ফারুক-ই-আযম বীর প্রতীক



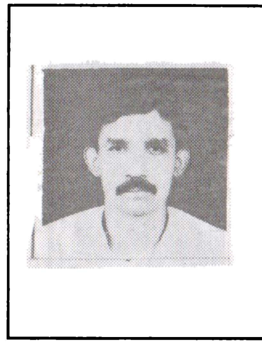
মোহাম্মদ হোসেন বীর প্রতীক



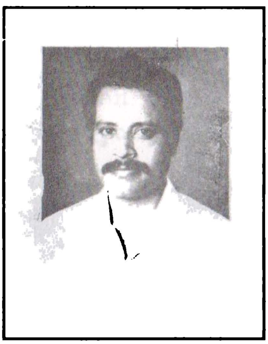
এস.এ. ভুইয়া



খোরশেদ আলম বীর প্রতীক



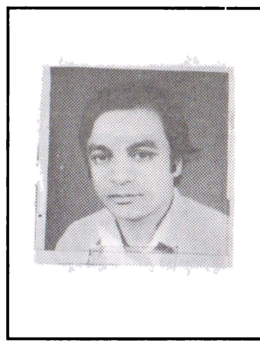
মতিউর রহমান বীর প্রতীক



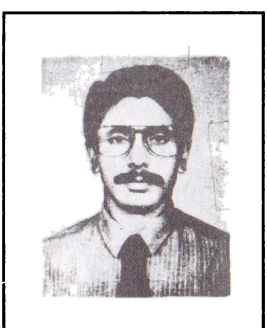
বোরহানউদ্দিন আহমেদ



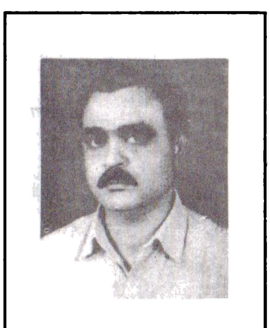
সাজেদুল হক চুন্নু



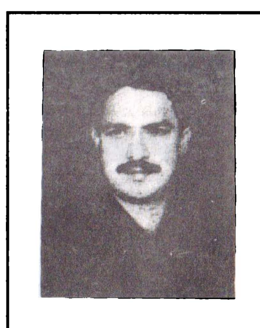
সেলিমউল্লাহ খান



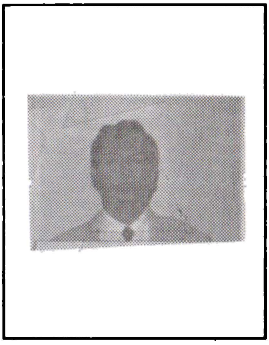
আবু তাহের



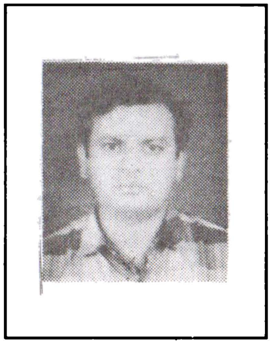
আবু মূসা চৌধুরী



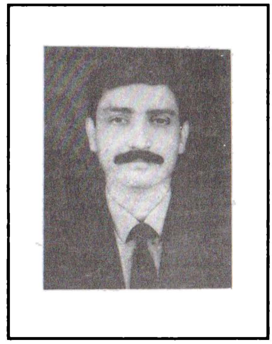
এমদাদ হোসেন



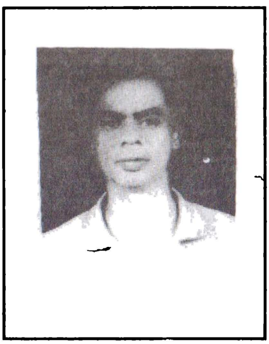
কামরুল হুদা



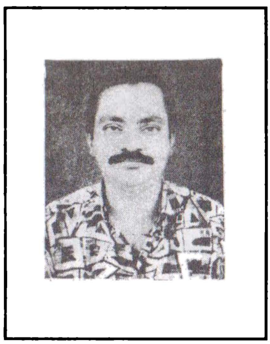
মনোজ কুমার দত্ত



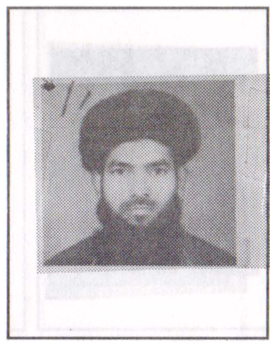
ফজলুল কবির



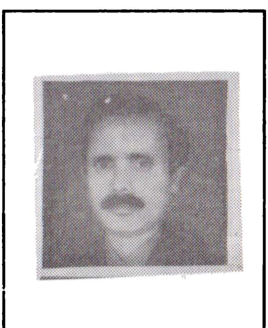
হাবিবুল হক



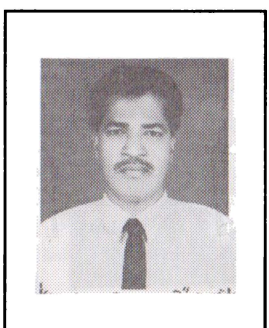
আলফাজউদ্দিন



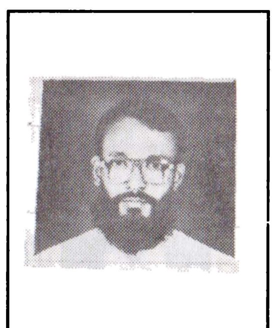
জি.এ.এ. রহিম



হাফিজুর রহমান



আবু বক্কর সিদ্দিক



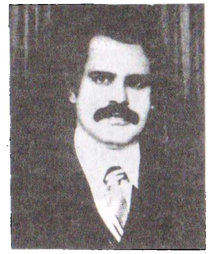
নজরুল ইসলাম



আঃ গফুর



আঃ সাত্তার



অরুন ভট্টাচার্য্য



বিল্লাল হোসেন



মুজিবুর রহমান



বদিউল আলম



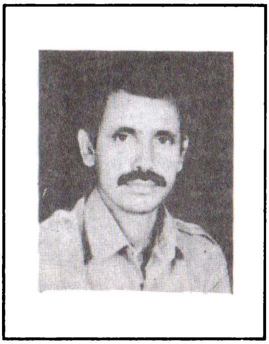
জগদীশ চন্দ্র বিঃ



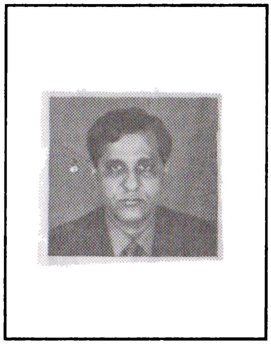
ফজলুল হক



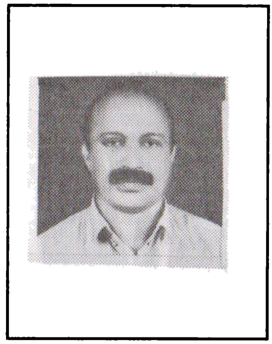
আমির হোসেন বীর প্রতীক



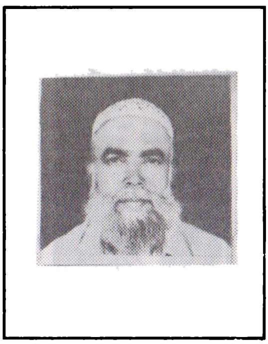
এস.এ. মজুমদার



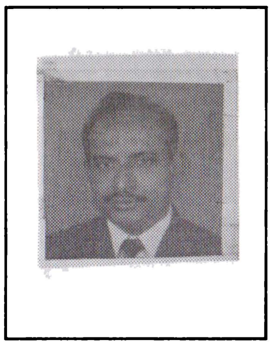
ডাঃ মাহফুজুল হক



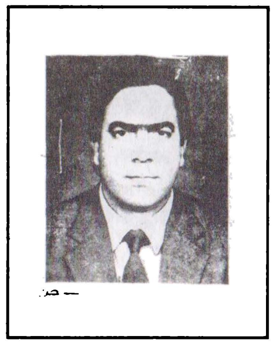
জিলানী চৌধুরী



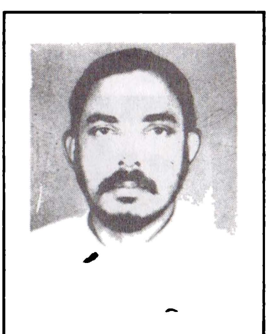
আঃ রশিদ



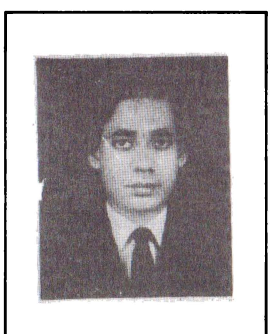
আঃ কাদের



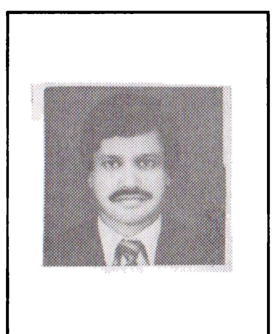
ডাঃ মোজাম্মেল হক



ওসমান গনি



জসিমউদ্দিন



ডাঃ আলাউদ্দিন আহমেদ



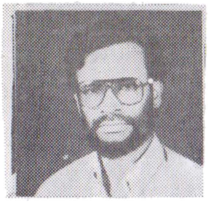
মোশতাক আহমদ



আজিজুল আলম



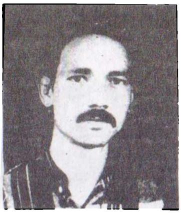
অনিল বরণ



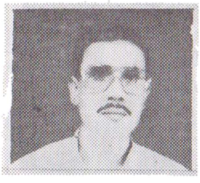
ফজুলূল করিম



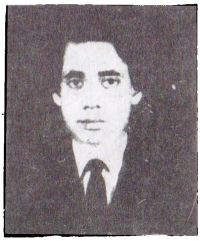
মোশাররফ হোসেন



আঃ রহিম



[redacted] আদের



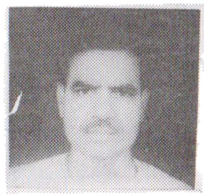
জসিমউদ্দিন



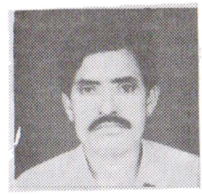
আবু নেছার সিদ্দিক



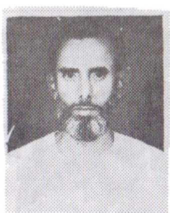
সামসুল হক



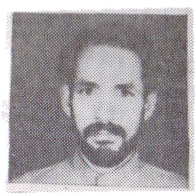
আলাউদ্দিন ফজলু



মহম্মদ আলি



বশির আহমদ



খলিল উল্লাহ



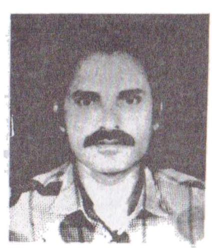
জয়নাল আবেদীন



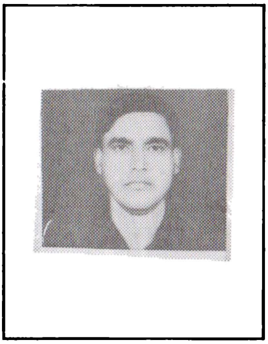
অতুল চন্দ্র



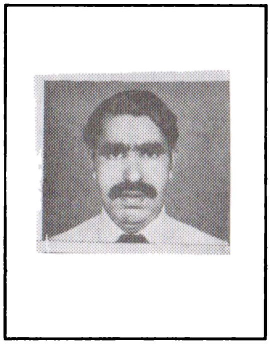
শমশের আলী



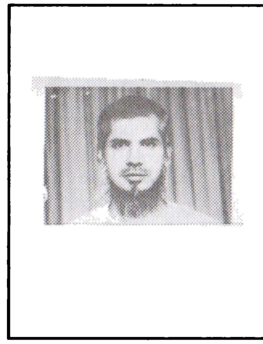
আবুল হোসেন



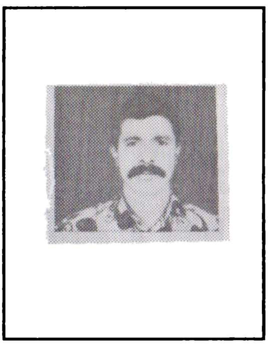
মোস্তাফিজুর রহমান



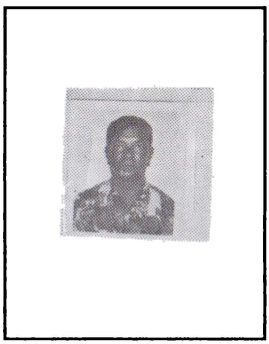
নুরুল গনি



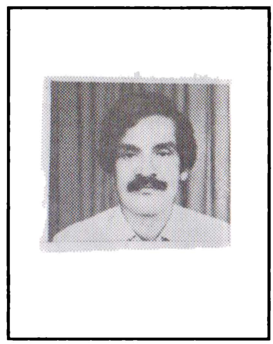
আঃ গফ্ফার



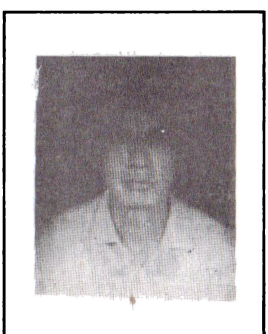
নুরুল ইসলাম



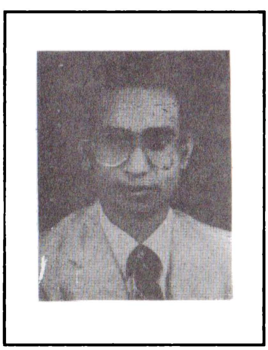
আঃ রাজ্জাক



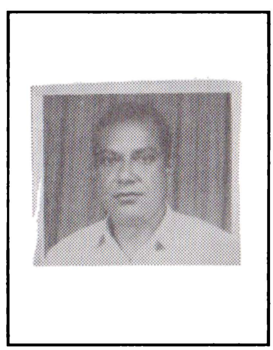
আঃ রহিম



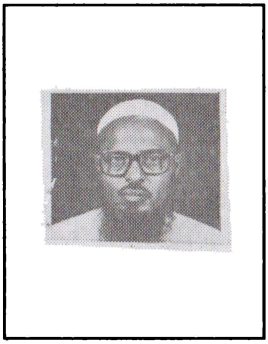
আনোয়ার হোসেন



সাইদুর রহমান



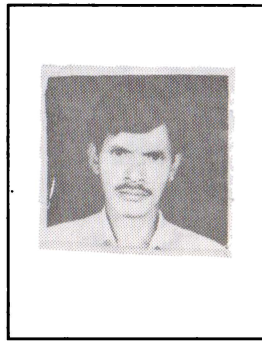
ইমাম বারী



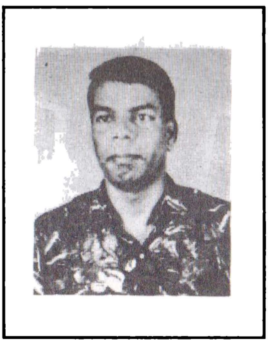
বাচ্চু পাটওয়ারী



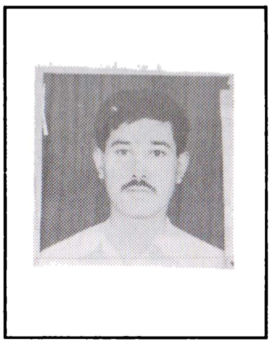
সামসুল কবির



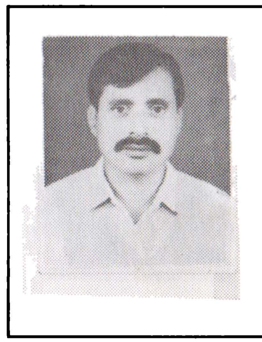
আবুল হোসেন



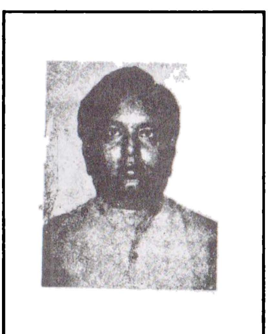
আঃ খালেক



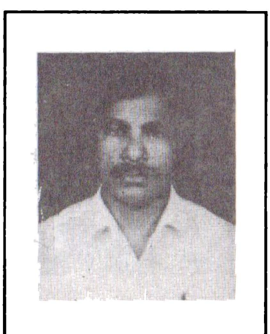
মেজর এমদাদ



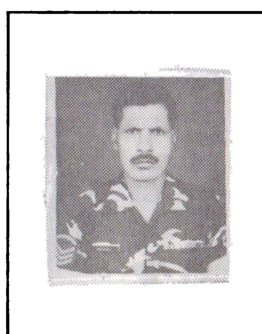
সিরাজুল ইসলাম



হাবিবুর রহমান

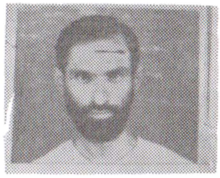


সেলিম বাঙ্গালী

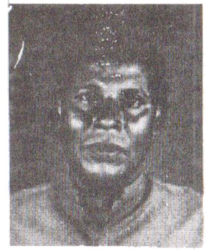


আলমগীর শিকদার

নুরুল ইসলাম



রইসউদ্দিন



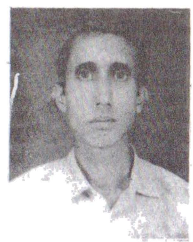
আঃ ওয়াহিদ



সুবোধ কুমার



ইলিয়াস খন্দকার



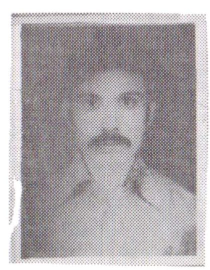
রব্বান আলী



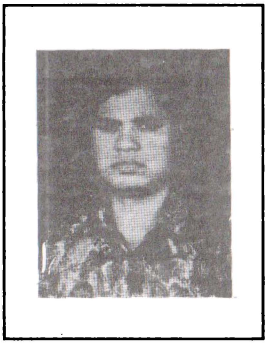
শফিউল আমান



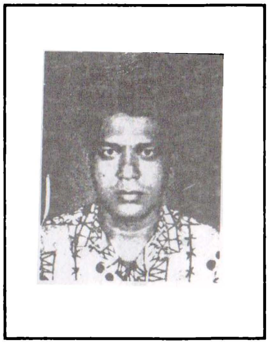
প্রফুল্ল কুমার মিস্ত্রী



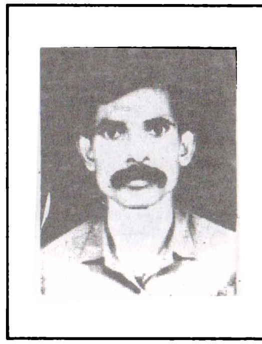
জয়নাল আবেদীন



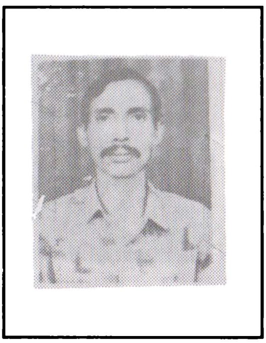
শওকত আলী



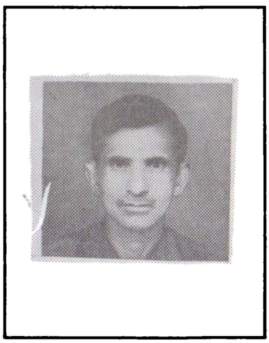
আঃ ওয়াহিদ



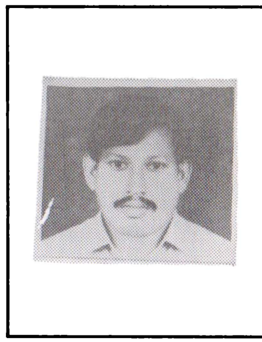
শাহজাহান মিয়া



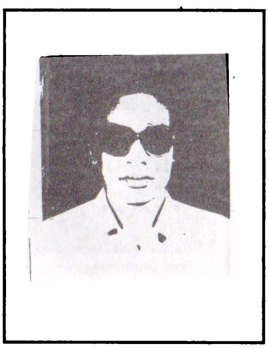
বিশ্বনাথ পালিত



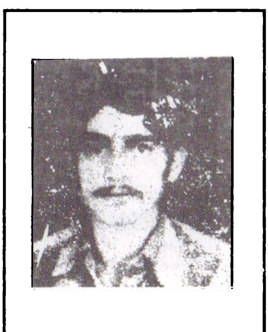
আরব আলী



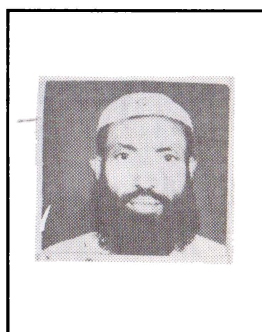
জয়নাল আবেদীন



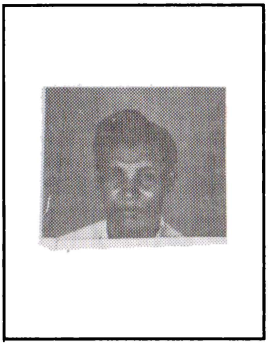
খোরশেদ আলম

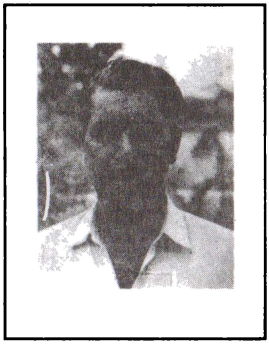


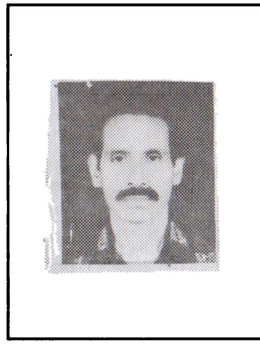
আঃ গফুর

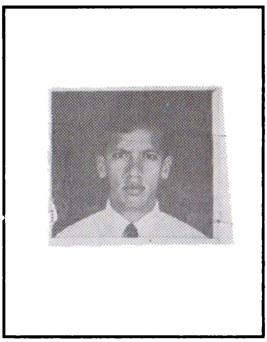


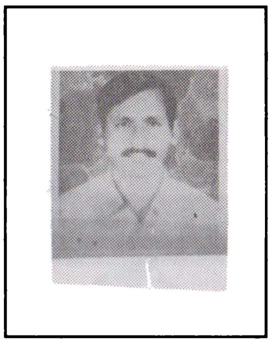
আফাজউদ্দিন

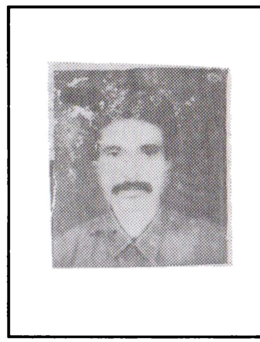

রফিকুল ইসলাম

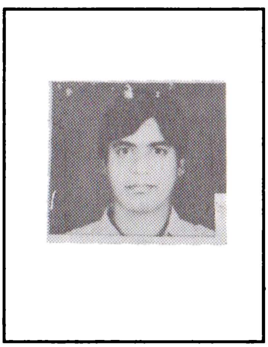

নুরুল গনি

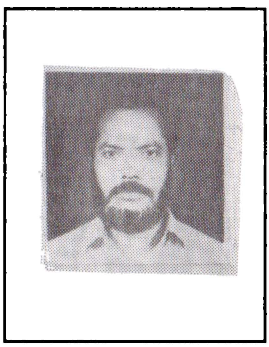

আঃ অদুদ


জিয়াউদ্দিন


আবিউর


সুশীল কুমার


ফারুক আহমদ

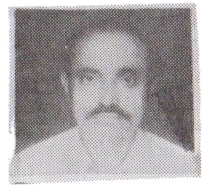

মন্নাফ পাটওয়ারী


আলি আশরাফ

সামসুল হক



আঃ সেলিম



আফাজউদ্দিন



রেজাউল করিম



মোঃ নুরুল ইসলাম



ইউসুফ শিকদার

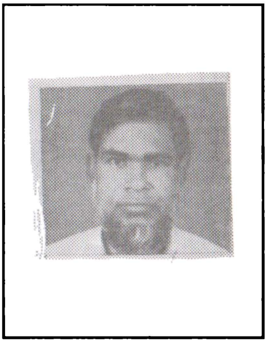


মনসুর আলি

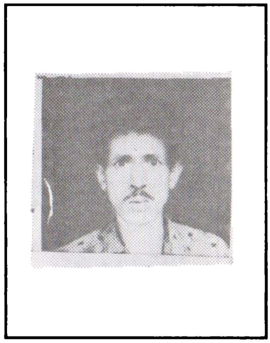
শাহজাহান আলম



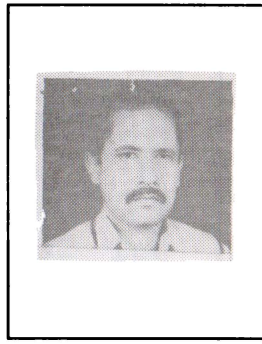
এবাদুল ইসলাম



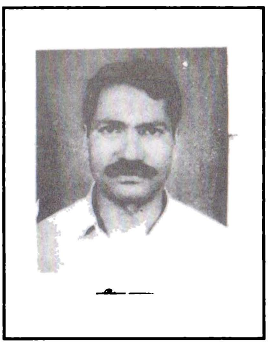
আবুল কাশেম



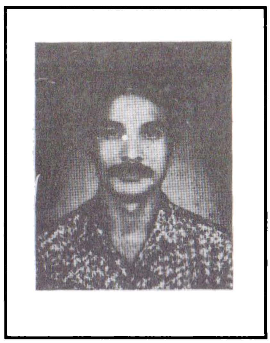
মুজিবুর রহমান



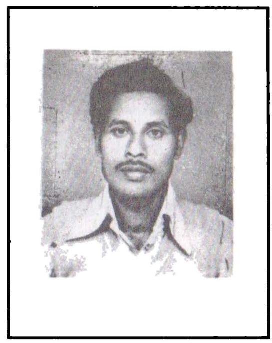
মোঃ শাহ্ আলম



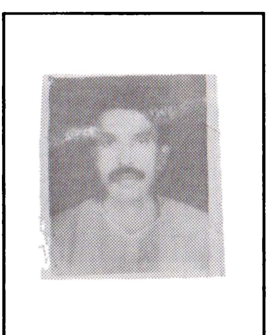
রুহুল আমিন



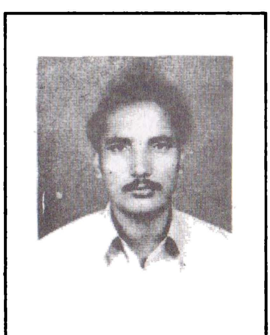
মহিউদ্দিন আহম্মদ



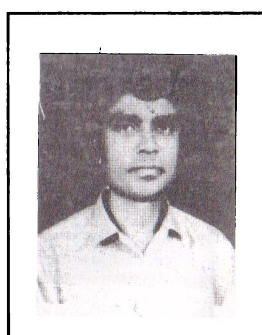
আঃ ওয়াহিদ



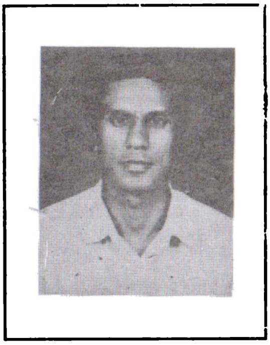
শাহজাহান মিয়া



বদিউল আলম



ইসহাক ভুইয়া



ইউসুফ শিকদার



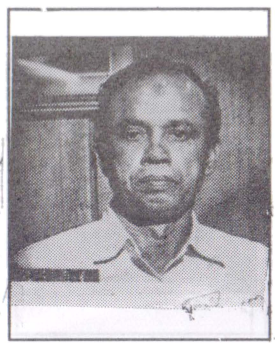
খলিলুর রহমান



আবুল হোসেন



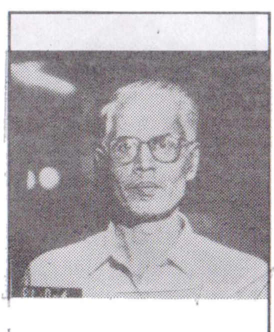
সেলিম ভুইয়া

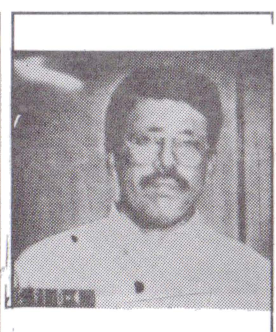


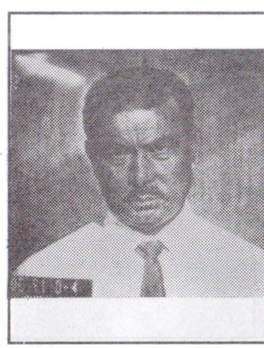
দেলোয়ার হোসেন

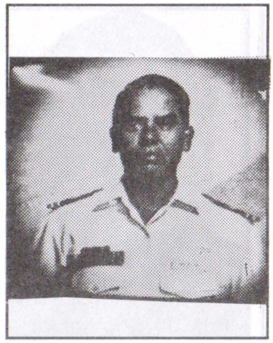
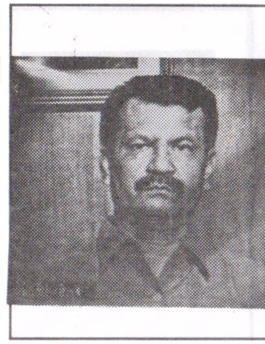
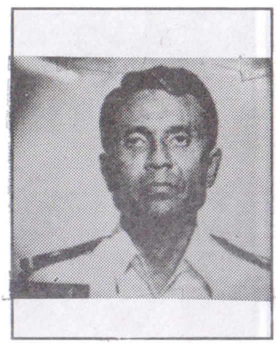


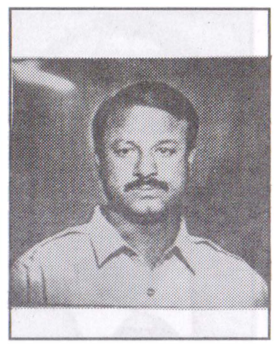
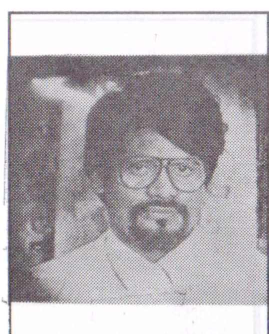
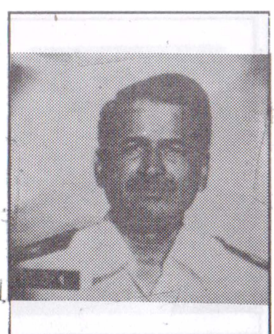
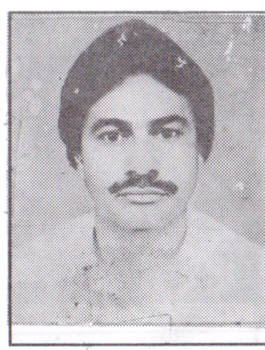
আবু তাহের খঃ

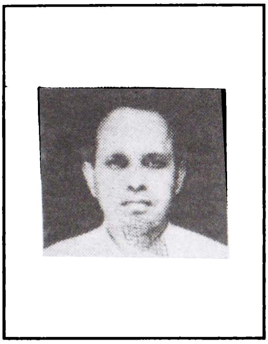




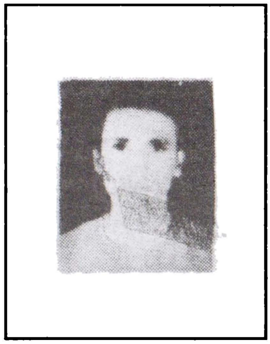


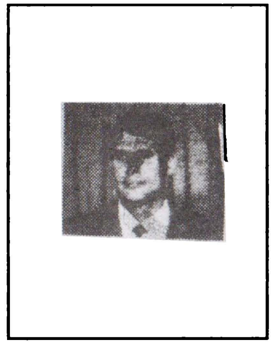







বিধান চন্দ্র বিশ্বাস



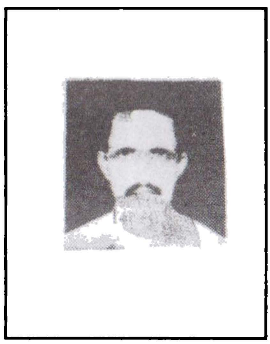
সুধাংশু হালদার



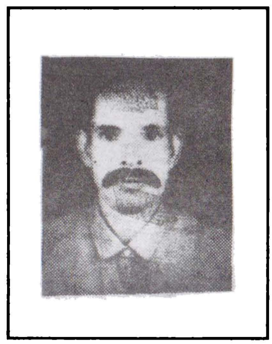
মফিজউদ্দিন



আফাজউদ্দিন

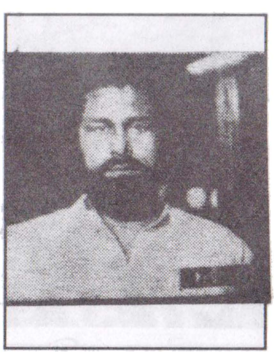


আলী হোসেন



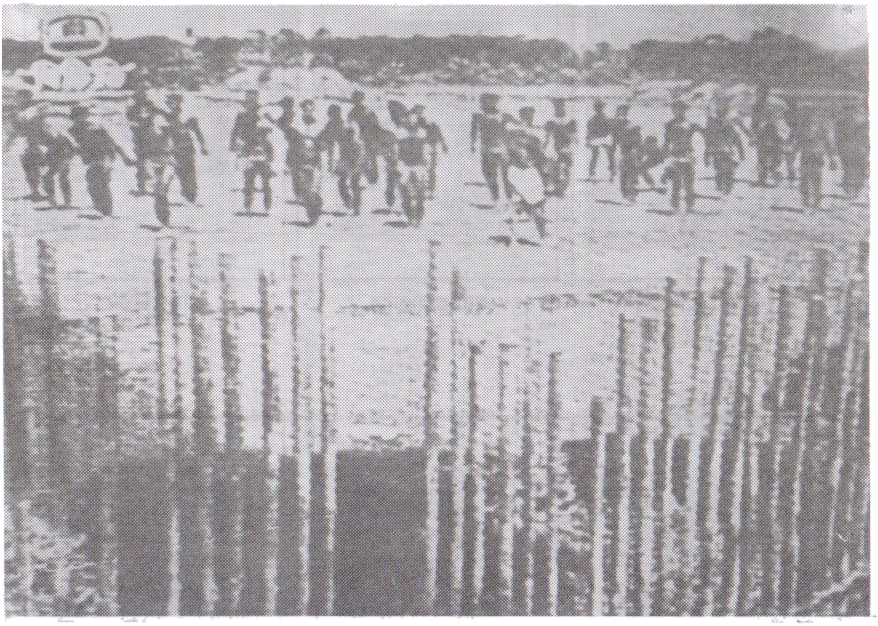
সাদিক হোসেন





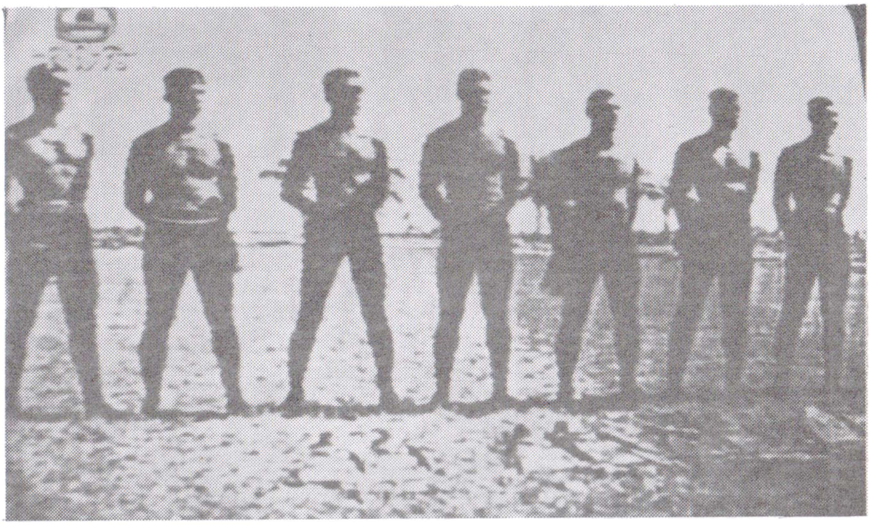


চিত্রে নৌ-অভিযান





নৌ-কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য





নৌ-কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য



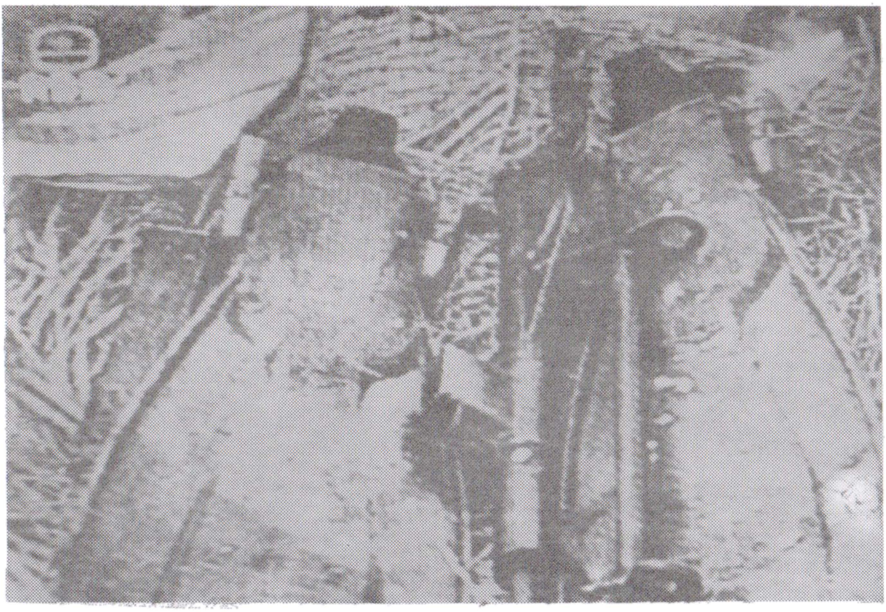


নৌ-কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য

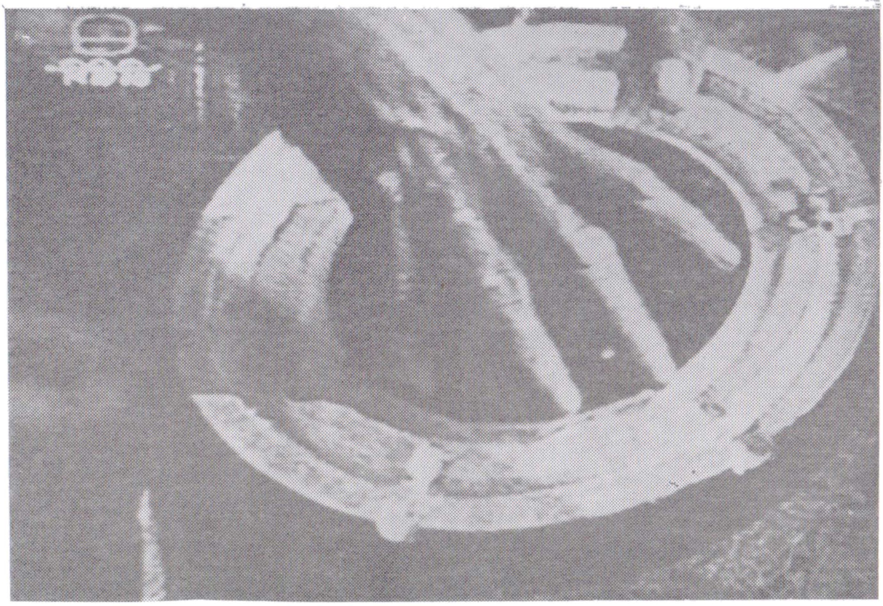




নৌ-কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য



কমান্ডোদের ব্যবহৃত ফিমস্ ও ষ্টেনগান-



কমান্ডোদের ব্যবহৃত লিমপেড মাইন-



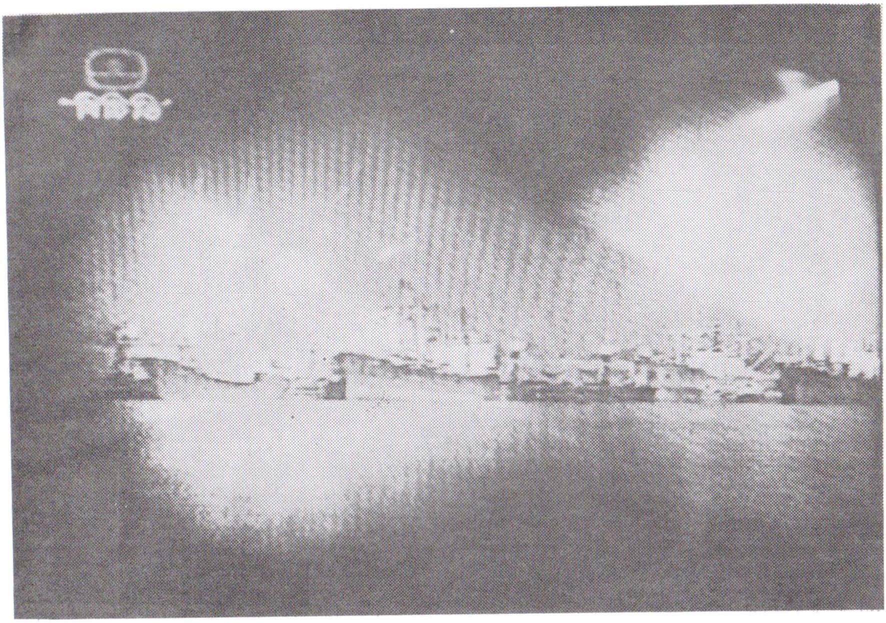
অভিযানের জন্য চৌকস কমাণ্ডো বাছাই করছেন ব্যাম্প প্রশিক্ষক



এভাবেই ছদ্মবেশ ধারন করে শত্রু বেষ্ঠিত জনপদের মধ্য দিয়ে বন্দর এলাকায় পৌছতে হয় কমাণ্ডোদের।



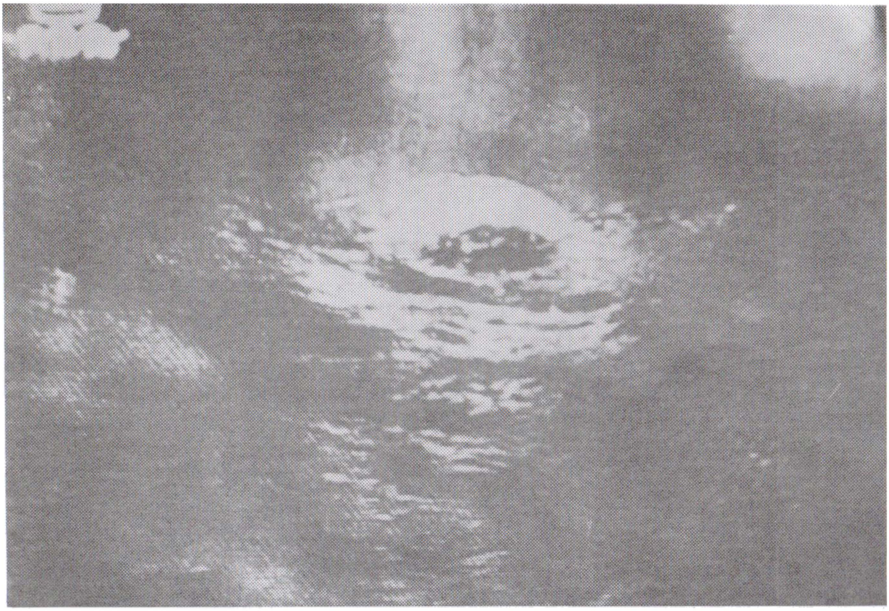
আত্মঘাতী অভিযানের পূর্বে সফলতা কামনা করে দোয়া প্রার্থনারত কমাণ্ডোদল।



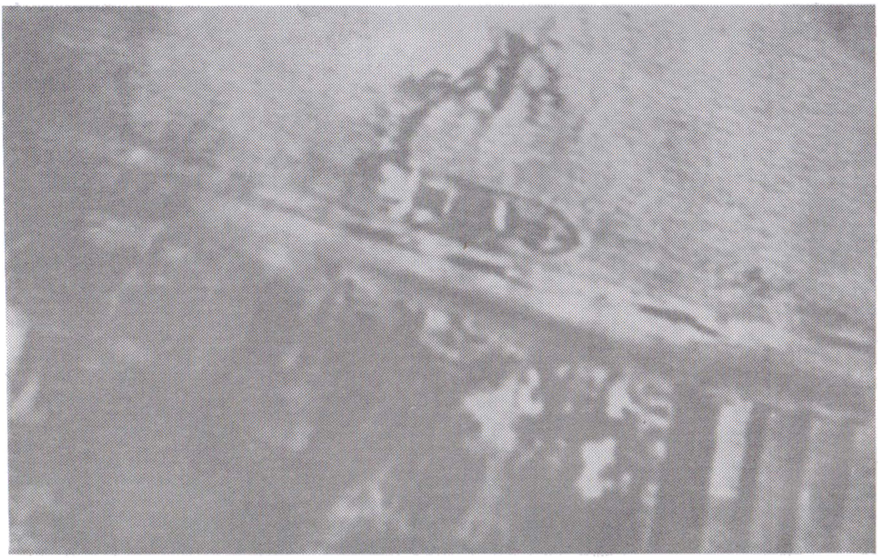
অভিযানের পূর্বে শত্রু অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা



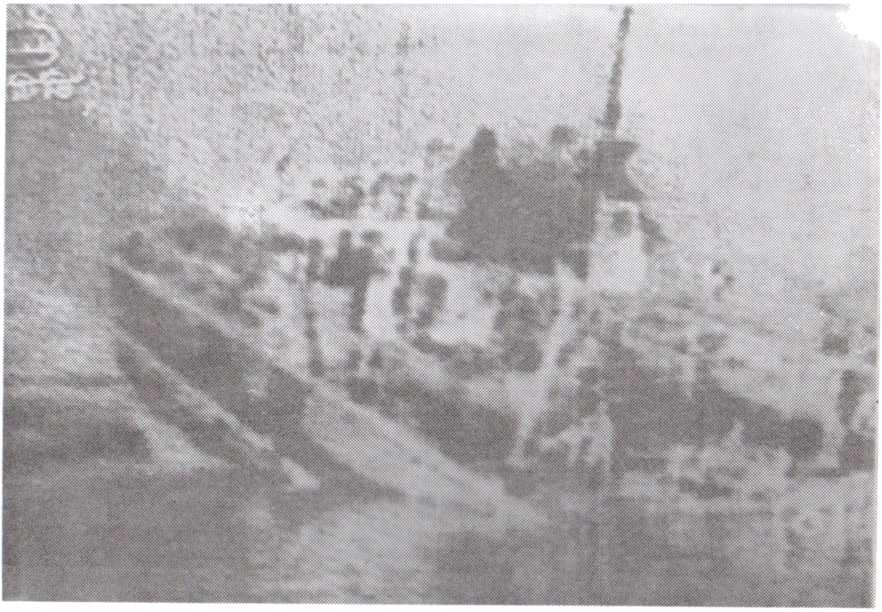
(৩) অভিযানের পূর্বে আত্মঘাতী কমান্ডোদল-
লিমপেড মাইন বুকে বেঁধে নিচ্ছে।



কর্ণফুলী, পশুর, যমুনা'র ন্যায় ভয়াল নদীতে এইভাবে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় জাহাজের গায়ে চুম্বকযুক্ত লিমপেড মাইন স্থাপন করেন।

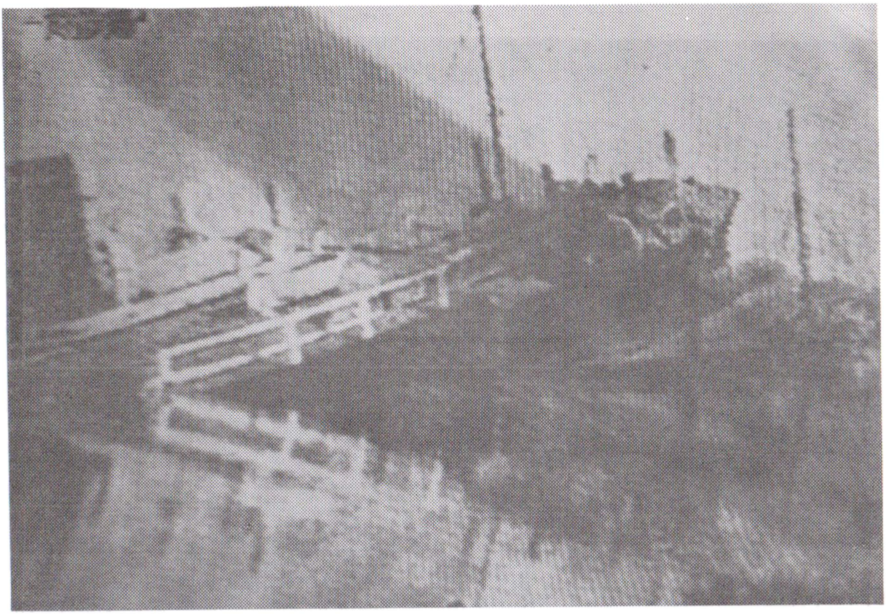


'৭১ এ নৌ-কমাণ্ডো কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত জাহাজ

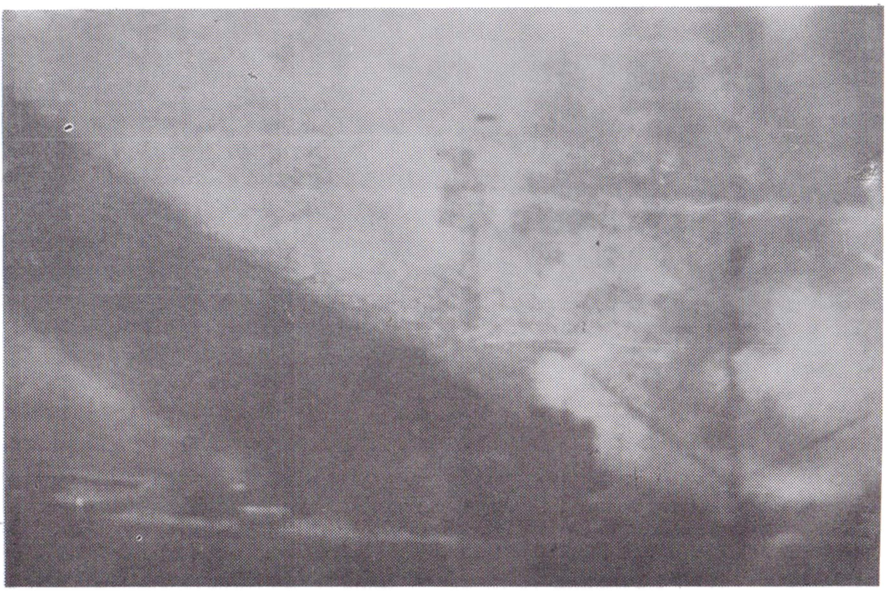




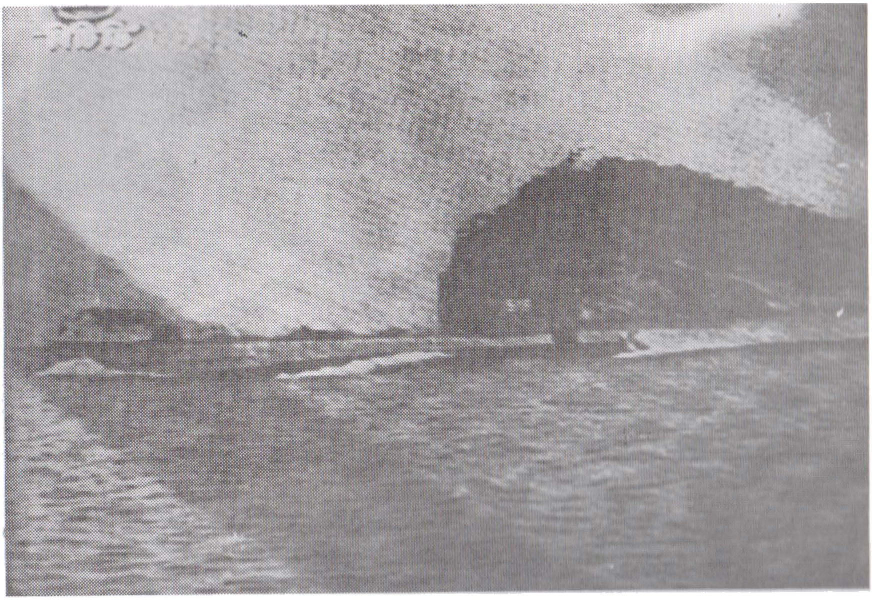
(৮) কমান্ডোদের লাগানো মাইনের বিষ্ফোরিত বিদেশী জাহাজ



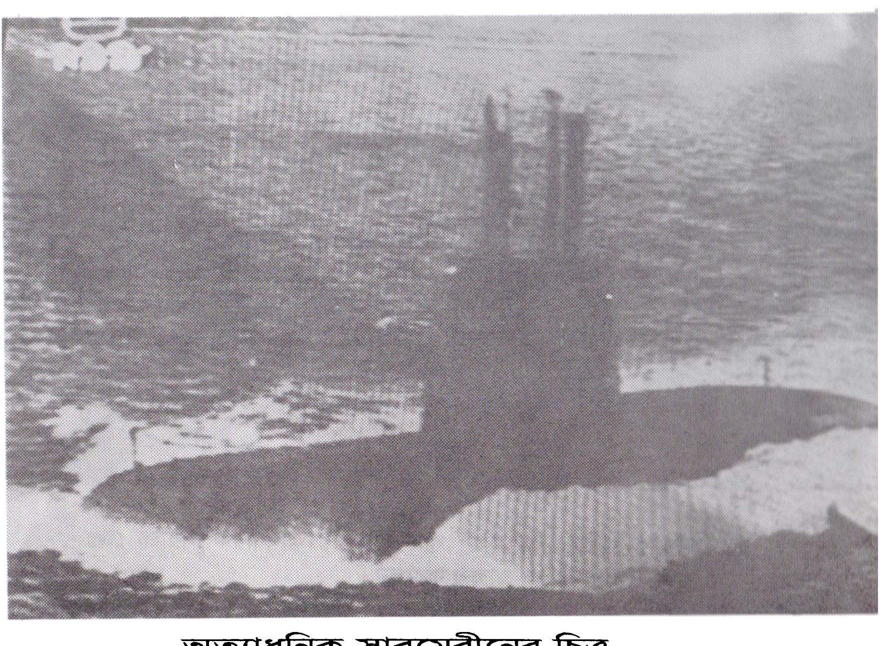
এভাবে হানাদার বাহিনীর রসদ বোঝাই জাহাজ বিস্ফোরিত হয়।



কমান্ডোদের লাগানো মাইনের বিস্ফোরিত বিদেশী জাহাজ



সাবমেরীন **MANGRO** এর আলোক চিত্র।



অত্যাধুনিক সাবমেরীনের চিত্র



'৭১ র ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্সে পাক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়াজী জেঃ অরোরার নিকট আত্মসমর্পন দলিলে স্বাক্ষর করছেন।